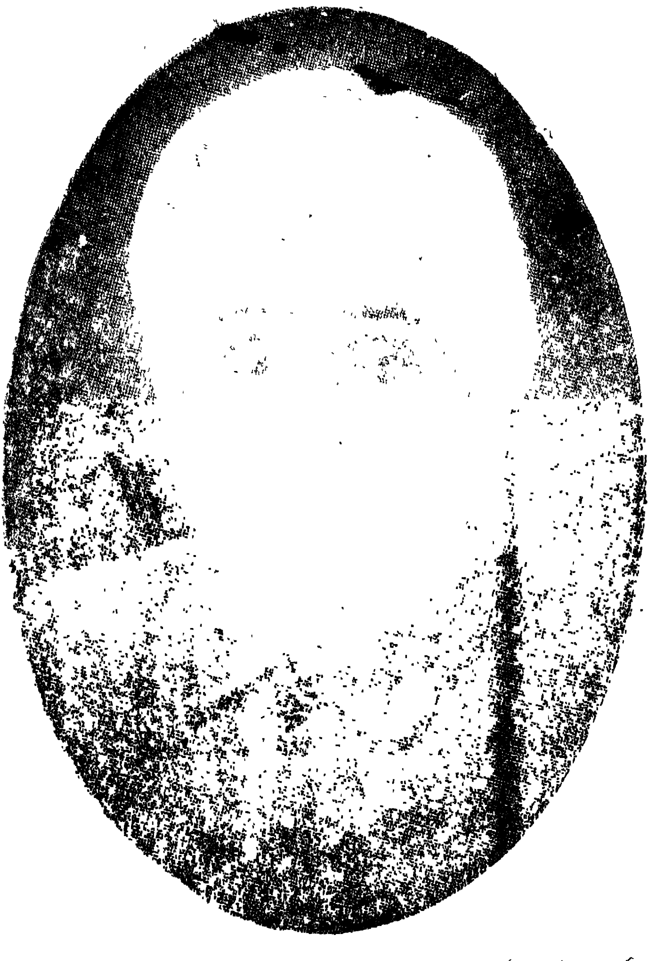
পাঞ্জাব-কেশরী লালা লাজপত রায়



শ্রীদীনেন্দ্রকুমার মজুমদার
প্রণীত।

বসুমতী সাহিত্য-মন্দির
প্রকাশিত।

[মূল্য ।০ আনা]

ভূমিকা

লালা লজপৎ রায় ভারতমাতার অন্যতম সুসন্তান। ভারতের নূতন জাতীয় জীবন বুঝিতে হইলে লজপৎ রায়ের জীবনী পাঠ করা আবশ্যক। এ পর্য্যন্ত বাঙ্গালাভাষায় তাঁহার কোন জীবনী প্রকাশিত হয় নাই। সে অভাব কথঞ্চিৎ দূরীকরণার্থ এই পুস্তকখানা লিখিত হইল। জনসাধারণ এই ক্ষুদ্র পুস্তকপাঠে বিন্দুমাত্র উপকৃত হইলে আমার শ্রম সার্থক জ্ঞান করিব।

"বসুমতী"-সম্পাদক আমার পরম-শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুত হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ মহাশয়ের "কংগ্রেস" নামক সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থ হইতে আমি বিশেষ সাহায্য পাইয়াছি। আমি তাঁহার নিকট আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশের 'ই অবসর ত্যাগ করিতে পারিতেছি না।

কলিকাতা।
১০ই পৌষ ১৩২৮ সাল।

শ্রীধীরেন্দ্রচন্দ্র মজুমদার।

লালা লজপৎ রায়

প্রথম পরিচ্ছেদ

ছাত্র-জীবন

পাঞ্জাবকেশরী লালা লজপৎ রায় ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দে পাঞ্জাবের অন্তর্গত জাগারণ নামক ক্ষুদ্র সহরে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি জাতিতে বৈশ্য। তিনি যে বংশে জন্মগ্রহণ করেন, তাহা পদমর্য্যাদা হিসাবে বিশেষ সম্ভ্রান্ত হইলেও প্রথমে অর্থগৌরবে তাদৃশ গৌরবান্বিত ছিল না। লজপৎ রায়ের পিতার নাম লালা রাধাকিষণ। লালা রাধাকিষণ তৎকালের একজন খ্যাতনামা পুরুষ বলিয়া পরিচিত। তিনি স্থানীয় সরকারী বিদ্যালয়ে উর্দ্দু ভাষার শিক্ষক ছিলেন। ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে তিনি প্রাতঃস্মরণীয় স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতীর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। ইহাতে তাঁহার ধর্ম্মজীবনে একটি অদ্ভুত পরিবর্ত্তন ঘটে।

লালা রাধাকিষণ একজন পাকা কংগ্রেসওয়ালা ছিলেন। তিনি প্রথমে সার সৈয়দ আহমদের বিশেষ অনুরাগী ছিলেন। কিন্তু সৈয়দ সাহেব যখন সরকার-প্রদত্ত উপাধি লাভ করিয়া তাঁহার রাজনীতিক মতের পরিবর্ত্তন করেন এবং কংগ্রেসের বিপক্ষতাচরণ করিতে থাকেন, তখন লালা রাধাকিষণ সৈয়দ সাহেবের প্রতি অত্যন্ত বিরক্ত হন এবং তাঁহার দল হইতে বিচ্ছিন্ন হন। তিনি তৎকালিক উর্দ্দু সংবাদপত্র "কোহিনূরে"

সৈয়দ সাহেবের মতের তীব্র প্রতিবাদ করিয়া কয়েকখানা চিঠি প্রকাশ করেন। লালা লজপৎ রায় পিতার এই চিঠিগুলি পরে ইংরাজিতে অনুবাদ করিয়াছিলেন। এতদ্ব্যতীত লালা রাধাকিষণ একজন উৎকৃষ্ট উর্দ্দু-লেখক ছিলেন। উর্দ্দ ভাষায় তিনি কয়েকখানা পুস্তক ও পুস্তিকা লিখিয়াছিলেন, উহা তৎকালে বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। উর্দ্দু ভাষার প্রতি অনুরাগ লালা লজপৎ রায় তাঁহার পিতার নিকট হইতেই লাভ করিয়াছেন।

লজপৎ রায়ের জননীও একজন প্রাতঃস্মরণীয়া মহিলা ছিলেন। তিনি অতিশয় বুদ্ধিমতী ছিলেন। তাঁহার সরলতা, তাঁহার তেজস্বিতা, তাঁহার মিতব্যয়িতা প্রভৃতি বহু সদ্‌গুণই তাঁহার পুত্রে বর্ত্তিয়াছে। বাস্তবিক স্বীয় চরিত্রের সদ্‌গুণাবলীর জন্য লজপৎ রায় পিতার অপেক্ষা মাতার নিকটই অধিকতর ঋণী। বস্তুতঃ লজপৎ রায়ের চরিত্রে ও জীবনে তাঁহার জননীর প্রভাব অত্যন্ত অধিক। এখনও লালাজী জননীর নানাবিধ গুণরাজির কথা উল্লেখ করিয়া অশ্রু বিসর্জ্জন করিয়া থাকেন। লালাজী তাঁহার জননীর সম্বন্ধে বলিয়া থাকেন, "আমি যেটুকু উন্নতি লাভ করিতে পারিয়াছি, তাহা আমার মাতাপিতার জন্যই। বিশেষতঃ মাতার আদর্শ আমার জীবনে অত্যন্ত প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। আমার জননীর মত গুণবতী মহিলা অতি কম দেখা যায়। প্রথমে আমাদের অবস্থা স্বচ্ছল ছিল না, কিন্তু আমার জননীর গৃহনৈপুণ্যে এবং ব্যবস্থা-পারিপাট্যে বাল্যকালে আমরা কোন প্রকার অভাবই বোধ করিতে পারি নাই। আমাদের মাসিক আয় যখন মাত্র পঞ্চাশ টাকা ছিল, জননীর ব্যবস্থা গুণে তখনও যেরূপ সুখ-সচ্ছন্দে কাটাইয়াছি, পরে সহস্র সহস্র মুদ্রা অর্জ্জন করিয়াও তখনকার অপেক্ষা অধিক সুখস্বাচ্ছন্দ্যভোগ করি নাই।"

অল্পবয়সেই লজপৎ রায়ের শিক্ষা আরম্ভ হয়। লালা রাধাকিষণ নিজে শিক্ষাপ্রচারক ছিলেন, তিনি নিজের তত্ত্বাবধানে পুত্রের শিক্ষা দিতেন। লজপৎ রায় অল্পবয়সেই একজন মেধাবী ও প্রতিষ্ঠাবান্ ছাত্র বলিয়া পরি-

চিত হন। তাঁহার অবস্থা স্বচ্ছল ছিল না, বাল্যকালে স্বাস্থ্যও ভাল ছিল না; কিন্তু এ সব অসুবিধা সত্ত্বেও তিনি অধ্যয়নে বিশেষ কৃতিত্ব প্রদর্শন করেন। যথাসময়ে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া তিনি লাহোরে সরকারী কলেজে ভর্ত্তি হন। সেখানে দুই বৎসর অধ্যয়ন করিয়া তিনি বিশ্ববিদ্যালয় হইতে একটি বৃত্তি প্রাপ্ত হন। অতঃপর তিনি আইন অধ্যয়নে প্রবৃত্ত হন এবং ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে মাত্র ২০ বৎসর বয়সের সময় আইনের শেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েন। বিশ্ববিদ্যালয়ে উত্তীর্ণ ৩০ জন ছাত্রের মধ্যে তিনি দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন। অতঃপর তিনি হিসার নামক ক্ষুদ্র সহরে আইন ব্যবসা আরম্ভ করেন।

লজপৎ রায় যখন ছাত্র, তখন পাঞ্জাবের ধর্ম্মনৈতিক জীবনে এক নূতন যুগের প্রবর্ত্তন হয়। এই সময় পাঞ্জাবে স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী তাঁহার ধর্ম্মপ্রচার করিতে·আরম্ভ করেন। স্বামী দয়ানন্দ বিখ্যাত আর্য্যসমাজের প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁহার ধর্ম্মান্দোলনের তরঙ্গ শিক্ষিত অশিক্ষিত, ব্রাহ্মণ শূদ্র, বালক বৃদ্ধ পাঞ্জাবের আপামর সাধারণের হৃদয়কূলে আসিয়া আঘাত করে। ভারতে ইংরাজ-রাজত্বের প্রারম্ভে বৈদেশিক শাসন এবং বৈদেশিক শিক্ষা ও আচার ব্যবহারের প্রবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে ভারতের ধর্ম্ম ও সমাজ-জীবনে একটা বিপ্লবের সৃষ্টি হয়। জনসাধারণ এই বিপ্লবের আবর্ত্তে পড়িয়া দিক্‌বিদিক্ জ্ঞানশূন্য হইয়া পড়ে। অনেক দুর্ব্বলচিত্ত ব্যক্তি পাশ্চাত্য শিক্ষা ও পাশ্চাত্য আচারের নূতন মোহে পড়িয়া স্বীয় সমাজ ও ধর্ম্ম হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে। এই বিপ্লবে দেশবাসীর উদ্ধারের জন্য স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী তাঁহার নবধর্ম্ম প্রচার করিতে আরম্ভ করেন, পথভ্রষ্ট দেশবাসিগণকে সুপথে আনিতে চেষ্টা করেন। কিন্তু পাঞ্জাবের কোন কোন গণ্যমান্য লোক স্বামী দয়ানন্দের বিপক্ষতাচরণ করিতে আরম্ভ করেন। পাঞ্জাবে যাহাতে আর্য্যসমাজ প্রতিষ্ঠালাভ করিতে না পারে, এজন্য চতুর্দ্দিকে নানারূপ ষড়্‌যন্ত্র হইতে থাকে। এই সন্ধিক্ষণে যুবক লজপৎ রায় তাঁহার অপর দুই জন সহপাঠী বন্ধুর সহিত স্বামী দয়া-

নন্দের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিলেন। যুবক হইলেও তাঁহারা বুঝিতে পারিলেন, স্বামী দয়ানন্দের ধর্ম্মান্দোলনের মধ্যে দেশের ও সমাজের প্রভূত কল্যাণ নিহিত রহিয়াছে। এই জন্য তিন বন্ধু পাঞ্জাবে আর্য্যসমাজের প্রতিষ্ঠা-কল্পে বুক বাঁধিয়া দণ্ডায়মান হইলেন। লজপৎ রায়ের এই দুই বন্ধুর মধ্যে একজন লালা হংসরাজ, অপর জন স্বর্গীয় পণ্ডিত গুরুদত্ত বিদ্যারথী। লালা হংসরাজ পাঞ্জাবের একজন স্বনামধন্য মহাপুরুষ। ধর্ম্ম, শিক্ষা ও সমাজ-সংস্কারে লালা হংসরাজের নাম শুধু পাঞ্জাব কেন, ভারতের সমগ্র শিক্ষিত-সমাজে সুপরিচিত। তিনি দয়ানন্দ বৈদিক কলেজের অধ্যক্ষের পদ অলঙ্কৃত করেন। পণ্ডিত গুরুদত্ত বিদ্যারথীও একজন অলৌকিক প্রতিভা-সম্পন্ন পুরুষ ছিলেন। দুর্ভাগ্যের বিষয়, তিনি মাত্র ২৫ বৎসর বয়সে ইহলোক পরিত্যাগ করেন।

গুরুদত্ত, হংসরাজ এবং লজপৎ রায় এই তিন জন নবীন যুবকের উপর আর্য্যসমাজের রক্ষা ও উন্নতির ভার অর্পিত হয়। তাঁহারা আর্য্যসমাজকে প্রাণ অপেক্ষাও প্রিয়তর জ্ঞান করিয়া উহার উন্নতিকল্পে প্রাণান্তকর পরিশ্রম করিতে থাকেন। উহাঁরা আর্য্যসমাজের ধর্ম্মের ব্যাখ্যা করিয়া, ধর্ম্ম সম্বন্ধে তর্কবিতর্ক করিয়া, বক্তৃতা করিয়া, আজ এখানে, কাল সেখানে, পরশু অন্যখানে এইরূপে সর্ব্বত্র পরিভ্রমণ করিয়া নানা উপায়ে আর্য্য-সমাজের প্রচার করিতে আরম্ভ করেন। কিন্তু আর্য্যসমাজের উন্নতির জন্য এত পরিশ্রম করিলেও তাঁহারা স্ব স্ব পাঠে অবহেলা করিতেন না। তাঁহারা প্রত্যেক পরীক্ষায় অতি উচ্চ স্থান অধিকার করিতেন, এতদ্ব্যতীত নানা-বিধ শাস্ত্র পাঠ করিয়া হিন্দুধর্ম্ম ও দর্শনের গূঢ়তত্ত্ব-সমূহ আয়ত্ত করিতেন। এইরূপে লালাজীর ছাত্রজীবন অতিবাহিত হয়।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

আর্য্যসমাজ ও দয়ানন্দ কলেজ।

আর্য্যসমাজের নূতন আন্দোলন ক্রমেই বিস্তৃতি লাভ করিতে আরম্ভ করে। ইহার যশ ও প্রতিপত্তি ক্রমেই চতুর্দ্দিকে ব্যাপ্ত হইতে থাকে। দেশের জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষা-বিস্তার আর্য্যসমাজের একটি প্রধান অঙ্গ। এই উদ্দেশ্যে প্রধানতঃ লজপৎ রায় এবং তাঁহার বন্ধুদ্বয়ের চেষ্টায় ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দের ১লা জুন তারিখে লাহোরের বিখ্যাত দয়ানন্দ এংলো-বৈদিক কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। এই কলেজের খ্যাতি-প্রতিপত্তির বিষয় ভারতের শিক্ষিত ব্যক্তিমাত্রেই অবগত আছেন। ইহাতে এম, এ, পর্য্যন্ত পড়ান হয়। ইহা পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্গত। কি ছাত্র-সংখ্যায়, কি অধ্যাপনা-সৌকর্য্যে দয়ানন্দ কলেজ পাঞ্জাবের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়াছে। প্রথম হইতেই এই কলেজে জাতীয়ভাবে শিক্ষা-দানের ব্যবস্থা করা হয়। নিম্নবর্ণিত চারিটি উদ্দেশ্য লইয়া এই কলেজটি স্থাপিত হয়;—(১) হিন্দী ভাষা ও হিন্দী সাহিত্যের প্রচার, (২) সংস্কৃত ভাষা ও সংস্কৃত সাহিত্যের আলোচনা, (৩) ইংরাজি শিক্ষাপ্রচার এবং (৪) কার্য্যকরী ও ব্যবসাকরী শিক্ষাপ্রচলন।

দয়ানন্দ কলেজ লালাজীর অতি আদরের সামগ্রী। তিনি বহু বৎসর উহার ভাইস্ প্রেসিডেণ্ট ও সেক্রেটারীর পদ অলঙ্কৃত করেন। তিনি বহু বৎসর ঐ কলেজের উচ্চ শ্রেণীর ছাত্রগণকে ইতিহাস শিক্ষা দিয়াছেন। যাহাতে কলেজের কার্য্য সুচারুরূপে পরিচালিত করিতে পারেন, এজন্য তিনি কলেজের নিকটেই নিজের একটি গৃহনির্ম্মাণ করিয়া তথায় বাস করেন। তিনি ঐ কলেজের উন্নতিকল্পে স্বোপার্জ্জিত বহু অর্থব্যয় করিয়াছেন।

আর্য্যসমাজের প্রতিষ্ঠা অবধিই উহার জন্য লালাজী যথাসাধ্য পরিশ্রম

করিয়া আসিতেছেন। তিনি উহার উন্নতিকল্পে জীবনের অধিকাংশ সময় ও অর্থব্যয় করিয়াছেন। লালা লজপৎ রায় আর্য্যসমাজের প্রাণস্বরূপ, এ কথা বলিলে অত্যুক্তি হয় না। লালাজী আর্য্যসমাজকেই তাঁহার উন্নতির অন্যতম হেতু বলিয়া মনে করেন। কিন্তু আর্য্যসমাজের কোন কোন নেতা লালাজীর প্রতি সদ্ব্যবহার করেন নাই। তিনি যখন সরকারের বিষ-নয়নে পড়িয়া নানারূপ নিগ্রহ-লাঞ্ছনা ভোগ করেন, তখন ইহার প্রমাণ পাওয়া যায়। কিন্তু তাই বলিয়া লালাজী আর্য্যসমাজের প্রতি একটুও বিরূপ হন নাই, বা ইহার উন্নতিকল্পে পরিশ্রম করিতে একটুও শৈথিল্য প্রকাশ করেন নাই। এই সম্পর্কে তিনি একটি বক্তৃতায় তাঁহার আর্য্যসমাজে প্রবেশ ও আর্য্যসমাজ হইতে তিনি কি কি উপকার লাভ করিয়াছেন, সে কাহিনী বিবৃত করেন। আমরা তাহা হইতে দুই একটি অংশ উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি :--

"অনেক লোক আছে, তাহারা আমাকে বলে, আর্য্যসমাজ আমার অনুপস্থিতিতে আমার উপর কোন সহানুভূতি দেখায় নাই। এমন কি, আজও আমি এরূপ চিঠি পাইয়াছি, যাহাতে আমাকে বলা হইয়াছে, যে হেতু আর্য্যসমাজ আমার দুঃখে সহানুভূতি দেখায় নাই, সেই জন্য আমার উহার সংস্রব পরিত্যাগ করা উচিত। আমি ভগবান্‌কে সাক্ষী করিয়া বলিতেছি, কোনরূপ নেতৃত্ব লাভ করিবার আশায় আমি আর্য্যসমাজে প্রবেশ করি নাই। যে নীতির অনুসরণ করিয়া আমি তথায় প্রবেশ করিয়াছিলাম, তাহা আমার জীবনকে বিশুদ্ধতর ও মহত্তর করিয়াছে। আমি যদি আর্য্যসমাজের জন্য কিছু করিয়া থাকি, তবে তদ্দ্বারা আমার নিজের জীবনকেই বিশুদ্ধ করিয়াছি। যদি আমার কোন সদ্‌গুণ থাকিয়া থাকে, তবে তাহা আমার পিতামাতা ও আর্য্যসমাজের নিকট হইতেই পাইয়াছি। কোন কোন লোক আমাকে বলে যে, আর্য্যসমাজ আমার প্রতি ঔদাসীন্য দেখাইয়াছে; কিন্তু ঐ সকল লোকের ঔদাসীন্যের তুলনায় আর্য্যসমাজের ঔদাসীন্য কিছুই নয়। যদি কোন ব্যক্তি আমার নিন্দাবাদ

করিয়া থাকে, তবে এই বক্তৃতা-মঞ্চে দাঁড়াইয়া পরমপিতা পরমেশ্বরকে সাক্ষী করিয়া আমি তাহাকে অন্তরের সহিত ক্ষমা করিতেছি। এই সময় সমালোচনা, তর্কবিতর্ক বা অকৃতজ্ঞতা প্রকাশের সময় নহে; ইহা পরস্পরকে আলিঙ্গন করিবার সময়।

আমি গত ২৫ বৎসর যাবৎ আর্য্যসমাজের জন্য খাটিতেছি এবং উহার কিছু কাজও করিয়াছি। যে সমাজকে আমি বিশ্বাস করি এবং যাহার নিকট আমি এতদূর ঋণী, আমি কিছুতেই সে সমাজকে পরিত্যাগ করিতে পারি না। তবে সমাজের কোন নেতা যদি আমাকে বলেন যে, আমার রাজনীতিক মতের জন্য সমাজের ক্ষতি হইয়াছে, তবে আমি এক্ষণেই ইহার সম্বন্ধ ত্যাগ করিতে প্রস্তুত আছি।"

আর্য্যসমাজের প্রতি লজপৎ রায়ের কিরূপ আন্তরিক অনুরাগ, উপরোক্ত কথাগুলি হইতেই তাহার প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে। ভারতে যে সকল জনহিতকর প্রতিষ্ঠান আছে, আর্য্যসমাজ তাহাদের মধ্যে অন্যতম। ইহার শাখা-প্রশাখা ভারতের সর্ব্বত্র পরিব্যাপ্ত। নানাবিধ জনহিতকর অনুষ্ঠানে আর্য্যসমাজ বৎসরে প্রায় দশলক্ষাধিক মুদ্রা ব্যয় করিয়া থাকে। দয়ানন্দ কলেজের ন্যায় একটি প্রথম শ্রেণীর কলেজ ব্যতীত ইহার তত্ত্বাবধানে ২০।২১টি উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয় ও বহু বালিকা বিদ্যালয় পরিচালিত হয়। ইহা ছাড়া ফিরোজপুরে একটি বৃহৎ অনাথ আশ্রম এবং অন্যান্য বহু স্থানে বহু আতুরাশ্রম আর্য্যসমাজ কর্ত্তৃক পরিচালিত হয়। লালা লজপৎ রায় এবং লালা হংসরাজ এই দুই বন্ধুর আন্তরিক চেষ্টা, উদ্যম ও কার্য্যকারিতার ফলেই উপরোক্ত অনুষ্ঠানগুলি পুষ্টি ও পরিণতি লাভ করিয়াছে। বস্তুত, এই দুই বন্ধুর চেষ্টা ও উদ্যোগ ব্যতীত আর্য্যসমাজ বর্ত্তমান উন্নত অবস্থায় পৌছিতে পারিত কি না, সে বিষয়ে ঘোরতর সন্দেহ আছে।

লালা লজপৎ রায় ইংরাজিতে আর্য্যসমাজের একখানি সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ইতিহাস প্রণয়ন করিয়াছেন। ঐ গ্রন্থ হইতে আমরা স্বামী দয়ানন্দ

সরস্বতী ও আর্য্যসমাজের যাবতীয় অনুষ্ঠানগুলি সম্বন্ধে বহু তথ্য অবগত হই। আর্য্যসমাজের ইতিহাস লিখিবার পক্ষে লালা লজপৎ রায়ই বোধ হয় যোগ্যতম ব্যক্তি। সুতরাং আর্য্যসমাজের ইতিহাস জানিবার পক্ষে তাঁহার পুস্তকই প্রামাণিক গ্রন্থ।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

রাজনৈতিক জীবনের সূচনা

দয়ানন্দ কলেজ প্রতিষ্ঠিত হইবার সময় লজপৎ রায় হিসারেই ওকালতী করিতেছিলেন। হিসারের উকীলগণের মধ্যে তাঁহার কয়েক জন উন্নতমনা ও স্বদেশপ্রেমিক বন্ধু জুটিয়াছিল। ইহাঁরা তাঁহার স্বদেশ সেবাব্রতে বিশেষ সহায়তা করিয়াছেন। ইহাঁদের মধ্যে পণ্ডিত লখপৎ রায় দেশের শিক্ষা ও অন্যান্য বহু জনহিতকর কার্য্যে তাঁহার স্বোপার্জ্জিত অগাধ অর্থ ব্যয় করিয়াছেন। অপর একজন লালা চূড়ামণি, তিনিও একজন বিখ্যাত শিক্ষাপ্রচারক ও মহাপ্রাণ ব্যক্তি ছিলেন। তিনি পাঞ্জাবের অনাথ ও কুড়ানো বালক-বালিকাদের জন্য একটি বিখ্যাত শিল্প বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার পুত্রই লালা যশোবন্ত রায়, যিনি পাঞ্জাবের বিখ্যাত সংবাদপত্র "পাঞ্জাবীর" প্রতিষ্ঠাতা ও স্বত্বাধিকারী। লজপৎ রায় এবং তাঁহার উন্নতমনা বন্ধুগণের অনেক সময় নানারূপ জনহিতকর অনুষ্ঠানে ব্যয়িত হইত। তাই বলিয়া তাঁহারা নিজেদের ব্যবসায়েও একেবারে উদাসীন ছিলেন না। লজপৎ রায় তাঁহার আইনাভিজ্ঞতা, তীক্ষ্ণ-বুদ্ধি, তর্ক-নৈপুণ্য ও বক্তৃতা-শক্তিবলে অচিরেই হিসারের উকীলগণের মধ্যে শীর্ষস্থান অধিকার করেন। হিসারের ক্ষুদ্র আদালত তাঁহার পক্ষে যথেষ্ট বলিয়া মনে হইল না। সুতরাং ১৮৯২ খৃষ্টাব্দে তিনি পাঞ্জাবের রাজধানী লাহোর নগরের উচ্চ আদালতে যোগদান করেন। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, হিসারে নানা জনহিতকর কার্য্যে তিনি অগ্রণী ছিলেন। তিনি তিন বৎসর কাল হিসার মিউনিসিপাল বোর্ডের অবৈতনিক সম্পাদক ছিলেন এবং এই পদে থাকিয়া সহরের অনেক উন্নতি সাধন করেন। হিসারে থাকিতেই তিনি লাহোরের দয়ানন্দ কলেজের প্রতিষ্ঠায় সহায়তা করেন। লাহোরে আগমন করিয়া লজপৎ রায় বৃহত্তর কর্ম্মক্ষেত্র লাভ

করিলেন এবং নানা ভাবে নানা উপায়ে দেশের ও দশের সেবায় আত্ম-নিয়োগ করিলেন।

১৮৮৮ খৃষ্টাব্দে ২৩ বৎসর বয়সের সময় লালা লজপৎ রায়ের রাজনৈতিক জীবনের সূত্রপাত হয়। এই সময় তিনি সার সৈয়দ আহমেদকে কয়েক-খানা প্রকাশ্য চিঠি লিখিয়া তাঁহার মতের তীব্র প্রতিবাদ করেন। পিতা রাধাকিষণের ন্যায় লজপৎ রায়ও প্রথমে সৈয়দ সাহেবের অনুরক্ত ভক্ত ছিলেন। তিনি সৈয়দ সাহেবের সম্পাদিত "সোশ্যাল রিফর্মার" এবং "আলিগড় ইনষ্টিটিউট গেজেট" নামক পত্রদ্বয় নিয়মিত ভাবে অধ্যয়ন করিতেন এবং শেষোক্ত পত্রিকায় প্রবন্ধাদি লিখিতেন। কিন্তু সৈয়দ সাহেব যখন সরকারপ্রদত্ত উপাধি পাইয়া তাঁহার রাজনীতিক মতের পরিবর্ত্তন করেন এবং কংগ্রেসের বিরুদ্ধাচরণ করেন, তখন পিতাপুত্রে উভয়েই সৈয়দ সাহেবের প্রতি বিশেষ বিরক্ত হন। লালা রাধাকিষণ "কোহিনুর" পত্রে সৈয়দ সাহেবকে লক্ষ্য করিয়া যে কয়টি প্রকাশ্য চিঠি লিখেন, সে বিষয় পূর্ব্বে আমরা উল্লেখ করিয়াছি। লজপৎ রায়ও সৈয়দ সাহেবকে লক্ষ্য করিয়া পিতার ন্যায় কয়েকখানা চিঠি লিখেন এবং তাঁহার উপাধি পাইবার পূর্ব্বের ও পরের মতগুলি তুলনা করিয়া তাঁহার অধঃপতনের কথা প্রমাণ করিয়া দেন। একখানা পত্রে তিনি সৈয়দ সাহেবকে লিখিয়া-ছিলেন, "আমি আপনার লেখা বরাবর পড়িয়া থাকি এবং আপনার লেখার বিশেষ প্রশংসা করি। আমি বাল্যকাল হইতেই আপনার মত এবং শিক্ষার প্রশংসা করিতে শিখিয়াছি। বাল্যকাল হইতেই আপনাকে উনবিংশ শতাব্দীতে ভারতের প্রধান রাজনীতিক বলিয়া মনে করিতে শিক্ষালাভ করিয়াছি, কিন্তু সরকার প্রদত্ত উপাধি ও অনুগ্রহ লাভ করিয়া আপনার যে অধঃপতন হইয়াছে, তাহা দেখিয়া আমার পিতা এবং আমি যারপর নাই বিস্মিত ও মর্ম্মাহত হইয়াছি।"

১৮৮৮ খৃষ্টাব্দে মিঃ জর্জ্জ ইউলের সভাপতিত্বে এলাহাবাদে কংগ্রেসের অধিবেশন হয়। লালা লজপৎ রায় ঐ কংগ্রেসে যোগদান করেন। এই

সময় তিনি "কোহিনুর" পত্রে সার সৈয়দ আহমেদকে লক্ষ্য করিয়া পিতার লিখিত উর্দ্দু পত্র কয়খানা ইংরাজিতে অনুবাদ করিয়া প্রকাশ করেন। ইহাতে দেশে একটা চাঞ্চল্য উপস্থিত হয়। এলাহাবাদেই লজপৎ রায়ের প্রথম কংগ্রেসে যোগদান; এই সময় হইতে কংগ্রেসের প্রায় প্রত্যেক অধিবেশনেই তিনি নিয়মিত ভাবে যোগদান করিয়া আসিতেছেন। এই যে তাহার রাজনীতিক জীবনের সূত্রপাত হইল, সে জীবন-প্রবাহ উত্তরোত্তর বৰ্দ্ধিত হইয়া অবিরাম অবিশ্রাম গতিতে খরতর বেগে প্রবাহিত হইতেছে, এখন পর্য্যন্ত সে বেগ মুহূর্ত্তের তরেও মন্দীভূত হয় নাই। প্রবন্ধে ও বক্তৃতায়, অর্থে ও সামর্থ্যে একজন মানুষের যাহা করা সাধ্য, লজপৎ রায় ভারতের রাষ্ট্রীয় উন্নতির জন্য তাহাই করিয়া আসিতেছেন।

কিন্তু কেবল মাত্র ধর্ম্মনৈতিক ও রাষ্ট্রীয় আন্দোলনেই লালাজীর উদ্যম পর্য্যবসিত হয় নাই; জাতির উন্নতিবিধায়ক যত প্রকার কার্য্য আছে—সকলটাতেই লালাজী একান্ত অগ্রণী। দুর্ভিক্ষের সাহায্যকল্পে তিনি এ পর্য্যন্ত যে সব কার্য্য করিয়াছেন, তিনি যদি দেশের জন্য অন্য কোন কাজ নাও করিতেন, কেবল উহাতেই তাঁহার নাম দেশের ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে অঙ্কিত হইয়া থাকিবে। ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে পাঞ্জাবে এক ভীষণ দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হয়। এই সময় লালাজী আর্য্যসমাজের পক্ষ হইতে একটি অনাথ আশ্রম স্থাপিত করেন, এবং দুর্ভিক্ষপীড়িত জনগণকে বিশেষ ভাবে সাহায্য করেন। ১৮৯৯—১৯০০ খৃষ্টাব্দে যখন পুনরায় নানা স্থানে দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হয়, তখন তিনি অনাথ শিশুগণের সাহায্যের জন্য পূর্ব্ববৎ সাহায্য সমিতি স্থাপন করেন। তাঁহার স্থাপিত অনাথ সাহায্য সমিতি মধ্যভারত রাজপুতানা এবং পূর্ব্ববঙ্গের প্রায় ২০০০ অনাথ শিশুকে আশ্রয় দিয়া আসন্ন মৃত্যু হইতে রক্ষা করিয়াছিল। ফিরোজপুরে আর্য্যসমাজের অনাথ আশ্রম উত্তর ভারতে ঐ জাতীয় প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বৃহত্তম। লজপৎ রায় বহু বৎসর ঐ আশ্রমের সাধারণ সম্পাদকের পদে থাকিয়া অতি মূল্যবান্ কার্য্য করেন। তিনি বহু বৎসর মীরাট বৈশ্য আতুরাশ্রমের

কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির সদস্য ছিলেন। এই সব অনাথ আশ্রম ও সাহায্য ভাণ্ডারের সহিত ঘনিষ্টভাবে সংশ্লিষ্ট থাকিয়া তিনি দুর্ভিক্ষ সাহায্য ব্যাপারে এরূপ অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করিয়াছেন যে, ভারতের অতি অল্প লোকই সেইরূপ অভিজ্ঞতার গর্ব্ব করিতে পারেন।

এই জন্য দেখিতে পাই, ১৯০১ সালে ভারত সরকার যখন একটি দুর্ভিক্ষ-তদন্ত-সমিতি নিয়োগ করেন, তখন লজপৎ রায়কে ঐ বিষয়ে উপযুক্ত লোক মনে করিয়া সমিতির নিকট সাক্ষ্যদান করিবার জন্য সরকার তাঁহাকে সাদরে আহ্বান করেন। লজপৎ রায় সমিতির নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহার অভিজ্ঞতা ও মতামত ব্যক্ত করেন এবং অকাট্য যুক্তি ও প্রমাণ সহকারে সরকারের নীতির ভ্রম-প্রমাদ দেখাইয়া দেন। ফলে, সরকার তাহার নীতির পরিবর্ত্তন ও সংস্কার সাধন করিতে বাধ্য হয়েন। সরকারের অনুসৃত নীতিতে হিন্দুধর্ম্মের প্রতি বিশেষ আঘাত করা হইত, দুর্ভিক্ষ-প্রপীড়িত অনাথ হিন্দুশিশুগণ খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মযাজকগণের হস্তে পড়িয়া স্বধর্ম্মে জলাঞ্জলি দিতে বাধ্য হইত। লজপৎ রায়ের যুক্তিবলে পরাজিত হইয়া দুর্ভিক্ষ কমিশন নিম্নলিখিতরূপ মত নির্দ্দেশ করেন—"দুর্ভিক্ষের সময় সরকার পরিত্যক্ত অনাথ শিশুগণের অস্থায়ী অভিভাবক ও রক্ষক বলিয়া বিবেচিত হইবেন। দুর্ভিক্ষের অবসান হওয়ার পর একটা উপযুক্ত সময় অতিক্রান্ত না হওয়া পর্য্যন্ত সরকার অনাথগণকে পরিত্যাগ করিতে পারিবেন না। ইতিমধ্যে ঐ সকল অনাথের অভিভাবকগণকে অনুসন্ধান করিয়া বাহির করিবার চেষ্টা করিতে হইবে। কোন অভিভাবক না পাওয়া গেলে ঐ অনাথের স্বধর্ম্মাবলম্বী যে লোক তাঁহাকে লইতে চাহেন, তাঁহারই হস্তে তাহাকে সমর্পণ করিতে হইবে।"

কমিশনের এই অভিমতের উপর লজপৎ রায় এই ব্যাখ্যা যোগ করিলেন—"এই নিয়ম অনুসারে সরকারের কর্ত্তব্য এই যে, যদি অনাথের কোন অভিভাবক না মিলে, তবে তাহার স্বধর্ম্মাবলম্বী যে কোন সম্ভ্রান্ত লোক তাহাকে লইতে চাহেন, সর্ব্বাগ্রে তাহারই হস্তে অনাথকে সমর্পণ

করা। এইরূপ সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি না পাওয়া গেলে, অনাথকে ততক্ষণ পর্য্যন্ত কখনও ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের হস্তে দেওয়া হইবে না, যতক্ষণ না তাহার স্বধর্ম্মাবলম্বী ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠা। খুঁজিয়া বাহির করিবার সমগ্র চেষ্টা ব্যর্থ হয়।"

দুর্ভিক্ষ কমিশনের সাহায্যে লজপৎ রায় এই জাতীয় আরও অনেক অনুকূল নিয়ম বিধিবদ্ধ করাইয়া লয়েন।

১৯০৫ খৃষ্টাব্দে কাংগ্রা প্রদেশে এক ভীষণ ভূমিকম্প হয়। ফলে বহুলোকের প্রাণনাশ ও গৃহনাশ হয়, লোকের দুঃখদুর্দ্দশার সীমাপরিসীমা থাকে না। বিপন্ন দেশবাসীর দুঃখে লালাজার প্রাণ কাঁদিয়া উঠে। তিনি তৎক্ষণাৎ আর্য্যসমাজের পক্ষ হইতে একটি সাহায্য সমিতির গঠন করেন এবং তিনি নিজে উহার সম্পাদক নির্ব্বাচিত হন। তিনি স্বয়ং ভূকম্পপীড়িত স্থানসমূহে উপস্থিত হইয়া সাহায্য দানের নানারূপ সুবন্দোবস্ত করেন। বাস্তবিক লালাজীর সাহায্য না পাইলে এ সকল লোকের দুর্দ্দশা আরও শতগুণ বর্দ্ধিত হইত। কারণ সরকার প্রদত্ত সাহায্য অতি সামান্য ছিল এবং তাহাও সময় মত দেওয়া হয় নাই।

এদিকে রাজনীতিক্ষেত্রেও লালাজীর পরিশ্রমের বিরতি ছিল না। তিনি নানা উপায়ে কংগ্রেসের কার্য্য করিতেছিলেন। এই সময় কংগ্রেসে স্থির হয়, ইংলণ্ডের জনসাধারণের নিকট ভারতীয় প্রজাবর্গের দুঃখদুর্দ্দশার কথা জানাইবার জন্য ভারত হইতে দুইজন প্রতিনিধি পাঠান আবশ্যক। লালা লজপৎ রায় এবং গোপালকৃষ্ণ গোখলে এই কার্য্যে যোগ্যতম ব্যক্তি বলিয়া নির্ব্বাচিত হয়েন। লালাজীর বিলাতযাত্রার ব্যয়নির্ব্বাহের জন্য পাঞ্জাবের ভারতসভা ৩০০০ টাকা মঞ্জুর করেন। কিন্তু লালাজী উহা হইতে এক কপর্দ্দকও গ্রহণ করেন না, ঐ টাকা সমস্তই দরিদ্র ছাত্রগণের সাহায্যার্থ ফিরাইয়া দেন। তিনি নিজের খরচ নিজেই বহন করেন। অতিরিক্ত পরিশ্রমের ফলে লালাজীর শরীর ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছিল, কিন্তু সমুদ্রযাত্রার ফলে তাঁহার স্বাস্থ্য ফিরিয়া আসে। ইংলণ্ডে

পৌঁছিয়া গোখলে ও লজপৎ রায় নানা সভাসমিতিতে বক্তৃতা করেন। তাঁহারা শ্রমিক, ডেমোক্রেটিক ও সোসিয়ালিষ্ট দলের উপর বিশেষ প্রভাব বিস্তার করিতে সমর্থ হয়েন। ঐ সকল দল সবে অল্পদিন যাবৎ মাথা তুলিতেছিল, কিন্তু তথাপি উহাদের মধ্যে অনেক খাঁটি কর্ম্মবীর দেখা দিতেছিল, তাঁহাদের পরিশ্রম ও চেষ্টায় স্ব স্ব দল ক্রমেই ইংলণ্ডের জনসাধারণের উপর আধিপত্য বিস্তার করিতেছিল। গোখলে এবং লালাজী ঐ সকল দলপতির সহিত ভারতবিষয়ক অনেক কথার আলোচনা করেন, এবং তাঁহাদের অনেকের মনে ভারতের প্রতি ঘোর অন্যায় ও অবিচারের কথা হৃদয়ঙ্গম করাইতে সমর্থ হয়েন। অতঃপর লালাজী য়ুরোপের নানাস্থানে ভ্রমণ করিয়া গণতন্ত্রের লীলাভূমি আমেরিকায় গমন করেন। কিন্তু তিনি আমেরিকায় অধিকদিন থাকিতে পারেন না। মাত্র তিন সপ্তাহকাল অবস্থান করিয়াই তাঁহাকে পুনরায় ইংলণ্ডে ফিরিয়া আসিতে হয়। ইংলণ্ডে আসিয়া গোখলের সহযোগে পুনরায় প্রচারকার্য্যে মনোনিবেশ করেন।

লজপৎ রায় য়ুরোপ ও আমেরিকার সর্ব্বত্র তীব্র স্বাধীনতা-স্পৃহা দেখিয়া বিস্মিত হন। তাহাদের তুলনায় ভারতীয় জনসাধারণের নিশ্চেষ্টতা ও অলসতা তাঁহার মনে দারুণ ব্যথা দেয়। ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে লণ্ডনে নিখিল-ভারত কংগ্রেসের মুখপত্র "ইণ্ডিয়া" নামক সংবাদপত্রে তিনি এই সম্বন্ধে একটি সুচিন্তিত প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। তিনি বলেন—"যে কোন স্বদেশপ্রেমিক ভারতবাসী একবার ইংলণ্ডে ও য়ুরোপের অন্যান্য স্থানে ভ্রমণ করিয়াছেন, সে ভ্রমণ যত অল্পদিনের জন্যই হউক না কেন, তিনিই য়ুরোপবাসিগণের স্বাধীনতা ও স্বতন্ত্রতার তীব্রস্পৃহা দেখিয়া বিস্মিত না হইয়া থাকিতে পারেন না। ইহাই প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মধ্যে প্রভেদ। য়ুরোপীয়গণ রাজনৈতিক অধিকার লইয়া সর্ব্বদাই আন্দোলন করিতেছেন। কর্ত্তৃপক্ষ জনসাধারণের কোন অধিকারে বা সুবিধায় কিছুমাত্র হস্তক্ষেপ করিলে তাঁহারা অতিমাত্রায় অসহিষ্ণু হইয়া উঠেন। যে কোন

প্রকার বন্ধন দেখিলে অস্থির হইয়া উঠেন। পাশ্চাত্য সভ্যতার সমস্ত বিভাগের, বিশেষতঃ রাজনীতির প্রধানতম মূলমন্ত্র হইতেছে, গণতন্ত্রমূলক স্বাধীনতা। "জনগণই জনগণের শাসন করিবে" য়ুরোপের সর্ব্বত্র এই নীতিই চরম আদর্শ। গণতন্ত্র ইংলণ্ডেই হউক, রাজতন্ত্র জার্ম্মেনীতেই হউক, স্বেচ্ছাতন্ত্র রুশিয়াতেই হউক, বা প্রজাতন্ত্র ফ্রান্সেই হউক, সর্ব্বত্রই জনসাধারণ এই একই আদর্শদ্বারা অনুপ্রাণিত হইতেছে। সর্ব্বত্র এই একই ঘোষণা উচ্চারিত হইতেছে—"যে সকল স্বেচ্ছাচারী ব্যক্তি গণতন্ত্রের পথে বাধা দেয়, বা জনগণের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কার্য্য করিতে সাহস করে, তাহারা দূর হইয়া যাউক, তাহারা নিপাত যাউক।"

গোখলে ও লজপৎ রায় ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে বিলাত যান, প্রচার কার্য্য শেষ করিয়া তাঁহারা সেই বৎসরই ফিরিয়া আসেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

বঙ্গভঙ্গ ও স্বদেশী আন্দোলন

১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দ ভারতে এক নবযুগের সূচনা করিল। এই বৎসর বঙ্গভঙ্গ হইল। বড়লাট লর্ড কার্জ্জন ভেদনীতির আশ্রয় লইয়া বাংলা দেশকে দ্বিধা বিভক্ত করিলেন, বাঙ্গালী জাতিকে দুর্ব্বল করিতে প্রয়াস পাইলেন। কিন্তু লাটসাহেব যাহা আশা করিয়াছিলেন, ফল তাহার বিপরীত হইল। সমগ্র বাঙ্গালীজাতি এক মন, এক প্রাণ হইয়া বঙ্গবিভাগের বিরুদ্ধে তুমুল আন্দোলন সুরু করিয়া দিল। এই আন্দোলন কেবল বাংলা দেশেই সীমাবদ্ধ রহিল না, বাংলা ছাপিয়া শীঘ্রই ইহা ভারতের সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত হইল, আসমুদ্র-হিমাচল ভারতবর্ষকে দেশাত্মবোধের প্রবল বন্যায় প্লাবিত করিল। তীক্ষ্ণদর্শী লজপৎ রায় দেখিলেন, বঙ্গভঙ্গান্দোলন কেবল কার্জ্জন-শাসিত আমলাতন্ত্রের জিদের বিরুদ্ধে প্রদেশের লোকের প্রবল প্রতিবাদ নহে, তাহা ভারতের জাতীয় জীবনের মুক্তি কামনার প্রথম বিকাশ, তাহা ভারতের নবপ্রভাতের প্রথম সূর্য্যোদয়। ভারতের প্রাচীতে হাসিতে হাসিতে ঐ যে অরুণোদয় হইল, লজপৎ রায় তাহাকে সাদরে অভিবাদন করিলেন। বাংলা দেশের হৃদয় হইতে যে জননী সহসা অপরূপরূপে বাহির হইলেন, লজপৎ রায় তাঁহার চরণে আত্মোৎসর্গ করিলেন, তাঁহার মঙ্গল-আশীষ মাথায় তুলিয়া লইলেন।

বাঙ্গলা তখন জাগিয়াছে। বন্দে মাতরমের বিরাট ধ্বনিতে বাংলার গগন পবন বিদীর্ণ হইতেছে। বাংলার সেই তেজে দৃপ্ত সঙ্কল্পে দৃঢ়মূর্ত্তির উপর বিশ্বভারতের বিস্মিত দৃষ্টি আপতিত হইয়াছে। জুলাই মাসে সংবাদ আসিল, ভারত-সচিব বঙ্গভঙ্গ মঞ্জুর করিয়াছেন। বাঙ্গালী আহত সিংহের মত গর্জ্জিয়া উঠিল, বাংলার নেতৃবৃন্দ বিদেশীবস্ত্র-বর্জ্জন প্রস্তাব গ্রহণ করিলেন। এই নূতন অস্ত্র লইয়া বাঙ্গালী রণাঙ্গণে অবতীর্ণ হইল।

বাঙ্গালার নিহিত শক্তি যেন সহসা আত্মপ্রকাশ করিল। কবি, বক্তা, চিত্রকর, সংবাদপত্রসেবক, গায়ক, যাত্রাওয়ালা, যিনি যেরূপে পারিলেন, মাতৃসেবায় মহাযজ্ঞে যোগ দিলেন। দেশের লোক স্বদেশী কাপড় পরিতে লাগিল, সকলে মায়ের দেওয়া মোটা কাপড় মাথায় তুলিয়া লইতে লাগিল, বিলাতী বস্ত্রযজ্ঞের ধূমে বাঙ্গালার আকাশবাতাস পূত হইতে লাগিল। নবভাবের বন্যা বাঙ্গালীর বৈঠকখানা অতিক্রম করিয়া আমাদের শক্তি-কেন্দ্র অন্তঃপুরে প্রবেশ করিল। বিলাতী বস্ত্র ও কাচের চুড়ী তথা হইতে নির্ব্বাসিত হইতে লাগিল।

১৬ই অক্টোবর বঙ্গভঙ্গ হইল। সেই দিন সমগ্র বাঙ্গালায় অরন্ধন ও হরতাল হইল। বাজারে দ্রব্য-বিক্রয় হইল না, গৃহস্থের রন্ধনশালায় অগ্নি প্রজ্বলিত হইল না। লোক স্নান করিয়া মাতৃনাম কীর্ত্তন করিতে করিতে এ উহার হাতে রাখী বান্ধিয়া দিল।

ডিসেম্বরের শেষভাগে বারাণসী কংগ্রেসের অধিবেশন হইল। মাননীয় গোখলে মহাশয় ঐ কংগ্রেসের সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করিলেন। সভাপতির অভিভাষণে বঙ্গভঙ্গের বিষয় বিস্তৃতভাবে আলোচিত হইল। গোখলে বাঙ্গালার আন্দোলনকে ভারতের জাতীয় উন্নতির ইতিহাসের অন্যতম প্রধান ঘটনা বলিয়া নির্দ্দেশ করিলেন। তিনি "স্বদেশীর" সমর্থন করিলেন, কিন্তু বয়কটের পূর্ণ সমর্থন করিলেন না।

কিন্তু বারাণসী কংগ্রেসের সর্ব্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য বিষয় হইল লালা লজপৎ রায়ের বক্তৃতা। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, তীক্ষ্ণদর্শী লজপৎ রায় প্রথম হইতেই বঙ্গভঙ্গান্দোলনের স্বরূপ উপলব্ধি করিয়াছিলেন, এই আন্দোলনের মধ্যে ভারতের নব-জীবনের সূচনা দেখিতে পাইয়াছিলেন। তাই তিনি সংবাদপত্রে, সভাসমিতিতে একদিকে বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ করিতেছিলেন, অপরদিকে বাঙ্গালীদিগকে তাঁহাদের আন্দোলনে যথাসাধ্য সাহায্য করিতেছিলেন। বারাণসী কংগ্রেসে লালাজী বাঙ্গালায় দমননীতি সম্বন্ধে যে জ্বালাময়ী বক্তৃতা করিয়াছিলেন, তাহা চতুর্দ্দিকে

অগ্নিবর্ষণ করিয়াছিল। তিনি বঙ্গভঙ্গ ও আমলাতন্ত্র সরকারের চণ্ডনীতির তীব্র প্রতিবাদ করেন। অপরদিকে বঙ্গভঙ্গ ব্যাপারে তিনি বাঙ্গালাকে অভিনন্দিত করেন, কেন না, এই উপলক্ষ করিয়া বাঙ্গালা নূতন রাজনৈতিক যুগপ্রবর্ত্তনের সুযোগ পাইয়াছে। তিনি বলেন, "এ কাজের সম্মান বাঙ্গালার জন্যই ছিল, কেন না বাঙ্গালাই সর্ব্বপ্রথমে ইংরাজি শিক্ষার স্বাদ পাইয়াছে। বাঙ্গালার সিংহ এতদিন শৃগালের দশায় ছিল, লর্ড কার্জ্জন তাহাকে তাড়না করিয়া তাহাকে বুঝিতে দিয়াছেন, সে শৃগাল নহে, সিংহ। সুতরাং লর্ড কার্জ্জন আমাদের উপকার করিয়াছেন। আজ উন্নতির যাত্রায় বাঙ্গালা যে অগ্রণী হইয়াছে, সে জন্য তিনি বাঙ্গালার সৌভাগ্যে ঈর্ষানুভব করিতেছেন। বাঙ্গালা ভীরুতার অপবাদ প্রক্ষালিত করিয়া যে সাহস দেখাইতেছে, তাহা অন্যান্য প্রদেশের অনুকরণ-যোগ্য। বিলাতে লোক নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ অবলম্বন করিয়া সরকারের দৃষ্টি আকৃষ্ট করে। বিলাতের লোক ভিক্ষাবৃত্তিকে ঘৃণা করে, ভিক্ষুক ঘৃণার পাত্র।"

লালা লজপৎ রায় স্বদেশী আন্দোলন পূর্ণভাবে সমর্থন করেন। তিনি আজীবন একজন পুরাদস্তুর স্বদেশী। তাঁহার মতে "স্বদেশী" এবং "স্বদেশপ্রেম" একই কথা। তিনি বলেন,—"আমি একজন পাকা স্বদেশী। গত ২৫ বৎসর যাবৎ, সংক্ষেপতঃ যখন হইতে আমি স্বদেশ-প্রেম শব্দটির যথার্থ তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিয়াছি, তখন হইতেই আমি স্বদেশীব্রত পালন করিয়া আসিতেছি। আমার মতে "স্বদেশী" এবং "স্বদেশপ্রেম" শব্দ দুটি ঠিক একার্থবোধক। আমার ব্যক্তিগত মত এই, স্বদেশী আন্দোলনে আমাদের সর্ব্বাপেক্ষা অধিক শক্তি বিনিয়োগ করা কর্ত্তব্য। স্বদেশীকেই আমি দেশের সমস্ত দুঃখ-দারিদ্র্যের একমাত্র প্রতীকার বলিয়া মনে করি। স্বদেশীই আমাদের স্বাধীনতালাভের প্রধান উপায়। স্বদেশী আমাদের ভিতর আত্মসম্মান, আত্মপ্রত্যয়, আত্মত্যাগ, সংক্ষেপতঃ প্রকৃত মনুষ্যত্বের উদ্বোধন করিবে। স্বদেশীই আমাদিগকে শিখাইবে, আমরা কিরূপে জাতিধর্ম্মনির্ব্বিশেষে সমগ্র ভারতবাসীর কল্যাণের জন্য আমাদের

বুদ্ধি, মেধা, শক্তি ও অর্থের বিনিয়োগ করিতে পারি। আমাদের ধর্ম্ম ও বর্ণগত বৈষম্য সত্ত্বেও ইহা আমাদিগকে ঐক্যসূত্রে আবদ্ধ করিবে। স্বদেশী আমাদের সম্মুখে এমন একটি দেবমন্দির প্রতিস্থাপিত করিবে, যেখানে আমরা জাতিধর্ম্মনির্ব্বিশেষে সকল ভারতবাসী একত্র হইয়া হৃদয়ের সরলতা ও বিশ্বাসের দৃঢ়তার সহিত একই দেশমাতৃকার চরণে ভক্তিপুষ্পাঞ্জলি অর্পণ করিতে পারিব। আমার মতে স্বদেশীই মুক্ত ভারতের সাধারণ ধর্ম্ম হওয়া উচিত।"

১৯০৭ খৃষ্টাব্দে সুরাট নগরীতে নিখিল ভারত স্বদেশী সমিতির অধিবেশনে লজপৎ রায় বলিয়াছিলেন,"যদি দেশবাসিগণ জাতিধর্ম্ম-নির্ব্বিশেষে স্বদেশীর প্রসারবৃদ্ধি করিতে চেষ্টা না করেন, তবে তাঁহারা কিছুতেই অধিকতর সিদ্ধির আশা করিতে পারেন না। আমাদের দৈনন্দিন জীবনের সমস্ত বিভাগেই স্বদেশীর প্রভাব বিস্তার করিতে হইবে। তবে দেশের উন্নতি ও সমৃদ্ধিবৃদ্ধির জন্য পাশ্চাত্য দেশ হইতে যাহা শিখা দরকার, তাহা শিখিতে লজ্জিত হইবার কারণ নাই। পশ্চাদ্দিকে ফিরিয়া যাইয়া ফল নাই, জাতীয় স্বার্থকে ক্ষুন্ন করিয়া ফিরিয়া যাওয়া চলে না, তাহার দ্বারা বরং আত্ম-হত্যা করা হইবে। একটা বৃহৎ সভ্যতার নিকট হইতে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হইয়া থাকা চলে না।"

লালাজীর মতে স্বদেশী ও বয়কট এক পদার্থ, ইহাদিগকে পৃথক্ করিয়া দেখা চলে না।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

নির্ব্বাসন

লালা লজপৎ রায় চিরকাল স্পষ্টবাদী, তিনি কখনও অন্যায় সহ্য করিতে পারেন না। সুতরাং আমলাতন্ত্র সরকারের কার্য্যাবলীর বিরুদ্ধে তাঁহাকে যে প্রায়ই প্রতিবাদ করিতে দেখা যায়, ইহাতে বিস্ময়ের কিছুই নাই। কিন্তু স্পষ্ট কথা বলা সব সময়ে নিরাপদ্ নহে, বিশেষতঃ ভারতের ন্যায় পরাধীন দেশে। সুতরাং এ স্পষ্টবাদিতার জন্য লালাজীকে অনেক-বার তিক্ত ফল ভোগ করিতে হইয়াছে। ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে বেনারস কংগ্রেসে বাঙ্গালার দমননীতির প্রতিবাদকল্পে লালাজী যে তীব্র বক্তৃতা দেন, তাহার ফলে যে তাঁহাকে নানাপ্রকার নির্য্যাতন করিতে হইবে, তাহা অনেকটা তখনই অনুমান করা গিয়াছিল। উহার পরও তিনি পাঞ্জাব-সরকারের নানারূপ অন্যায়-অত্যাচারের বিরুদ্ধে তীব্র সমালোচনা করেন। ঐ সকল অবিচার-অত্যাচারের জন্য ১৯০৭ খৃষ্টাব্দে পাঞ্জাবে অশান্তি আত্ম-প্রকাশ করে। এই সকল অশান্তির কারণ লজপৎ রায় "পাঞ্জাবী" পত্রে অতি সুন্দরভাবে বিবৃত করিয়াছিলেন। তিনি বলেন, "পাঞ্জাবে যে আতঙ্ক উপস্থিত হইয়াছে এবং যাহার ফলে রাওয়ালপিণ্ডির ৫ জন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে, তাহা অনেকটা গুপ্ত পুলিশের সৃষ্টি। সরকার গুপ্ত পুলিশের হস্তে পুত্তলিকার মত নাচিতেছেন মাত্র। দুই তিন জন ব্যক্তিবিশেষের উপর পাঞ্জাবের অসন্তোষের কারণ আরোপ করা নেহাৎ মূর্খামী; যুক্তিতে ইহা টেকে না। এংলো-ইণ্ডিয়ানগণই এ দেশব্যাপী

অসন্তোষের সৃষ্টি করিয়াছেন। অসন্তোষের কারণগুলি যথাক্রমে এই :—

(১) গত বৎসর জুলাই ও আগষ্ট মাসে সি এণ্ড এম গেজেটে "সময়ের লক্ষণ" প্রভৃতি শিরোনামায় যে সকল প্রবন্ধ ও চিঠি-পত্র বাহির হয়।

(২) "পাঞ্জাবী" পত্রিকার বিরুদ্ধে মামলা, পক্ষান্তরে সি এণ্ড এম গেজেটের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনয়নে অসম্মতি।

(৩) উপনিবেশ-সংক্রান্ত আইনের পাণ্ডুলিপি।

(৪) ভূমি হস্তান্তর আইনের সংশোধক পাণ্ডুলিপি।

(৫) বারিদোয়াব খালের খালকর বৃদ্ধি।

(৬) রাওয়ালপিণ্ডি জেলায় অত্যধিক রাজস্ববৃদ্ধি।

(৭) প্লেগে অত্যধিক প্রাণ-হানি—মজুরীর বৃদ্ধি অথচ মজুরের অভাব।

এই সকল কারণের মধ্যে শেষোক্তটি দৈবতুর্ঘটনা, আর বাকী সব-গুলা এংলো-ইণ্ডিয়ানগণের স্বকৃত। যদি কেহ জিজ্ঞাসা করেন, এ সমস্যা-গুলির মীমাংসা কিরূপে হইতে পারে, তবে আমার উত্তর এই যে, অস-ন্তোষের কারণগুলি দূর করিয়া জনসাধারণের ক্ষুব্ধ হৃদয় প্রশান্ত করুন, তবেই এই সমস্যার সমাধান হইবে।"

এই সকল সত্য ও নির্ভীক সমালোচনার ফলে লজপৎ রায় এংলো-ইণ্ডিয়ান সমাজের চক্ষুঃশূল হইয়া পড়েন। এংলো-ইণ্ডিয়ান সমাজ, এংলো-ইণ্ডিয়ান সংবাদপত্র তাঁহাকে ঘোর বিপ্লববাদী বলিয়া প্রচার করিতে লাগিল এবং তাঁহাকে দণ্ড দেওয়ার জন্য সরকারকে পীড়াপীড়ি করিতে লাগিল। পাঞ্জাবের ছোট লাট সার ডি, ইবেট্‌সন এংলো-ইণ্ডিয়ানগণের মতে একমত হইয়া লজপৎ রায়কে জব্দ করিবার সুযোগ অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। সুযোগ আপনিই উপস্থিত হইল। রাজস্ব-বিষয়ক ব্যবস্থার দরুণ রাওয়ালপিণ্ডিতে প্রথম হাঙ্গামা হইল। উত্তেজিত জনতা ডাকঘর লুঠ করিল, একটা গির্জ্জা ভাঙ্গিয়া তথায় প্রবেশ করিল, এবং একটা দোকানে কিছু লুঠতরাজ করিল। সৈন্য আসিয়া হাঙ্গামা নিবৃত্তি করিল।

লালা হংসরাজের সভাপতিত্বে যে সভায় সর্দ্দার অজিত সিংহ এক বক্তৃতা করেন, সেই সভার ফলেই হাঙ্গামা হইয়াছে বলিয়া সরকার অভিমত প্রকাশ করিলেন। কয়জন জন-নায়ককে গ্রেপ্তার করা হইল, এবং যে সভায় লালা লজপৎ রায়ের বক্তৃতা দিবার কথা ছিল, সে সভা বন্ধ করিয়া দেওয়া হইল। সৈন্যেরা শ্রোতৃবৃন্দকে গুলী করিবার ভয় দেখাইতে ত্রুটি করিল না। সুযোগ বুঝিয়া ছোট লাট ইবেট্‌সন ৯ই মে তারিখে সর্দ্দার অজিত সিংহ এবং লালা লজপৎ রায়কে বিনা বিচারে ভারত হইতে নির্ব্বাসিত করিলেন।

যে আইনবলে উহাঁরা নির্ব্বাসিত হইলেন, তাহা ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দের ৩ আইন নামে পরিচিত। প্রধান প্রধান ব্যবহার-জীবের মতে ঐ ৩ আইন ইংলণ্ডের সাধারণ আইন এবং মহারাণী ভিক্টোরিয়ার ঘোষণাপত্রের মর্ম্মের সম্পূর্ণ বিপরীত। তাঁহাদের মতে ভারতীয় ব্যবস্থা-পরিষদের এরূপ অন্যায়মূলক আইন পাশ করিবার ক্ষমতা নাই। কিন্তু ভারতে আমলা-তন্ত্র শাসকগণই সর্ব্বে-সর্ব্বা, সুতরাং এ সম্বন্ধে টিপ্পনী অনাবশ্যক। এ অন্যায়ের প্রতীকারের একমাত্র উপায় ছিল, সেক্রেটারী অব ষ্টেট অর্থাৎ ভারত-সচিবের হস্তে। কিন্তু যে সরিষা দিয়া ভূত ছাড়াইবে, তাহাতেই ভূত। ভারত-সচিব লর্ড মর্লি পূর্ব্ব হইতেই এ বিষয়ে সম্মতি প্রদান করিয়াছিলেন। সুতরাং আবেদন-নিবেদনে কোন ফলই ফলিল না। এ বিষয়ে শ্রীযুত হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ তাঁহার "কংগ্রেস" গ্রন্থে লিখিয়াছেন, "ভারত-সচিব লর্ড মর্লির স্মৃতি-কথায় দেখা যায়, তিনি বিনা বিচারে নির্ব্বাসনের বিরোধী ছিলেন। যে আইনে এরূপ ব্যবস্থা হয়, তিনি সেই আইনকে 'মরিচাপড়া তরবার' বলিয়া বিদ্রূপ করিয়াছিলেন। কিন্তু কার্য্যকালে তিনি লর্ড মিণ্টোর কার্য্যের সমর্থন করিয়াছিলেন। বিলাতে পার্লামেণ্টে এ বিষয় লইয়া অনেক প্রশ্ন হয়। মর্লি তখন ভারত-সরকারের কার্য্যের সমর্থন করিয়া উত্তর দেন। তাঁহার উত্তর সম্বন্ধে রাসবিহারী ঘোষ সুরাটে অপঠিত অধিবেশনে লিখিয়াছিলেন, তাহা The most

outrageous and indefensible answers ever given since Simonde Montford invented Parliament,"

লালা লজপৎ রায়ের নির্ব্বাসন-সংবাদে ভারতের সর্ব্বত্র তুমুল আন্দোলন উপস্থিত হয়। ভারতের জনসাধারণ সংবাদপত্রে ও সভা-সমিতিতে সরকারের কার্য্যের তীব্র প্রতিবাদ করে। লালাজীর নির্ব্বাসন সংবাদ শুনিয়া বাঙ্গালার অরবিন্দ—"বন্দে মাতরম্"পত্রে ইংরাজিতে যাহা লিখিয়াছিলেন, আমরা তাহার মর্ম্মানুবাদ উদ্ধৃত করিলাম।

"মর্লির সহানুভূতিপূর্ণ শাসন এখনকার মত বতদূর যাইবার গেল—সে কেবল এখনকার মত। লালা লজপৎ রায় ব্রিটিশ-শাসিত ভারতবর্ষ হইতে নির্ব্বাসিত হইলেন। ইহার উপর মন্তব্য প্রকাশ নিষ্প্রয়োজন। টেলিগ্রামে প্রকাশ, চার দিনের জন্য এই ঘটনায় ক্রোধব্যঞ্জক সভা হইতে পারিবে না। ক্রোধব্যঞ্জক সভা? বক্তৃতা ও ভাল করিয়া লিখিবার কাল অতীত হইয়াছে। আমলাতন্ত্রের সমরাহ্বান ঘোষিত হইয়াছে। আমরা সেই আহ্বানে অগ্রসর হইব। পাঞ্জাববাসি! সিংহের জাতি! এই যে সব লোক আমাদিগকে ধূলিসাৎ করিতে চাহে, তাহাদিগকে দেখাইয়া দাও যে, তাহারা যে একজন লজপৎ রায়কে লইয়া গিয়াছে, তাহার স্থানে শত লজপৎ রায়ের আবির্ভাব হইবে। শতগুণ উচ্চ তোমাদের সমরাহ্বান ঘোষিত হউক—জয় হিন্দুস্থান!"

লালা লজপৎ রায়কে মান্দালয়ে নির্ব্বাসিত করা হয়। কেন যে তিনি নির্ব্বাসিত হইয়াছিলেন, তাহার কারণ এ পর্য্যন্ত কিছু জানা যায় নাই। নির্ব্বাসনের কয়েক মাস পরেই তাঁহাকে ও সর্দ্দার অজিত সিংহকে অব্যাহতি দেওয়া হয়। অব্যাহতি-দানেরই বা কারণ কি, তাহাও জানা যায় নাই। যে সকল এংলো ইণ্ডিয়ান কাগজ লালাজীর নামে নানারূপ অভিযোগ আনিয়াছিল, লালাজী মুক্তিলাভের পর অভিযোগের সত্যতা প্রমাণের জন্য ঐ কাগজওয়ালাদিগকে প্রকাশ্যে আহ্বান করেন। কিন্তু

কেহই তাঁহার আহ্বান গ্রহণ করিতে সাহস করে নাই। তাহাদের অভিযোগ যে সম্পূর্ণ মিথ্যা ও ভিত্তিশূন্য, উহা দ্বারা ইহাই প্রমাণ হইতেছে। এংলো-ইণ্ডিয়ান কাগজওয়ালাদের মধ্যে একমাত্র "পাইওনিয়ার" পত্রিকা লালাজীর মতের সমর্থন করিয়াছিলেন। তাঁহার নির্ব্বাসনের পর Pioneer লিখিয়াছিলেন—"The Chenab Colony Lala is depatment ridden to a degree which perhaps but a Prussian could even faintly conceive."

লালা লজপৎ রায় কোন কালেই বিপ্লবপন্থী নহেন। অন্ধকারে লোক-চক্ষুর অন্তরালে কার্য্য করাকে তিনি চিরকালই অন্তরের সহিত ঘৃণা করেন এবং বিষবৎ পরিহার করেন। চিরকালই তিনি শান্তি ও শৃঙ্খলার পক্ষপাতী : বিপ্লবের কল্পনাও তাঁহার মহৎ হৃদয়ে স্থান পাইতে পারে না। পরলোকগত মাননীয় গোখলে লালাজীর বন্ধু ছিলেন। ইংলণ্ডে কংগ্রেসের কার্য্যে লালাজীর মত ব্যক্তিকে সহযোগী পাইয়া গোখলে নিজকে গৌরবান্বিত মনে করিয়াছিলেন। লালাজী নির্ব্বাসিত হইলে গোখলে ঐ নির্ব্বাসনের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ করেন এবং কি সভা-সমিতিতে, কি সংবাদপত্রে, কি ব্যবস্থাপক সভায়, সর্ব্বত্রই লালাজীর নির্ম্মল ও বিশুদ্ধ চরিত্রের প্রশংসা করেন। লজপৎ রায়কে বিপ্লবপন্থী জানিলে মাননীয় গোখলের ন্যায় চরিত্রবান্ ব্যক্তি কখনই তাঁহার বন্ধুত্বে গৌরব অনুভব করিতেন না। সুরাট কংগ্রেসের অব্যবহিত পূর্ব্বে লোক-মান্য তিলক, শ্রীযুক্ত অরবিন্দ ঘোষ প্রমুখ জাতীয় দল লালাজীকেই সুরাট কংগ্রেসের অন্যতম সভাপতি বলিয়া মনোনীত করেন। লালাজী যদি বাস্তবিকই বিপ্লবপন্থী হইতেন, তবে কি ভারতের আপামর জনসাধারণের এরূপ শ্রদ্ধাপুষ্পাঞ্জলির অধিকারী হইতে পারিতেন? এ সম্পর্কে শ্রীমতী এনি-বেশান্ত কি বলিয়াছেন, তাহা বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেন—"লালা লজপৎ রায় কখনই অগ্নিশর্ম্মা (firebrand) নহেন—দেশবাসীকে সংযত করিবার পক্ষে তাঁহার একটা অদ্ভুত ক্ষমতা আছে।

তিনি ব্যুরোক্রেশীর হস্তে যে নিষ্ঠুর ব্যবহার পাইয়াছেন, তাহাতেও তাঁহার মেজাজ গরম হয় নাই। তিনি কর্ম্মের উপাসক—আত্মত্যাগ, স্বদেশপ্রেম, উৎসাহ ও অধ্যবসায়ের জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত। তিনি কথনই আইন অবমাননা করেন নাই, চিরকালই তিনি শান্তি-শৃঙ্খলার পরিপোষক।"

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

সুরাট কংগ্রেসে দক্ষযজ্ঞ

লালা লজপৎ রায়ের মুক্তির কিয়ৎকাল পরে সুরাট কংগ্রেসের অধিবেশন হয়। সুরাট কংগ্রেসে যে; কিরূপ দক্ষ-যজ্ঞের অভিনয় হইয়াছিল, তাহা যাঁহারা কংগ্রেসের ইতিহাস জ্ঞাত আছেন, তাঁহারা সকলেই জানেন —এ ক্ষুদ্র পুস্তকে তাহার আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। সুরাট কংগ্রেসের সভাপতির জন্য প্রথমে ডাক্তার শ্রীযুক্ত রাসবিহারী ঘোষকে মনোনীত করা হয়। তখনও লালাজী নির্ব্বাসনে ছিলেন। সৌভাগ্যক্রমে কিয়ৎকাল পরেই লালাজী কারামুক্ত হইলেন। তখন ভারতের জনসাধারণ লালা লজপৎ রায়কেই সুরাট কংগ্রেসে সভাপতি নির্ব্বাচন করিবার জন্য উৎসুক হইলেন। লোকমান্য তিলক, শ্রীযুক্ত অরবিন্দ ঘোষ প্রভৃতি জাতীয় দলের নেতৃবৃন্দ এ জন্য উদ্যোগী হইলেন। তাঁহারা মনে করিলেন, লালাজীকে নিখিল ভারত জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতি করিয়া সরকারকে দেখান দরকার যে, যাঁহাকে এংলো-ইণ্ডিয়ান সমাজ ও সরকার বিপ্লবপন্থী বলিয়া মনে করেন, তিনি বিপ্লবপন্থী নহেন, পরন্তু অখণ্ড ভারতের সর্ব্ববাদিসম্মত নেতা। তাঁহারা আরও মনে করিলেন যে, সরকারের কার্য্যের তীব্র প্রতিবাদ করিতে হইলে সরকার কর্ত্তৃক নির্য্যাতিত ব্যক্তি লালাজীর প্রতি অধিক সম্মান প্রদর্শন করাই বাঞ্ছনীয়। কিন্তু লালাজীর নির্ব্বাসন-প্রস্তাব উপস্থিত হইলে মডারেটগণ বলিলেন যে, এরূপ স্থলে সরকারের অপ্রীতিকর কোন কার্য্য করা উচিত নহে; কারণ, তাহা হইলে সরকার অচিরে এই আন্দোলন বন্ধ করিয়া দিবেন। মডারেটগণের এই ব্যবহারে দেশের জনসাধারণ অপমান বোধ করিয়াছিলেন এবং লালা লজপৎ রায়ের নির্ব্বাচন স্থির করিয়া ডাক্তার রাসবিহারী

ঘোষকে পদত্যাগ করিবার অনুরোধ পূর্ব্বক বহু টেলিগ্রাম ডাক্তার ঘোষের নিকট আসিয়াছিল। দুঃখের বিষয়, ডাক্তার ঘোষ সাধারণের এই অনুরোধে কর্ণপাত করিলেন না।

ওদিকে লালা লজপৎ রায় জাতীয় দল ও মডারেটগণের মধ্যে এরূপ আশু বিবাদের আশঙ্কা দেখিয়া সভাপতি হইতে অসম্মতি জ্ঞাপন করিলেন। এই কার্য্যের দ্বারা লালাজী যেরূপ আত্মত্যাগ ও ঔদার্য্যের পরিচয় প্রদান করিলেন, তাহার দৃষ্টান্ত ভারতের রাজনীতিক ইতিহাসে অতি বিরল। দেশবাসী একবাক্যে তাঁহাকেই সভাপতিরূপে চাহিয়াছিলেন, তিনি একটু সম্মতিসূচক ইঙ্গিত করিলে মডারেটগণের জিদ বজায় থাকিত কি না সন্দেহ। কিন্তু লালাজী নিষ্কাম স্বদেশপ্রেমিক। তিনি যশ চাহেন না, মান চাহেন না, তিনি শুধু নীরবে দেশ-মাতৃকার সেবা করিতে চাহেন। তাঁহার জন্য ভাই-ভাইর মধ্যে একটা অনৈক্য ও ভেদের সৃষ্টি হইয়া দেশ-মাতৃকার পূজার ব্যাঘাত হয়, ইহা তাঁহার আদৌ অভিপ্রেত ছিল না। তিনি হাসিমুখে সভাপতির পদ প্রত্যাখ্যান করিলেন।

কিন্তু লালাজীর আন্তরিক ইচ্ছা ও চেষ্টা সত্ত্বেও বিবাদ মিটিল না। মডারেট ও জাতীয় দলের মধ্যে ঝগড়া হইয়া সুরাট কংগ্রেস ভাঙ্গিয়া গেল —কংগ্রেস-মণ্ডপে দক্ষযজ্ঞের প্রচণ্ড লীলা প্রকটিত হইল। প্রথমে মুখামুখি, পরে না, হাতাহাতি, লাঠালাঠি, চেয়ার ও জুতা ছোড়াছুড়ি পর্য্যন্ত হইয়া গেল। গোলমালের সময় এক ব্যক্তি সভামঞ্চে দণ্ডায়মান লোকমান্য তিলকের প্রতি তাহার জুতা নিক্ষেপ করিল, কিন্তু সেই জুতা মাননীয় সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের গাত্রস্পর্শ করিয়া সার ফেরোজ শাহ মেটার গণ্ডচুম্বন করিল। মারামারি দেখিয়া পুলিশ আসিয়া সকলকে সভামণ্ডপ হইতে বাহির করিয়া দিল।

এই সময় সুরাটনগরে নিখিল ভারত স্বদেশী কনফারেন্সের অধিবেশন হয়। ঐ সভায় লালা লজপৎ রায় এই বিচ্ছেদ সম্বন্ধে বলেন—"আমাদের শত্রুগণ আমাদের মধ্যে বিরোধ ঘটাইতে চেষ্টা করিতেছে, ইহা

তাহাদের চিরন্তন স্বভাব। দুর্ভাগ্যের বিষয়, তাহাদের চেষ্টা অনেকটা সফল হইয়াছে। ইতিমধ্যেই ভাই-ভাইর মধ্যে একটা দলাদলি হইয়া গিয়াছে। ইহা বড়ই আক্ষেপের বিষয় এবং প্রত্যেক ভারতবাসীর পক্ষে লজ্জাজনক। এখন প্রত্যেক ভারতবাসীর কর্ত্তব্য ভাই-ভাইর মধ্যে পুনরায় মিলন ঘটাইতে চেষ্টা করা। আমাদের শত্রুগণ চরমপন্থী ও নরমপন্থিগণের মধ্যে একটা ঝগড়া বাধাইবার চেষ্টা করিতেছে। আমি 'চরমপন্থী' ও 'নরমপন্থী' শব্দ দুটির প্রকৃত মর্ম্ম বুঝি না,—আমি ঐ শব্দ দুটি পছন্দ করি না। আর যদি ঐ নাম দুটি রাখিতেই হয়, তবে আমার মডারেট বন্ধুগণকে সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করিতেছি, তাঁহারা যেন কেবল শত্রুগণের হস্তে ক্রীড়া না করেন। হয় ত, তথাকথিত চরমপন্থিগণের কার্য্যপদ্ধতি তাঁহাদের মনঃপূত না হইতে পারে, কিন্তু তাই বলিয়া চরমপন্থিগণকে শত্রুর হস্তে অর্পণ করা অথবা সরকার ও এংলো-ইণ্ডিয়ানগণের অবজ্ঞা ও নির্য্যাতনের বিষয়ীভূত করা কখনই বুদ্ধিমানের কার্য্য হইবে না। ইহাতে জাতীয় উন্নতির পক্ষে বাধা পড়িবে। পক্ষান্তরে, আমার চরমপন্থী বন্ধুগণকে অনুরোধ করি, তাঁহারা যেন বার্দ্ধক্যের ধীরতা দেখিয়া অধীর না হন। তাঁহারা যেন অভিজ্ঞতামূলক জ্ঞানের অবহেলা না করেন। রাজনীতি ক্ষেত্রে দলাদলি ও খাওয়া-খাই পাশ্চাত্ত্য দেশের জিনিষ, উহা ভারতের প্রকৃতিগত নহে। ভারতের হিন্দু-মুসলমানগণ যেন জাতীয় বৈশিষ্ট্যকে নষ্ট করিয়া না ফেলেন। আমাদের এ কথা বিস্মৃত হইলে চলিবে না যে, আমাদের জাতি ভুঁইফোড় নহে, ইহার প্রাচীন ইতিহাস আছে এবং সে ইতিহাসের পৃষ্ঠা অতি উজ্জ্বল। গুরুজনে ভক্তি, বয়োজ্যেষ্ঠের প্রতি সম্মান, বন্ধু-বান্ধবের প্রতি শ্রদ্ধা ও ভালবাসা—ইহা আমাদের জাতির চিরন্তন বৈশিষ্ট্য। এ সকল গুণ আমরা পূর্ব্বপুরুষগণের নিকট হইতে উত্তরাধিকারসূত্রে লাভ করিয়াছি। এই সকল সদ্গুণ পরিত্যাগ করিয়া পাশ্চাত্য সভ্যতার হট্টগোল ও উত্তেজনাপূর্ণ পদ্ধতি গ্রহণ করা কখনই সমীচীন নহে।

অন্যান্য ক্ষেত্রের ন্যায় রাজনীতিক জীবনেও শৃঙ্খলা আবশ্যক। সুতরাং আমরা উভয়দলের বন্ধুগণকে সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করিতেছি, তাঁহারা কলহ-দ্বন্দ্ব বিস্মৃত হইয়া পুনরায় মিলনমন্ত্রে দীক্ষিত হউন।"

ভারতের রাষ্ট্রীয় উন্নতি-বিষয়ে লজপৎ রায় একান্ত আশাশীল। তিনি নৈরাশ্যবাদ আদৌ পছন্দ করেন না। তাঁহার বড়ই ইচ্ছা, তাঁহার দেশ-বাসিগণও তাঁহার মত আশাশীল হয়েন। তিনি কথার চেয়ে কাজ ভালবাসেন। তাঁহার মতে একটা নির্দ্দিষ্ট লক্ষ্য স্থির করিয়া কার্য্যে অগ্রসর হওয়া উচিত। তিনি "পাঞ্জাবীতে" একখানা চিঠি লিখিয়াছিলেন, তাহাতে তিনি ভারতবাসীর রাজনীতিক লক্ষ্য এবং তাহা লাভের উপায় স্পষ্ট ভাষায় নির্দ্দেশ করেন। তিনি বলেন, "আমাদের সমগ্র চেষ্টা ও আন্দোলনের উদ্দেশ্য আমাদের সম্মুখে অতি স্পষ্ট ভাষায় উপস্থাপিত করা হইয়াছে। অতি শুভ মুহূর্ত্তেই মাননীয় দাদাভাই নৌরজী "স্বরাজ" কথাটি নির্দ্দেশ করেন। ঐ একটিমাত্র কথার মধ্যেই আমাদের যাবতীয় রাজনীতিক আশা আকাঙ্ক্ষা নিহিত রহিয়াছে। এখন হইতে আমাদের জীবনের একমাত্র কর্ত্তব্য, ঐ লক্ষ্যসাধনে একেবারে তন্ময় হইয়া যাওয়া।

তার পর প্রশ্ন এই—কি ভাবে, কি প্রণালী অবলম্বন করিয়া সে লক্ষ্যে পৌঁছিতে হইবে। খাঁটি কাজের লোকের মত প্রথমে আমাদের মূলধন, সুযোগ-সুবিধা, বাধাবিঘ্ন প্রভৃতি সমস্তই ভালরূপে তলাইয়া দেখিতে হইবে। আমার মতে আমাদের প্রধান বিপত্তি আমাদের আত্মপ্রত্যয়ের অভাব। নৈরাশ্যই যেন আমাদের জীবনের অবলম্বন, আমরা এত সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ করি যে, উহাতে আমাদের সমস্ত কার্য্য ও চিন্তার উৎস একেবারে শুকাইয়া যায়।

আমাদের বড়ই দুর্ভাগ্য যে, যদিও ধর্ম্মবিশ্বাসের জন্মভূমিতে আমাদের জন্ম, তথাপি যে আত্মপ্রত্যয় ও ইচ্ছাশক্তি সমস্ত বাধাবিঘ্নকে তৃণজ্ঞান করে, আমরা সে সব শক্তি হারাইয়া ফেলিয়াছি। বর্ত্তমানে আমরা

ঘোর সন্দেহাত্মা জীবের দলে পরিণত হইয়াছি, আমরা কেবল বিশ্লেষণই জানি, সংশ্লেষণ আদৌ জানি না। আমরা গঠন অপেক্ষা ভাঙ্গনের কার্য্যেই অধিক অভ্যস্ত হইয়া পড়িতেছি। আমরা কেবল টাকা, আনা,পাইর লাভ-লোকসান খতাইতে পারি, কিন্তু যে অসমসাহসিকতা দেশকালপাত্রের সীমা ছাপাইয়া অসাধ্য-সাধন করে, আমরা সে গুণ হারাইয়া ফেলিয়াছি। সম্মান ও ধর্ম্মের জন্য সর্ব্বস্বত্যাগের দৃষ্টান্ত যে দেশের ইতিহাসে পাতায় পাতায় সমুজ্জ্বল, সেই দেশেরই লোক আমরা পাশ্চাত্য সভ্যতার মোহে পড়িয়া আত্মপ্রত্যয় ও ইচ্ছাশক্তিশূন্য মাটীর পুতুলে পরিণত হইয়াছি। ভগবানের আশীর্ব্বাদে আমরা এখনও সমগ্র আধ্যাত্মিকতা হারাইয়া বসি নাই। ঐখানেই সোনা রহিয়াছে, এক্ষণে উহা লাভের জন্য একজন যাদুকরের যাদু-স্পর্শের প্রয়োজন। ম্যাটসিনির কথায় বলিতে গেলে আমাদের লক্ষ্যসাধনের প্রধান উপায় পার্থিব স্বার্থকে বিসর্জ্জন দিয়া তাহার আসনে সত্য ও ন্যায়ের প্রতিমা প্রতিষ্ঠা করা, ভারতবাসীকে ভালরূপে বুঝাইয়া দেওয়া সিদ্ধিলাভের একমাত্র উপায় ত্যাগে, আত্ম-স্বার্থের বিসর্জ্জনে। জাতিকে কেবল ঐক্যবদ্ধ করিলে হইবে না, তাহাকে মহৎ এবং ক্ষমতাশালী করিতে হইবে, তাহার অতীত গৌরব এবং ভবিষ্যতের ব্রতের উপযুক্ত করিতে হইবে।"

লালাজীর মতে আবেদন-নিবেদনের থালা বহিয়া স্বরাজ আনয়ন করা যাইবে না। স্বরাজ নিজের চেষ্টা দ্বারা নিজেদেরই অর্জ্জন করিতে হইবে।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

আমেরিকা প্রবাস

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে লালা লজপৎ রায় কংগ্রেসের প্রতিনিধি হইয়া যখন ইংলণ্ডে গমন করেন, তখন ইংলণ্ড হইতে তিনি একবার আমেরিকায় গমন করিয়াছিলেন। কিন্তু সেবার তিনি আমেরিকায় অধিককাল অবস্থান করিতে পারেন নাই—মাত্র ৩ সপ্তাহ কাল থাকিয়াই তাঁহাকে কার্য্যগতিকে ইংলণ্ডে ফিরিয়া আসিতে হয়। গণতন্ত্রের লীলাভূমি যুক্তরাষ্ট্র প্রদেশকে ভাল করিয়া দেখিবার জন্য লজপৎ রায় ১৯১৪ খৃষ্টাব্দে পুনরায় আমেরিকায় গমন করেন। এবার তিনি তথায় ছয় বৎসরকাল অবস্থান করেন এবং বোষ্টন হইতে নিউ অর্লিয়ানস্ ও চীকাগো হইতে সানফ্রান্সিশকো সমগ্র প্রদেশে ভাল করিয়া পরিভ্রমণ করিবার সুযোগ প্রাপ্ত হন। লালাজী যুক্তরাষ্ট্রের বহু সম্ভ্রান্ত লোকের সহিত পরিচিত ও বন্ধুত্ব-সূত্রে আবদ্ধ হন। উহাঁদের সাহায্যে লালাজী যুক্তরাষ্ট্রের যাবতীয় উল্লেখযোগ্য প্রতিষ্ঠান-সমূহ পর্যাবেক্ষণ করিবার সুযোগ লাভ করেন। আমেরিকা হইতে লালাজী যুক্তরাষ্ট্রের শাসনাধীন ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জে গমন করেন এবং তথাকার অধিবাসিগণের উন্নতি ও কার্যাকলাপ দর্শন করেন। আমেরিকা-ভ্রমণের বিবরণ ও অভিজ্ঞতা লালাজী স্বরচিত "আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র" নামক বিখ্যাত গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।

লালা লজপৎ রায় যখন আমেরিকায় অবস্থান করিতেছিলেন, তখন য়ুরোপীয় মহাসমর আরম্ভ হয়। সে সময়ে ভারতবর্ষ ব্রিটিশ-রাজের সাহায্যের জন্য অর্থভাণ্ডার ও জনভাণ্ডার খুলিয়া দেয়। ভারতের রাজপ্রতিনিধি লর্ড হার্ডিঞ্জ ভারতবাসিগণকে য়ুরোপের সমরক্ষেত্রে যুদ্ধ করিবার সুযোগ প্রদান করিয়া রাজনীতিক বুদ্ধির পরিচয় প্রদান করেন।

লর্ড হার্ডিঞ্জের কার্য্যে লালাজী সন্তোষ লাভ করেন। তিনি "ওয়েষ্ট মিনিষ্টার গেজেটে" এ প্রসঙ্গে লিখেন,—"ব্রিটিশ সরকার ভারতীয়গণকে য়ুরোপে যুদ্ধ করিবার সুযোগ প্রদান করিয়া যে মহৎ কাজ করিয়াছেন, তাহা ইতিহাসে চিরস্মরণীয় থাকিবে। ইহাতে ব্রিটিশ জাতি এবং ভারতীয় জাতি উভয়েই সভ্যজগতের চক্ষে উন্নীত হইয়াছে। এই ঘটনা ইহাই প্রমাণ করিতেছে ভারতে ব্রিটিশ রাজত্ব ব্রিটিশ তরবারির উপর প্রতিষ্ঠিত নহে—পক্ষান্তরে ব্রিটিশনীতির উপর প্রতিষ্ঠিত। ভারতবাসিগণের দিক হইতে ব্রিটিশ-শাসনের বিরুদ্ধে অনেক কথা বলিবার থাকিলেও এ কথা অস্বীকার করা যায় না যে, ভারতে ব্রিটিশ রাজত্ব ইংরাজগণের ক্ষমতা ও শাসন-নৈপুণ্যের পরিচায়ক। বড়ই আনন্দের বিষয় ব্রিটিশ পার্লামেণ্ট এবং উদারনীতিক সংবাদপত্র সমূহ সরকারের এই সিদ্ধান্তটিকে প্রীতি চক্ষে দেখিতেছেন।"

এংলো-ইণ্ডিয়ানগণ সাধারণতঃ মনে করেন, লালা লজপৎ রায় ব্রিটিশ সরকারের পরম শত্রু, ব্রিটিশ সরকারের নিন্দাবাদ ব্যতীত গুণবাদ কখনও তাঁহার মুখে শুনা যায় নাই। এংলো-ইণ্ডিয়ানগণের এ পরিবাদ যে সম্পূর্ণ মিথ্যা ও ভিত্তিহীন উপরি-উক্ত উক্তি হইতেই তাহা সপ্রমাণ হয়। লালাজী অতিশয় স্পষ্টবাদী লোক। সরকার কোন ভাল কাজ করিলে লালাজী মুক্তকণ্ঠে তাহার প্রশংসা ও সমর্থন করিয়া থাকেন; আবার—সরকার কোন অন্যায় কাজ করিলে লালাজী তাহার স্পষ্ট সমালোচনা করিতে কিছুমাত্র ভীত বা পশ্চাৎপদ হন না। কিন্তু পৃথিবীতে এক দল লোক আছে, তাহারা নিজেরা অন্যায় করিবে, কিন্তু অপর কেহ সে অন্যায়ের সমালোচনা করিলে তেলে-বেগুণে জলিয়া উঠিবে। ভারতের আমলাতন্ত্র শাসন-বিভাগের দণ্ডমুণ্ড বিধাতৃগণের স্বভাবও কতকটা এই ধরণের। যুদ্ধের সময় লালা লজপৎ রায়ের প্রতি হঠাৎ বহিষ্কারের আদেশ জারী হইল, তাঁহার ভারতে আসা নিষিদ্ধ হইয়া গেল। কেন যে এই অন্যায়-মূলক আদেশ প্রচারিত বইল, তাহার সন্তোষজনক হেতু এখনও জানা

হায় নাই। লালাজী স্বদেশে ফিরিবার অনুমতি পাইবার জন্য নানা-মতে চেষ্টা করিলেন। তাঁহার ইংলণ্ডীয় ও ভারতীয় বন্ধুগণ এই অন্যায় আদেশ রদ করিবার জন্য বিশেষ প্রয়াস পাইলেন। পার্লামেণ্টের ভারত-হিতৈষী সদস্যগণ প্রশ্নের উপর প্রশ্ন করিয়া ভারত-সচিবকে উত্যক্ত করিয়া তুলিলেন, কিন্তু কিছুতেই কিছু ফল হইল না। যুদ্ধ থাকা কালীন কিছুতেই তাঁহাকে ভারতে আসিবার অনুমতি দেওয়া হইল না। অবশেষে যুদ্ধ ক্ষান্ত হইলে যখন ভারত-সম্রাট তাঁহার মহিমান্বিত ঘোষণাপত্র প্রেরণ করেন, তখন লালাজী স্বদেশে ফিরিবার অনুমতি প্রাপ্ত হইলেন।

যখন তাঁহার প্রতি বহিষ্কার আদেশ জারী হয়, তখন লালাজী আমেরি-কায় অবস্থান করিতেছিলেন। ভারতে ফিরিবার পূর্ব্বতারিখ পর্য্যন্ত তিনি আমেরিকাতেই অবস্থান করেন। এ সময়ও তিনি অলসভাবে যাপন করেন নাই। স্বদেশের কল্যাণ যাঁহার আন্তরিক কামনা, তিনি কোন স্থানে কোন অবস্থাতেই সে কল্যাণ-সাধন হইতে বিরত থাকিতে পারেন না। এই সময় আমেরিকায় তিনি ভারতের হিতকল্পে যে সমস্ত কার্য্য করেন, সে সকল কার্য্যের প্রয়োজনীয়তার কথা বলিয়া শেষ করা যায় না। আমেরিকার লোকদিগকে ভারতের অবস্থা জানাইবার জন্য এবং ভারতের দিকে তাঁহাদের দৃষ্টি ও সহানুভূতি আকর্ষণের জন্য তিনি আমেরিকাবাসিগণের মধ্যে দশলক্ষাধিক পুস্তক-পুস্তিকা বিতরণ করেন। তিনি তথায় ইয়ং ইণ্ডিয়া বা "তরুণ ভারত" নামে একখানা পত্রিকা প্রচার করেন এবং তাহাতে ভারতের প্রতি ব্যুরোক্রেশীর অবিচার ও অত্যাচরের কথা বর্ণন করিয়া প্রবন্ধাদি প্রকাশ করেন। আমেরিকার লোকে যাহাতে ভারতবর্ষ ও ভারতবাসিগণ সম্বন্ধে সঠিক খবর জানিতে পারে, এজন্য তিনি তথায় ইণ্ডিয়ান-ব্যুরো নামক একটি ভারত-সংবাদ-প্রচারিণী সমিতির প্রতিষ্ঠা করেন। ভারতবাসিগণেরও যাহাতে আমেরিকার সংবাদ জানি-বার সুবিধা হয়, সেই উদ্দেশ্যে তিনি আর একটি প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন।

এইরূপে আমেরিকায় আসিয়া তিনি নানাভাবে নানা উপায়ে ভারতের কল্যাণসাধন করেন।

কিন্তু লালাজীর মনে শান্তি ছিল না। ১২০০০ মাইল দূরে থাকিলেও ভারতের দুর্ভিক্ষ-দারিদ্র্য-নির্য্যাতনের কথা তাঁহার কানে আসিয়া পৌছিতে লাগিল। পাঞ্জাবের নৃশংস হত্যাকাণ্ডের কাহিনী তাঁহার হৃদয়ে শেলের মত বিদ্ধ হইল। স্বদেশে ফিরিয়া যাইবার জন্য দেশে যাইয়া আর্ত্ত, ক্লিষ্ট, নিপীড়িত ভাইভগিনীগণের দুঃখে সাহায্য করিবার জন্য, তাঁহার সমস্ত প্রাণ ছটফট করিতে লাগিল। বনের সিংহ পিঞ্জরাবদ্ধ থাকিলে তাহার যেরূপ অবস্থা হয়, পাঞ্জাব-সিংহ লজপৎ রায়েরও দেশে ফিরিতে না পারিয়া ঠিক সেই অবস্থা উপস্থিত হইল। ১৯১৯ সালের আগষ্ট মাসে তিনি তাঁহার "ইয়ং ইণ্ডিয়া" পত্রে লিখিলেন—"ঠিক যে সময়ে আমার তথায় যাওয়া প্রয়োজন, সেই সময়েই ভারতশক্তি আমাকে ইংলণ্ড ও ভারতবর্ষে যাইতে দিতেছেন না। দেশে যাইতে না পারিয়া আমার মনে কিরূপ কষ্ট হইতেছে, তাহা ভাষায় প্রকাশ করিতে পারিতেছি না। ভারত এক্ষণে ভীষণ দুর্ভিক্ষ-রাক্ষসীর কবলে, ভারতের অবস্থা বড়ই শোচনীয়। গত ২৫ বৎসর যাবৎ আমি দুর্ভিক্ষ-দমন কার্য্যে সহায়তা করিয়া আসিতেছি। এই বিপৎসময়ে আমি যে দেশবাসীর জন্য কিছুই করিতে পারিতেছি না, ইহাতে আমার যৎপরোনাস্তি দুঃখ হইতেছে।

ভারতে আজকাল অনেক বিচিত্র ঘটনা ঘটিতেছে। যে সকল ভারতবাসী দেশের কাজ করিতে চাহেন, তাঁহাদের প্রকৃত কর্ম্মক্ষেত্র দেশ-বাসীর মধ্যে ভারতবর্ষেই ১২০০০ মাইল দূরে অপেক্ষাকৃত আরাম ও বিরা-মের এই স্থান তাঁহাদের উপযুক্ত কর্ম্মক্ষেত্র নহে। যুদ্ধের সময় আমি যুক্তরাষ্ট্রে রহিয়াছি বলিয়া দুঃখিত নই, কিন্তু এক্ষণে ভারতবর্ষে থাকিয়া আমার দেশবাসীর মহাসংগ্রামে যোগদান করিতে পারিতেছি না বলিয়া আমি নিজকে অপরাধী মনে করিতেছি। আমি যে ভারতে যাইতে পারিতেছি না, তাহা আমার নিজের দোষে নয় সত্য, কিন্তু এ ভাবও

আমাকে সান্ত্বনা দিতে পারিতেছে না। ভারতে স্বরাজ-প্রতিষ্ঠার জন্ম পৃথিবীর সর্ব্বত্র জনমত গঠন করা সৎকাজ সন্দেহ নাই, কিন্তু প্রকৃত কর্ম্ম-ক্ষেত্র ভারতবর্ষেই। সমগ্র পৃথিবীর জনমতও আমাদিগকে চূড়ান্তরূপে স্বরাজ দিতে পারে না। ভারতের স্বরাজ ভারতবাসিগণ কর্ত্তৃক ভারতেই অর্জ্জন করিতে হইবে। যদি কাহাকেও মতের জন্ম নিগ্রহ ভোগ করিতে হয়, তবে তাহা ভারতেই ভোগ করা দরকার। পৃথিবীর মধ্যে প্রকৃত স্বাধীনতা-স্থাপনের উদ্দেশ্যেই জনগণ বর্ত্তমান মহাযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু ইহার অব্যবহিত ফল কি হইয়াছে? যে সকল জাতি ইতিপূর্ব্বেই দাসত্ব-শৃঙ্খলে আবদ্ধ ছিল এবং পৃথিবীতে গণতন্ত্র-প্রতিষ্ঠার কথা বলিয়া যাহাদিগকে যুদ্ধে নামান হইয়াছিল, যুদ্ধের ফলে তাহাদের দাসত্বের বাঁধন আরও শক্ত হইয়াছে। এ "ইতিহাস হইতে শাসক-সম্প্রদায় কি কিছুই শিখিবে না?"

অবশেষে সরকারের মতিগতি ফিরিল। সম্রাটের ঘোষণার ফলে লালাজীকে ভারতে আসিবার অনুমতি দেওয়া হইল। যুক্তরাষ্ট্র পরি-ত্যাগ করিবার পূর্ব্বে ১৯১৯ সালের ২৮শে নবেম্বর তারিখে নিউইয়র্ক সহরে এক বিদায়ভোজে লালাজীকে অভ্যর্থনা করা হয়। সে সভায় আমে-রিকাবাসিগণ তাঁহাকে যে ভাবে অভিনন্দিত করেন, সেরূপ অভিনন্দন অতি কম লোকের ভাগ্যেই ঘটিয়া থাকে। নিউইয়র্কের বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি সে সভায় উপস্থিত ছিলেন। তাঁহারা মুক্তকণ্ঠে লালাজীর স্বদেশ-হিতৈষণা ও পাণ্ডিত্যের প্রশংসা করেন। এই প্রসঙ্গে তিনি ব্রিটিশ সর-কারের প্রতি তাঁহার মনোভাব অতি পরিষ্কারভাবে ব্যক্ত করেন। তিনি বলেন—"আমি এক্ষণে জীবনের অপরাহ্ণে, কিন্তু যখন আমার দেহ যৌবনের তেজে উদ্দীপ্ত ছিল, তখনও আমি আমার স্বদেশের সম্বন্ধে আকাশ-কুসুম রচনা করি নাই। আমি গ্রেটব্রিটেনের শক্তির কথা ভাল-রূপ জানি। সে শক্তির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিবার আমাদের অক্ষমতার বিষয়ও আমার অজ্ঞাত নহে। সত্যঘটনা যথাযথ যাহা আছে, সে বিষয়ে

আমি অন্ধ নই। আমি যুদ্ধ পছন্দ করি না, আমি রক্তারক্তি ঘৃণা করি। ব্যক্তিগতভাবে আমি ব্রিটিশ চরিত্রকে বিশেষ সম্মান ও শ্রদ্ধা করি। আমার অনেক ইংরাজ বন্ধু আছেন। বর্ত্তমান সময়ে কানাডা এবং দক্ষিণ-আফ্রিকার উপনিবেশ-সমূহ যে সব অধিকার ও সুবিধা ভোগ করিতেছে, ঠিক সেই সমস্ত অধিকার ও সুবিধা দান করিয়া (বেশীও নয় কমও নয়) যদি আমার স্বদেশকে ব্রিটিশ গণতন্ত্রের মধ্যে সমান অধিকার দান করা হয়, তবেই আমরা সন্তুষ্ট থাকিব।"

অষ্টম পরিচ্ছেদ

স্বদেশ প্রত্যাগমন

আমেরিকা হইতে যাত্রা করিয়া ১৯২০ সালের ২০শে ফেব্রুয়ারী তারিখে লজপৎ রায় বোম্বাই পৌছেন। বোম্বাইয়ে তাঁহাকে বিরাটভাবে সংবর্দ্ধনা করা হয়। সকল জাতির সকল সম্প্রদায়ের লোক অভ্যর্থনা-সভায় উপস্থিত হইয়া লালাজীকে আন্তরিক অভিনন্দন জ্ঞাপন করেন। বোম্বাই-য়ের এক বিরাট সভায় লালাজী ভারতের যুবক-সম্প্রদায়ের নিকট তাঁহার আশার বাণী প্রচার করেন। তিনি বলেন, "বলিতে গেলে আমি প্রায় সমগ্র পৃথিবী প্রদক্ষিণ করিয়া আসিয়াছি। পৃথিবীর মধ্যে স্বায়ত্তশাসন-ক্ষমতাপন্ন তিনটি বৃহৎ জাতিকে—জাপানী, আমেরিকান ও ইংরাজ—বিশেষভাবে দেখিবার ও শুনিবার সুযোগ আমি লাভ করিয়াছি। এ সব দেখিয়া শুনিয়া আমার যাহা অভিজ্ঞতা হইয়াছে, তাহাতে আমি মুক্তকণ্ঠে বলিতেছি যে, কোন কোন বিষয়ে বর্ত্তমান কালোপযোগী শিক্ষার অভাব ব্যতীত আমরা পৃথিবীর অন্য কোন জাতি অপেক্ষাই হীন নহি। ভবিষ্যতে যদি সময় পাই, তবে আমাদের প্রত্যেক বিভাগের তুলনা করিয়া আমি আমার কথার সত্যতা প্রমাণ করিব। তবে আমরা হীন কিসে? আমরা একতায় হীন, বর্ত্তমান কালোপযোগী উপায় অবলম্বনে হীন এবং বর্ত্তমানের চালাবাজীতে হীন। আমরা যদি "বিলকুল" মিথ্যা বলিবার কৌশল আয়ত্ত করিতে পারিতাম, বর্ত্তমানকালের অত্যাচার-অনাচার করিবার প্রণালী শিখিতে পারিতাম, তবে পৃথিবীর যে কোন জাতি আমাদিগকে স্বায়ত্তশাসনের উপযুক্ত বলিয়া মনে করিত। ভগবানের আশীর্ব্বাদে আমরা এরূপ যোগ্যতা অর্জ্জন করিতে চাহি না।

আমি তোমাদিগকে আমাদের প্রাচীন সভ্যতার আদর্শকে আঁকড়াইয়া ধরিতে অনুরোধ করিতেছি। আমার উপদেশ—তোমরা বাক্যে, চিন্তায়

কার্য্যে সর্ব্বত্র সত্য ও ন্যায়ের পথে বিচরণ করিবে। সত্যই একমাত্র বল, "সত্যং বলং কেবলম্ নানৃতম্।" তোমরা সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতার উপাসক হইবে।

ভারতে স্বরাজ প্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে তোমাদিগকে অনেক কাজ করিতে হইবে। যাহাতে হিন্দু মুসলমান দুই ভাই প্রীতি ও ঐক্য-সূত্রে আবদ্ধ হয়, ভারতের হিতকামী ব্যক্তিমাত্রেরই তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে। হিন্দু-মোস্লেম ঐক্যরূপ দৃঢ়ভিত্তির উপরই ভারতের জাতীয়তা প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে।

প্রত্যেক ভারতবাসীকেই স্বাবলম্বনের পূতমন্ত্রে দীক্ষিত হইতে হইবে, আত্মশক্তিতে বিশ্বাস-স্থাপন করিতে হইবে। আত্মচেষ্টা দ্বারাই জাতির গঠন হইয়া থাকে। আমরা অন্যের উপদেশ, অন্যের পরামর্শ গ্রহণ করিতে কুণ্ঠিত হইব না, কিন্তু কোন মতেই অন্যের আদেশ শুনিব না, অন্যের কর্ত্তৃত্ব গ্রহণ করিব না।

হে ভারতের যুবকগণ! তোমরা নিজের পায়ে দাঁড়াইতে শিখ, নিজের হাতে নিজের কাজ করিতে শিখ। ভৃত্যের উপর নির্ভর করিও না, অন্যের উপর নির্ভর করিও না, সর্ব্ববিষয়ে নিজের উপর নির্ভর কর, নিজের চেষ্টায় মুক্ত হইতে শিখ। মুক্তি বাহির হইতে আসে না, মুক্তি আকাশ হইতে পড়িবে না। মুক্তি নিজের ভিতর হইতে আসিবে, নিজের দেশের ভিতর হইতে আসিবে। তোমরা মুক্তির উপাসক হও, মুক্তি-দেবীর পদতলে নিজ হস্তে ভক্তি-পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিয়া নিজকে কৃতার্থ কর।

ভারতের যুবকগণ, তোমরা কি স্বরাজ চাও? তোমরা কি শুধু মুখেই স্বরাজ চাও, না কাজেও স্বরাজ চাও? তোমরা যে মুহূর্ত্তে স্বরাজ চাহিবে, ঠিক সেই মুহূর্ত্তেই স্বরাজ পাইবে। স্বরাজ বিধাতার দান, স্বরাজ মানুষের ধর্ম্ম। কেহ কাহারো নিকট হইতে স্বরাজ ঠেকাইয়া রাখিতে পারে না।

হে তরুণ ভারতের যুবকগণ! তোমরা জাগ, নিজকে জাগাও, দেশ-বাসীকে জাগাও। আমার কথায় বিশ্বাস কর, তোমরা জগতের কোন জাতি অপেক্ষাই নিকৃষ্ট নহ। আজ তোমাদের দেশজননী দীনা, হীনা, মলিন-বদনা। ইহার কারণ কি, বলিতে পার? ইহার একমাত্র কারণ তোমাদের দুর্ব্বলতা, তোমাদের মনের দুর্ব্বলতা, চরিত্রের দুর্ব্বলতা, নিজের প্রতি, জাতির প্রতি, স্বদেশের প্রতি তোমাদের বিশ্বাসের অভাব। "তোমরা জাগ, আত্মবলে বলীয়ান্ হও, আত্মশক্তিতে বিশ্বাসস্থাপন কর। উত্তিষ্ঠত, জাগ্রত, প্রাপ্যবরান্নিবোধত।"

বোম্বাই হইতে লজপৎ রায় তাঁহার কর্ম্মভূমি লাহোরে গমন করেন। লাহোরবাসিগণ তাঁহাকে বিপুলভাবে সংবর্দ্ধনা করে। লাহোরে লালাজীর সভাপতিত্বে একটি বিরাট সভার অধিবেশন হয়, সভায় মাননীয় শ্রীনিবাস শাস্ত্রী নূতন শাসন-সংস্কার সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। সভায় লালাজী শাসন-সংস্কার সম্বন্ধে কোন নির্দ্দিষ্ট মতামত প্রকাশ করেন না। শাসন-সংস্কার সম্বন্ধে লালাজীর মত প্রথমে বিশেষ প্রতিকূল ছিল না বলিয়াই মনে হয়। তিনি একস্থানে বলিয়াছিলেন, "মণ্টেগুচেমস্ফোর্ড স্কীম যখন প্রথম প্রকাশিত হয়, তখন আমার মনে এক নবীন আশার সঞ্চার হয়। আমার মনে হয়, সে শুভ দিন বুঝি উপস্থিত—যখন আমার দেশবাসী বিনা রক্তপাতে তাহার চির-অভীপ্সিত স্বাধীনতাধন পাইতে চলিল। কিন্তু ক্রমেই সে আশালোক নির্ব্বাপিত হইতে থাকে। ক্ষীণালোকের যাহা সামান্য অবশিষ্ট থাকে, হাণ্টার কমিটীর বিবরণ এবং তৎসম্পর্কে ভারত-সচিবের শিখাতে তাহা একেবারে নির্ব্বাপিত হইয়া যায়।"

হাণ্টার কমিটীর সাক্ষ্যে পাঞ্জাব অত্যাচারের ভিতরের অনেক লোম-হর্ষণ কাহিনী আত্মপ্রকাশ করে। ঐ সব শুনিয়া লালাজী যৎপরোনাস্তি বিস্মিত ও মর্ম্মাহত হন।

হাণ্টার কমিটী হইতে তিনি অনেক আশা করিয়াছিলেন, কিন্তু কমিটীর সিদ্ধান্ত দেখিয়া তাঁহার আশালতা সমূলে উৎপাটিত হয়।

ইহার পরও কি সরকারের সহিত সহযোগিতা করা চলে? লালাজী বলিলেন, "যে নৃশংস কর্ম্মচারিগণের হস্ত আমার নিরপরাধ ভাইভগিনী-গণের হৃদয়-শোণিতে রঞ্জিত, আবার তাহাদেরই সঙ্গে কি করিয়া সহ-যোগিতা করিতে পারি?" ১৯২০ সালে তিনি তাঁহার "বন্দে মাতরম্" পত্রিকায় পাঞ্জাবের সংস্কৃত কাউন্সিলের সদস্যপদপ্রার্থী না হওয়ার কারণ লিখিলেন।

(১) "হাণ্টার কমিটীর রিপোর্ট সম্বন্ধে ভারত-সরকার ও ভারত-সচিবের সিদ্ধান্ত দেখিয়া বুঝা যায়, তাঁহাদের মতে সার মাইকেল ওডায়ারের সমস্ত কার্য্যই ঠিক হইয়াছে এবং এখানে সেখানে দু'চার জন কর্ম্মচারীর ব্যক্তিগতভাবে ন্যায়ের সীমালঙ্ঘন করা ব্যতীত ইহাতে আর কোনই অন্যায় করা হয় নাই। ইহা হইতে এই বুঝায় যে, সার মাইকেল ওডায়ারের বিরুদ্ধে পাঞ্জাবের শিক্ষিত সমাজের যে অভিযোগ বিদ্যমান, তাহা একান্ত ভিত্তিহীন ও অর্থশূন্য। সরকারের এই সিদ্ধান্তে পাঞ্জা-বের শিক্ষিত সমাজের পক্ষে নূতন শাসন-সংস্কারে যোগ দিয়া কাজ করা অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছে। সার মাইকেল ওডায়ার পাঞ্জাবের শিক্ষিত সমাজকে ঘৃণার চক্ষে দেখিতেন। কেবল রায় ও জমিদারগণের উপরই তাঁহার অনুগ্রহদৃষ্টি পতিত হইত। এই শ্রেণীর লোক তাঁহার মনস্তুষ্টি-বিধানের জন্য শিক্ষিত সমাজকে "কট্‌কটে ব্যাঙ" বলিয়া বিদ্রূপ করিত। সংস্কৃত আইন অনুসারে যে নূতন নিয়ম-কানুন প্রণীত হইয়াছে, তাহাতেও ঠিক একই ভাবের ধারা দেখিতে পাওয়া যায়। সার এডওয়ার্ড ম্যাক্‌লাগানের বিনয়নম্র ব্যবহারে সরকারের বাহিরের দিক্‌টার কিছু পরিবর্ত্তন হইয়াছে বটে, কিন্তু মূল পুরাতন নীতির কোনই পরিবর্ত্তন ঘটে নাই।

(২) সামরিক আইনের রাজত্বকালে যে সকল কর্ম্মচারী পাঞ্জাবের শিক্ষিত সমাজকে লাঞ্ছিত, অপমানিত ও পদদলিত করিয়াছে, এখনও তাহারা তাহাদের পূর্ব্ব-সিংহাসনে অধিষ্ঠিত রহিয়াছে। যে কর্ণেল

ওরায়ান গুর্জ্জানোয়ালার উকীলদের প্রতি বর্ণনাতীত ভীষণ অত্যাচার করিয়াছে, যে মেজর কাওয়ার্ড স্মিথ হাতের ছড়ি দিয়া ভারতীয় মহিলা-গণের ঘোমটা খুলিয়া তাঁহাদিগকে অকথ্য ভাষায় গালাগালি দিয়াছে, তাহারা এখনও স্ব স্ব পদে প্রতিষ্ঠিত আছে। চীফ সেক্রেটারী মিঃ টম্‌সন আবার আসিবার উপক্রম করিয়াছে। সংক্ষেপতঃ যে সকল কর্ম্ম-চারী সার মাইকেল ওডায়ারের দক্ষিণ হস্তস্বরূপ ছিল, তাহারা সকলেই এক হয়, পুরাতন পদ দখল করিয়া বসিয়াছে, না হয়, দখল করিতে উদ্যত হইয়াছে। এই সকল কর্ম্মচারীই পাঞ্জাবের নূতন কাউন্সিলের সরকারী সদস্যপদে বৃত হইবে। অবশ্য, ইহাদের বিরুদ্ধে আমার কোন ব্যক্তিগত আক্রোশ নাই; অথবা ইহারা আমার ব্যক্তিগতভাবে কোন ক্ষতি করে নাই। কিন্তু যে কোন ভারতবাসী কাউন্সিলে যাইবেন, কর্ত্তব্যানুরোধে বাধ্য হইয়া তাঁহাকে এই সকল কর্ম্মচারীর সাক্ষাৎসম্পর্কে আসিতে হইবে, তাহাদের সহিত কাজ কারবার করিতে হইবে। কিন্তু সামরিক আইনে পাঞ্জাবের পক্ষে যে ক্ষত করা হইয়াছে, তাহা এখনও এত সজীব আছে যে, কাউন্সিলে যাইয়া ঐ সকল কর্ম্মচারীর সহিত সহযোগিতা করা আমার পক্ষে অসম্ভব। আমার হৃদয় একেবারে ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। এই ক্ষত হৃদয় লইয়া আমি কাউন্সিলে যাইতে পারি না। যদিও ব্যক্তিগত-ভাবে তাহারা আমার ক্ষতি করে নাই, তথাপি যে সকল লোক আমার ভাইগণকে নিষ্ঠুরভাবে বেত্রাঘাত করিয়াছে, তাঁহাদিগকে নানাভাবে লাঞ্ছিত, দলিত, নিগৃহীত করিয়া বর্ব্বরতার পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছে, আত্ম-সম্মানের মাথা খাইয়া কিছুতেই এরূপ লোকের সহিত সহযোগিতা করিতে পারি না।

"যদি ভারতীয় এবং সরকারী সদস্যগণ একযোগে বন্ধুভাবে পরস্পর পরস্পরের পরামর্শ লইয়া কাজ করিতে পারেন, তবেই নবগঠিত ব্যবস্থা-পরিষদ আমাদের উপকারে আসিতে পারে। কিন্তু পাঞ্জাবের বর্ত্তমান অবস্থায় এই আশা ফলবতী হইবার কোন সম্ভাবনা দেখা যায় না। যদি

সিভিল মিলিটারী গেজেট পাঞ্জাবের য়ুরোপীয় কর্ম্মচারিগণের মনোভাব ঠিক ব্যক্ত করিয়া থাকে, তবে আমি নিঃসন্দেহে বলিতে পারি—ভারতীয় ও য়ুরোপীয়গণের একযোগে কাজ করিবার সময় এখনও আসে নাই। আমি অন্তরের সহিত কামনা করি, ঐ সময় শীঘ্র আসুক, কিন্তু যদি বলা হয় যে, সময় এখনই আসিয়াছে, তবে সত্যের ঘোর অপলাপ করা হয়। এখন পর্য্যন্ত তাঁহারা শাসক এবং আমরা শাসিত। সরকারের মুখপত্র পাঞ্জাবের পাবলিসিটি বোর্ড ঠিক ঐ কথাই বলিতেছে। যত দিন পর্য্যন্ত আমাদের মধ্যে শাসক ও শাসিতের সম্বন্ধ বিদ্যমান, তত দিন পর্য্যন্ত একযোগে কাজ করা সুকঠিন। তাঁহারাও আমাদিগকে সন্দেহের চক্ষে দেখেন, আমরাও তাঁহাদিগকে সন্দেহের চক্ষে দেখি। অতএব কাউন্সিলে প্রবেশ করিয়া আমি দেশের কোন কাজেই লাগিতে পারিব না, ইহাই আমার ধারণা। সুতরাং উহাতে না যাওয়াই আমার পক্ষে শ্রেয়স্কর।"

নবম পরিচ্ছেদ

কলিকাতা স্পেশ্যাল কংগ্রেসে সভাপতি

১৯১৯ সালে পাঞ্জাব অনাচারের লীলাভূমি অমৃতসরে কংগ্রেসের অধিবেশন হইল। রাজপুরুষরা, প্রথমে যাহাতে তথায় অধিবেশন না হইতে পারে, তাহার জন্য যথাসম্ভব চেষ্টা করিলেন; শেষে পরাভূত হইয়া আর বাধা দিলেন না। এই অধিবেশনে পাঞ্জাবী অনাচারের তীব্র প্রতিবাদ করা হইল। অমৃতসর কংগ্রেসের পর পাঞ্জাবের ব্যাপার সম্বন্ধে দুইখানি রিপোর্ট প্রকাশিত হইল—(১) কংগ্রেস কর্তৃক নিযুক্ত তদন্ত সমিতির—(২) সরকার কর্ত্তৃক নিযুক্ত হাণ্টার কমিটীর।

ওদিকে মিত্রশক্তিগণ তুর্কীকে যে সন্ধিসর্ত্ত প্রদান করেন, তাহাতে মুসলমান-সমাজের মধ্যে এক দারুণ বিক্ষোভের সঞ্চার হয়। ফলে মুসলমানগণ খেলাফৎ আন্দোলন আরম্ভ করিলেন। প্রথমে কথা ছিল, তুর্ক-সাম্রাজ্য যুদ্ধের পূর্ব্বে যেমন ছিল, তেমনই রাখা হইবে—সেই কথায় নির্ভর করিয়া ভারতের মুসলমান সৈনিকগণ তাহাদের ধর্ম্মগুরু তুরস্কের সুলতানের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করিয়াছিল। কিন্তু এখন সে কথা থাকিল না। তাই কেহ কেহ দেশত্যাগ করিয়া যাইতে আরম্ভ করিলেন—মহাসঙ্গীন ব্যাপার আরম্ভ হইল। তাঁহারা সরকারের সহিত সহযোগিতা বর্জ্জন করিলেন। মহাত্মা গন্ধী সেই মতে মত দিলেন।

ভারতের রাজনীতিক্ষেত্রে চারিটি সমস্যা উপস্থিত হইল :—

(১) পাঞ্জাবী ব্যাপার।

(২) খেলাফৎ সমস্যা।

(৩) নূতন শাসন-সংস্কার-নিয়ম।

(৪) সহযোগিতা বর্জ্জন ।

১৯২০ সালের ৪ঠা সেপ্টেম্বর এই বিষয়-চতুষ্টয়ের বিবেচনার জন্য কলিকাতায় কংগ্রেসের এক বিশেষ অধিবেশন হইল। ভারতবাসীর সর্ব্বসম্মতিক্রমে লালা লজপৎ রায় এই কংগ্রেসের সভাপতিপদে বৃত হইলেন। লালাজীকে সভাপতির আসনে বসাইয়া দেশবাসী আপনাদিগকে গৌরবান্বিত মনে করিলেন। লালাজী কলিকাতা আগমন করিলে তাঁহাকে যেরূপ বিরাটভাবে অভ্যর্থনা করা হয়, এরূপ অভ্যর্থনা এক মহাত্মা গন্ধী ব্যতীত ভারতের অতি কম নেতার ভাগ্যেই ঘটিয়াছে। সভাপতির অভিভাষণে লালাজী দীর্ঘ দুই ঘণ্টাকাল বক্তৃতা করেন। তিনি যখন তাঁহার মর্ম্মস্পর্শী ভাষায় পাঞ্জাবের অনাচার-কাহিনী বিবৃত করিতে লাগিলেন, তখন বিরাট শ্রোতৃমণ্ডলীর মধ্যে অতি কম লোকই অশ্রু-সংবরণ করিতে সমর্থ হইয়াছিল। তিনি লিখিত অভিভাষণ পাঠ করিলেন না, কেবল সময় সময় দেখিতে লাগিলেন। নহিলে আগাগোড়া বক্তৃতাই করিলেন। তাঁহার সেই জ্বালাময়ী ভাষা, সেই তীব্র বিদ্রূপ, সেই মর্ম্মচ্ছেদী আক্ষেপ—কেমন করিয়া বুঝাইব ?

পাঞ্জাবের সুদীর্ঘ কাহিনী শেষ করিয়া তিনি যখন খেলাফতের কথা আরম্ভ করেন, তখন মুসলমানগণ একবার "আল্লাহো আকবর" রবে সভা-মণ্ডপ বিকম্পিত করিয়া তুলেন। তাঁহারা তাঁহাকে হিন্দীতে বক্তৃতা করিতে অনুরোধ করেন। লালাজী অল্পক্ষণ হিন্দীতে বক্তৃতা করিয়াই বলিলেন—"আমার আশঙ্কা হইতেছে, আমি হিন্দীতে বক্তৃতা করিতে পারিব না, আমি আমার অভিভাষণই পাঠ করি।" লালাজী হিন্দীতে বক্তৃতা না করিয়া ভালই করিয়াছিলেন। কারণ, তাঁহার জ্বালাময়ী হিন্দী বক্তৃতা শুনিলে, তাঁহার অনলবর্ষী ভাষায় খেলাফতের অনাচার-কাহিনী শ্রবণ করিলে শ্রোতৃবৃন্দ, বিশেষতঃ মুসলমান শ্রোতৃবৃন্দের চঞ্চল হইয়া উঠার সম্ভাবনা ছিল।

বিপুল জয়ধ্বনির মধ্যে লালাজীর অভিভাষণ সমাপ্ত হয়। প্রথম দিনের

অভিভাষণ ব্যতীত কংগ্রেসের শেষ দিনও লালাজী একটি নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা করেন।

কলিকাতা কংগ্রেসে লালা লজপৎ রায় যে বক্তৃতা করিয়াছিলেন, তাহা সর্ব্বতোভাবে তাঁহার মত ত্যাগী স্বদেশসেবকের উপযুক্ত হইয়াছিল। তিনি যে মঞ্চ হইতে তাঁহার দেশবাসীকে সম্বোধন করিয়াছিলেন, সে মঞ্চ জাতীয় মহাসমিতির সভাপতির মঞ্চ—তাহা দলাদলির কোলাহল হইতে বহু উচ্চে অবস্থিত—তাহা গত ৩৫ বৎসরের দেশসেবার পুণ্যে পূত, তাহাতে ত্যাগীরই অধিকার। এই মঞ্চ হইতে বহু স্বদেশসেবক যথাবুদ্ধি কংগ্রেসের মত প্রচার করিয়াছেন, দেশবাসীকে কর্ত্তব্যের পথে পরিচালিত করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন। দেশের সঙ্কটকালে দেশের লোক এই মঞ্চের দিকে চাহিয়া আপনাদের কর্ত্তব্য-নির্দ্ধারণের জন্য অপেক্ষা করিয়াছেন, সকলেই এ কংগ্রেসে আপনার মতের সমর্থন পাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। লাঞ্ছনার গৌরব মুকুট মস্তকে লইয়া লালা লজপৎ রায় সেই মঞ্চে আরোহণ করিয়াছিলেন, তাঁহার কার্য্যে ও তাঁহার উপদেশে সে মঞ্চের গৌরব বর্দ্ধিত হইয়াছে। যে চারিটি গুরুতর বিষয়ের আলোচনার জন্য এই কংগ্রেস আহূত হইয়াছিল, লালাজী প্রত্যেকটি বিষয়ে অতিশয় নিপুণতা ও বিজ্ঞতা প্রদর্শন করিয়াছিলেন।

কলিকাতা কংগ্রেসের সর্ব্বপ্রধান আলোচ্য বিষয় ছিল—সহযোগিতাবর্জ্জন। এ বিষয়ে লালাজী তাঁহার প্রথম অভিভাষণে কোন মত প্রকাশ করিতে দ্বিধা বোধ করিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন, "সহযোগিতাবর্জ্জন সম্বন্ধে আমার মতামত গোপন করি নাই। তথাপি এ সম্বন্ধে আমি কংগ্রেসে আমার মতামত প্রকাশ্যে জ্ঞাপন করিতে সাহস করি না। কেন না, আমি কংগ্রেসের সেবক। আমি কংগ্রেসের সভাপতি বলিয়া আমি কংগ্রেসের প্রভু নহি, কংগ্রেসই আমার প্রভু। সুতরাং আমার মতামত প্রকাশ করিয়া আমি কংগ্রেসকে উহা লইতে বাধ্য করিতে পারি না, বরং কংগ্রেস কি মতামত প্রকাশ করেন, তাহা শুনিয়া

আমি আমার কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করিব। কংগ্রেস যদি বলেন, নন-কো-অপারেশন গ্রহণীয়, তাহা হইলে আমি সেই আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিব, আর কংগ্রেস যদি বলেন, নন-কো-অপারেশন গ্রহণীয় নহে, তাহা হইলে আমি সেই আদেশও মাথা পাতিয়া লইব।"

এই কয়টি কথা হইতেই আমরা লালাজীর অন্তঃপ্রকৃতির পরিচয় পাই। লালাজী নিজকে দেশমাতৃকার দীনাতিদীন সেবক বলিয়া মনে করেন। যদিও তিনি কংগ্রেসের অন্যতম নেতা, কংগ্রেসের সেবায় জীবন-মন উৎসর্গ করিয়াছেন, তথাপি তিনি কোন কালেই সার ফেরোজশাহ মেটা প্রমুখ পূর্ব্বকালের দেশনায়কের ন্যায় কংগ্রেসে নিজের একাধিপত্য বিস্তার কারতে প্রয়াস পান নাই, নিজের কথাকে কংগ্রেসের কথা বলিয়া চালাইয়া দিতে চাহেন নাই। কংগ্রেস সমগ্র ভারতের প্রতিনিধি, তিনি সেই কংগ্রেসকে প্রভু বলিয়া মানিতেছেন, তাহার আদেশ মাথা পাতিয়া লইতেছেন। দেশহিতে উৎসৃষ্টপ্রাণ লালা লজপৎ রায়ের এরূপ বিনয়-নম্রতা, এরূপ অহমিকাশূন্যতা তাঁহাতেই সম্ভব।

কলিকাতা কংগ্রেসে মহাত্মা গন্ধীর সহযোগিতা-বর্জ্জন প্রস্তাব গৃহীত হয়। প্রস্তাবটি এই—

খেলাফৎ ব্যাপারে ভারত ও বিলাত-সরকার মুসলমান প্রজার প্রতি কর্ত্তব্যপালনে পরাঙ্মুখ হইয়াছেন, প্রধান মন্ত্রী মহাশয়ও তাঁহার প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করিয়াছেন, মুসলমান ভ্রাতাদের এই ধর্ম্মসম্পর্কিত দুদ্দিনে ন্যায়সঙ্গত সাহায্য করা প্রত্যেক হিন্দুর কর্ত্তব্য। ১৯১৯ সালের এপ্রিল মাসের অনাচারের সময় পাঞ্জাবের নির্দ্দোষ প্রজাগণকে উক্ত সরকারদ্বয় রক্ষা করিতে পারেন নাই বা রক্ষা করেন নাই; পরন্তু বর্ব্বরোচিত অনাচার-অনুষ্ঠানকারীদিগের দণ্ডবিধানের কোনও ব্যবস্থা করেন নাই। তাঁহারা মূল দোষী সারমাইকেল ওডায়ারকে সকল অপরাধ হইতে মুক্তি দিয়া তাঁহার কার্য্যের প্রশংসাবাদ করিয়াছেন। পার্লামেণ্টের কমন্স ও লর্ড সভায় পাঞ্জাব সম্পর্কে যে বাদানুবাদ হয়, তাহাতেও দেখা গিয়াছে যে, বিলাতের

অধিকাংশ লোক এ দেশের লোকের ব্যথায় বিন্দুমাত্র দুঃখিত বা ব্যথিত নহেন, বরং তাঁহারা পাঞ্জাবে অনুষ্ঠিত ঘোর অত্যাচার-অনাচারের সমর্থন করেন। বড় লাট সম্প্রতি ব্যবস্থাপক সভায় যে বক্তৃতা করিয়াছেন, তাহাতেও জানা যাইতেছে যে, তিনি পাঞ্জাব বা খেলাফৎ ব্যাপারে অণুমাত্র অনুতপ্ত নহেন।

এই সকল কারণে কংগ্রেস বিবেচনা করেন যে, উপরি-উক্ত দুইটি অসন্তোষের কারণ দূর না হইলে কিছুতেই ভারতবাসী শান্তি পাইবে না; অসন্তোষ দূর করিবার জন্য একমাত্র উপায় আছে। সেণ্ট্রাল খেলাফৎ কমিটী যে ক্রমবর্দ্ধনশীল সহযোগিতা-বর্জ্জননীতি প্রবর্ত্তন করিয়াছেন, উহাই কংগ্রেসকে গ্রহণ করিতে হইবে, অন্যথা পাঞ্জাব ও খেলাফৎ সমস্যার সমাধান হইবে না।

এই নীতি গ্রহণের প্রথম সোপান হইতেছে:—

(১) সরকারী খেতাব ও অবৈতনিক চাকুরী ত্যাগ করা।

(২) সরকারী লেভি, দরবার প্রভৃতি ব্যাপারে যোগদান না করা।

(৩) সরকারের যে কোনরূপ সাহায্যপ্রাপ্ত স্কুল-কলেজ হইতে ছাত্রগণকে ছাড়াইয়া লওয়া এবং সেই স্থানে জাতীয় স্কুল-কলেজ প্রতিষ্ঠা করা।

(৪) আইন-ব্যবসায়ীদিগের ব্যবসা ত্যাগ করা এবং সালিশী আদালত প্রতিষ্ঠা করা।

(৫) সামরিক জাতিগণের, কেরাণীগণের এবং মজুরগণের মেসোপটেমিয়ায় চাকুরী গ্রহণে অস্বীকার করা।

(৬) সংস্কৃত ব্যবস্থাপক সভার নির্ব্বাচন ত্যাগ করা। কংগ্রেসের নিষেধসত্ত্বেও যাঁহারা নির্ব্বাচনপ্রার্থী হইবেন, ভোটারগণ তাঁহাদিগকে ভোট দিবেন না।

ইহাতে স্বার্থত্যাগ আবশ্যক; কিন্তু স্বার্থত্যাগ না করিলে কোনও জাতিই উন্নত হয় না। সেই হেতু দেশের লোককে এই স্বার্থত্যাগে

অভ্যস্ত করাইবার জন্য এই প্রথম পথ নির্দ্দেশ করা হইল। সুতরাং এই সঙ্গে "স্বদেশী" গ্রহণ করাও কর্ত্তব্য।"

লালাজী তাঁহার প্রথম অভিভাষণে অসহযোগ সম্বন্ধে কোন মতামত প্রকাশ করেন না। কিন্তু কংগ্রেসের কার্য্য শেষ করিবার সময় তিনি যে বক্তৃতা করেন, তাহাতে অসহযোগ সম্বন্ধে তাঁহার মতামত অকুণ্ঠকণ্ঠে প্রকাশ করেন। লালাজী শেষ বক্তৃতায় যাহা বলেন, তাহার সারমর্ম্ম নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি।

"আরম্ভে লালাজী সৌজন্যের ও অতিথিসৎকারের জন্য বঙ্গদেশকে ধন্যবাদ দিয়া বলেন, বাঙ্গালার নিকট তিনি ইহাই আশা করিয়াছিলেন। রাজনীতিক ধীশক্তিতে বঙ্গদেশই ভারতের নেতৃত্ব করিয়া আসিয়াছে। আজ বাঙ্গালা যদি সেই নেতৃত্বভার ত্যাগ করিয়া থাকে, তবে তিনি সেই জন্যই দুঃখ প্রকাশ করিয়াছেন, আর কিছু নহে। বাঙ্গালাই ভারতবর্ষে জাতীয়তার পবিত্রতম আদর্শ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল, বাঙ্গালাই ত্যাগের ও সেবার আদর্শে দেশভক্তি সমুজ্জ্বল করিয়াছিল। বাঙ্গালার সে গৌরব যদি ক্ষুণ্ণ হয়, সে বড় দুঃখের কথা হইবে। বাঙ্গালার আবেগের ও দেশ-প্রেমের গভীরতার তুলনা নাই।"

পরম আনন্দের বিষয়, এতদিনে দেশ তাহার আত্মার সন্ধান পাইয়াছে—রাজনীতিক উদ্দেশ্য বুঝিতে পারিয়াছে,—কি উপায়ে সে উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিতে পারে, তাহা বুঝিয়াছে। দেশ বুঝিয়াছে, দেশের মুক্তি দেশ হইতে উদ্গত করিতে হইবে—অন্যত্র হইতে আনিলে হইবে না। সামান্য সংস্কারে দেশ পরিতৃপ্তি লাভ করিতে পারিবে না। দেশের অধিকাংশ লোক সহযোগিতা-বর্জ্জনের পক্ষ সমর্থন করিয়াছেন। তিনি সভাপতি বলিয়া পূর্ব্বে স্বীয় মত প্রকাশে বিরত ছিলেন। আজ কংগ্রেসে মহাত্মা গন্ধীর প্রস্তাব গৃহীত হওয়ায় তিনি আনন্দলাভ করিয়াছেন, তিনি স্বয়ং সর্ব্বতোভাবে সহযোগিতা-বর্জ্জনের সমর্থক। কিন্তু তাঁহার বিশ্বাস, মহাত্মা গন্ধীর প্রস্তাব সর্ব্বাঙ্গসুন্দর বা কার্য্যোপযোগী নহে।

তিনি ছেলে-মেয়েদের বিদ্যালয় ছাড়াইবার বিরোধী। এ দেশে জাতীয় শিক্ষা-প্রতিষ্ঠা বিষয়ে তাঁহার উৎসাহ স্বামী শ্রদ্ধানন্দের উৎসাহ অপেক্ষাও অল্প নহে। কিন্তু জাতীয় গবর্ণমেণ্ট ব্যতীত জাতীয় শিক্ষা-প্রণালীর প্রবর্ত্তনও পরিপুষ্ট হয় না, হইতে পারে না। আমরা এতদিন জাতীয় শিক্ষার যে আদর্শ গ্রহণ করিয়াছি, তাহাই জাতীয় নহে। গবর্ণ-মেণ্টের সাহায্য ব্যতীত কোন জাতি জাতীয় শিক্ষাপদ্ধতির প্রতিষ্ঠা করিতে সমর্থ হয় নাই। কলিকাতায় জাতীয় শিক্ষাপরিষদ যে সাফল্য লাভ করে নাই, তাহাতেই ইহা প্রতিপন্ন হয়। যুরোপীয় শিক্ষা আমরা পরিহার করিতে পারি না, তাহাতে যদি আমাদের দাসত্ব-প্রবণতা বর্দ্ধিত হইয়া থাকে, তবে তাহাতেই আমরা আবার মুক্তি-কামনা পুষ্ট করিতে পারিয়াছি।

তার পর ব্যবহারাজীবদিগের আদালত-ত্যাগ ও আদালত-বর্জ্জনের প্রস্তাব। ইহাও কি সম্ভব? জানি, ব্যবহারাজীবরা পরাঙ্গপুষ্ট, তাঁহাদের সমৃদ্ধিতে সমাজের সমৃদ্ধি বৃদ্ধি হয় না। কিন্তু তাঁহারা যেমন রাজনীতিতে নেতৃত্বও করিয়াছেন—তেমনই সঙ্কটকালে তাঁহারাই ভয় পাইয়া সরিয়া দাঁড়ান। পাঞ্জাবে একদিকে যেমন লালা হরকিষণলাল, লালা দুনীচাঁদ ও পণ্ডিত রামভজ দত্ত চৌধুরী ব্যবহারাজীব,—আর একদিকে তেমনই অনেক ব্যবহারাজীবই পাঞ্জাবের অনাচারে অনাচারীদিগের সহায়তা করিয়াছেন। কিন্তু ব্রিটিশজাতি দেশের অর্থনীতিক হিসাবে যত ক্ষতিই কেন করুক না—যতদিন তাহারা এদেশে থাকিবে, ততদিন মামলা হইবে, আদালতেও যাইতে হইবে, ব্যবহারাজীব নিযুক্তও করিতে হইবে। তাহার প্রতীকারের উপায় স্বদেশী।

আর এক কথা—ব্যবস্থাপক সভাবর্জ্জন। গত ৩৫ বৎসরকাল দেশের লোক ব্যবস্থাপক সভায় প্রতিনিধি-প্রেরণের যে অধিকার চাহিয়া আসি-য়াছে, আজ একদিনে তাহা বর্জ্জনে লোককে সম্মত করা সহজ-সাধ্য নহে। ৩৫ বৎসরে যে মনোভাব গঠিত হয়, একদিনে তাহা পরিবর্ত্তিত

করা যায় না। তাহাতে পদস্খলনে বিপদের সম্ভাবনা। এত অল্প সময়ের মধ্যে এ ব্যবস্থা না করিলেই ভাল হইত।

শেষ কথা—সহযোগিতাবর্জ্জননীতি অবলম্বন করিব কেন? সর্ব্বপ্রথমে—স্বরাজলাভের জন্য। খেলাফৎ ও পাঞ্জাবী অনাচার তেমন ব্যাপার নহে—তদুভয়কে এমন প্রাধান্য প্রদান করা ঠিক হয় নাই। খেলাফৎ কমিটী সহযোগিতাবর্জ্জন করিবেন বলিয়া, বড় লাটকে পত্র লিখিয়াছেন। মহাত্মা গন্ধী বলেন, সেই নোটিশই কংগ্রেসের নোটিশ বলিয়া গ্রহণ করা হউক। তাহা সঙ্গত নহে। কংগ্রেস সমগ্র জাতির—খেলাফৎ কমিটী কেবল মুসলমানদিগের, এ অবস্থায় খেলাফৎ কমিটীর নোটিশই কংগ্রেসের নোটিশ বলিয়া গ্রহণ করিবার জন্য কংগ্রেসকে বলা সঙ্গত বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে না। সে কমিটীও কংগ্রেসের পক্ষ হইয়া কংগ্রেসের নামে কাজ করেন নাই।

কংগ্রেস যে মহাত্মা গন্ধীর প্রস্তাবের পক্ষে ভোট দিয়াছেন, তাহাতে লালাজী আনন্দ প্রকাশ করেন। তাহাতে দেশের লোকের মনের প্রকৃত ভাব বুঝা যায়। তবে মহাত্মা গন্ধীর প্রস্তাব আরও বিস্তৃত ও ব্যাপক হওয়া উচিত ছিল। জাতির উৎপত্তি ও গঠন জটিল ব্যাপার। সব দিক্ বুঝিয়া ভাল করিয়া ভাবিয়া কাজ করিতে হইবে, নহিলে অসাফল্যের অনুমানে আমরা লজ্জিত হইব। বিলাতে ভিক্ষাপত্র লইয়া যাইতে তাঁহার মত নাই। কিন্তু সমগ্র সভ্য-জগতে ভারতের কথা প্রচার করা প্রয়োজন। বিদেশে, বিলাতে, মার্কিণে, ফ্রান্সে, জাপানে স্বাধীনভাবে ভারত-কথা প্রচারের ব্যবস্থা করিতে হইবে। বিদেশের মত অবহেলা করিলে চলিবে না, তাহার উপযোগিতা কেহ অস্বীকার করিতে পারিবেন না।

কংগ্রেসে প্রস্তাব গ্রহণের পর সহযোগিতাবর্জ্জনেরই সমর্থন করিতে হইবে। যদি তাহাতে সাফল্যলাভ না হয়, তবে আমাদিগকে দেশদ্রোহী বলিয়া পরিচিত ও উপহসিত হইতে হইবে। তিনি স্বয়ং ব্যবস্থাপক

সভায় যাইবেন না—দেশের লোকের সঙ্গে সহযোগিতাবর্জ্জনে সর্ব্বতো-ভাবে সহযোগিতা করিবেন। যদি কংগ্রেসে গৃহীত এই প্রস্তাব কোনরূপ পরিবর্ত্তন করিতে হয়, তাহা করিতে হইবে।

মুসলমানরা যেন মনে রাখেন, ইসলামের ইজ্জৎ রক্ষা করা তাঁহাদের উপর নির্ভর করিতেছে। সত্য বটে—অতি অল্পকালমধ্যেই এই নীতির প্রবর্ত্তন করা হইয়াছে; কিন্তু তাহাতে কিছু আইসে যায় না। তাঁহারা এমনভাবে কাজ করুন,—যাহাতে হিন্দুরা তাঁহাদের সহিত যাইতে পারেন,—যাইতে বাধ্য হয়েন।

সর্ব্বোপরি দলাদলি পরিহার করিতে হইবে। দেশের এই দুঃসময়ে আমরা মডারেটদিগকে হারাইতে পারি না—যাহাতে তাঁহারাও কংগ্রেসে ফিরিয়া আসিয়া আমাদের সঙ্গে একযোগে কাজ করিতে পারেন, সে বিষয়ে আমাদিগকে চেষ্টা করিতে হইবে।”

দশম পরিচ্ছেদ

নাগপুর কংগ্রেস

কলিকাতা স্পেশ্যাল কংগ্রেসের পর দেশে নবভাবের বন্যা বহিতে লাগিল। মহাত্মা গন্ধীর প্রবর্ত্তিত সহযোগিতাবর্জ্জন আন্দোলন দেশের শক্তিকেন্দ্র জনসাধারণের মধ্যে বিস্তারলাভ করিল। এবার হিন্দুমুসলমান ঐক্যসূত্রে মিলিত হইয়া একযোগে কাজ করিতে লাগিলেন; ভারতের ভাগ্যাকাশে জাতীয় জীবনের নব সূর্য্যোদয় সূচিত হইল।

ডিসেম্বর মাসে নাগপুরে কংগ্রেসের সাধারণ অধিবেশন হইল। মাদ্রাজের বিজয় রাঘবাচারিয়াব সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করিলেন। কলিকাতার অধিবেশনে সহযোগিতাবর্জ্জন প্রস্তাবে যথেষ্ট মতভেদ লক্ষিত হইয়াছিল। বর্ত্তমানে সহযোগিতাবর্জ্জন যে ভারতবাসীর অবলম্বনীয়, সে বিষয়ে মতভেদ না থাকিলেও উপায় লইয়া মতভেদ ছিল। নাগপুরে বিভিন্ন মতাবলম্বীরা একযোগে কাজ করিবার উপায় করিলেন। উভয় দলের সম্মতিক্রমে সহযোগিতাবর্জ্জন-প্রস্তাব পরিবর্ত্তিত ও পরিবর্দ্ধিত আকারে গৃহীত হইল। লালা লজপৎ রায় সে প্রস্তাব পূর্ণভাবে সমর্থন করিলেন।

নাগপুর কংগ্রেসের অন্যতম প্রধান ঘটনা কংগ্রেসের ক্রীড বা উদ্দেশ্য পরিবর্ত্তন। এই অধিবেশনে নিম্নলিখিত উদ্দেশ্য-বিবৃতি-বিষয়ক প্রস্তাব গৃহীত হয়—"ন্যায়সঙ্গত ও শান্তিপূর্ণ উপায়ে ভারতবাসী কর্ত্তৃক স্বরাজ-লাভই ভারতীয় জাতীয় মহাসমিতির উদ্দেশ্য।" এই প্রস্তাব সমর্থন উপ-লক্ষে লালা লজপৎ রায় যে ওজস্বিনী বক্তৃতা করেন, তাহা কংগ্রেসের ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবে। আমরা বক্তৃতার সারাংশ নিম্নে প্রদান করিলাম। লালাজী বলেন,—"আমাকে এই প্রস্তাবটি ইংরাজিতে সমর্থন করিতে বলা হইয়াছে। আমি দেশের এই সন্ধিক্ষণে প্রস্তাবটির

গুরুত্ব উপলব্ধি করি। আমি আপনাদের অনুমতি লইয়া পূর্ব্বে কংগ্রেসের ক্রীড কি ছিল, তাহা সংক্ষেপে বর্ণনা করিতেছি। আপনাদের মধ্যে যাঁহারা কংগ্রেসের ইতিহাস অবগত আছেন, তাঁহারা সকলেই ১৯০৭ খৃষ্টাব্দে সুরাটে কিরূপে দলাদলি হইয়াছিল, তাহা জানেন। আমি সেই কংগ্রেসে যোগদান করিয়াছিলাম এবং আমি সেই দলাদলির অন্যতম কারণ ছিলাম বলিয়া কিরূপে সেই সংঘর্ষ উঠিয়াছিল, তাহা অবগত আছি। নরমপন্থী ও চরমপন্থীদের মধ্যে যে মতের বিভিন্নতা ঘটিয়াছিল, তাহার মূল কারণ এই যে, কয়েকজন চরমপন্থী ভারতেব পূর্ণস্বাধীনতা কামনা করিতেন। সুরাট-বিচ্ছেদের পর ১৯০৮ খৃষ্টাব্দে এলাহাবাদে কংগ্রেসের উদ্দেশ্য আলোচনার জন্য আমরা সববেত হইলাম। আমি তথায় কংগ্রেস ক্রীডের প্রতিবাদ করিয়াছিলাম। তখন আমাদের সম্পূর্ণ স্বাধীন হইবার মত উপায় বা ইচ্ছা ছিল বলিয়া যে প্রতিবাদ করিয়াছিলাম, তাহা নহে; কিন্তু আমি প্রতিবাদ করিয়াছিলাম এই জন্য যে, আমাদের পূর্ণস্বাধীনতাকাঙ্ক্ষী কোন ব্যক্তিকে কংগ্রেস হইতে বহিস্কৃত করিবার অধিকার নাই। শ্রীযুক্ত অরবিন্দ ঘোষের মত ত্যাগী, স্বদেশহিতৈকপ্রাণ ব্যক্তিকে ভারতের কোন সমিতিই বহিষ্কৃত করিতে পারে না এবং ইহা করিলে তাহা যে জাতীয়' বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে না, তাহা নিশ্চিত। সে সময়ে আমার কয়েকজন বন্ধু কংগ্রেসের সেই ক্রীডে স্বাক্ষর করিবেন না, তাহা আমি জানিতাম। যাহা হউক, কংগ্রেসে সেই ক্রীড গৃহীত হইল। তাহার পর ১২।১৩ বৎসর অতীত হইয়া গেল, ইহার মধ্যে এমন সব ঘটিয়াছে, যাহাতে আমরা কংগ্রেসের ক্রীড পরিবর্ত্তন করিতে বাধ্য।

আমার বক্তব্য এই যে, বর্ত্তমানে যেরূপভাবে এই ক্রীড পরিবর্ত্তিত হইল, ইহা অপেক্ষা ভাল কিছুই হইতে পারে না। কংগ্রেসের গত বিশেষ অধিবেশনে যে সহযোগিতাবর্জ্জননীতি গৃহীত হইয়াছে, ইহা তাহারই ক্রমোন্নতি। সহযোগিতাবর্জ্জননীতি গৃহীত হইবার পর পূর্ব্বক্রীডের বিরোধী ব্যক্তিদিগকে আমরা কংগ্রেসের বাহিরে রাখিতে পারি না। এই

সময়েও এই মহাসভার অধিকাংশ ব্যক্তি কিংবা দেশের অধিকাংশ চিন্তাশীল ব্যক্তি ভারতের পূর্ণ-স্বাধীনতা অর্থাৎ ইংরাজের সহিত সব সম্পর্ক ত্যাগ করিতে চাহেন কি না, সে বিষয়ে আমার সন্দেহ আছে। আমি আপনাদিগকে ইহা বলিতে চাই যে, যদি আমরা দেশবাসিগণের মনের নূতন ভাব-পরিবর্ত্তনের কথা গণনার মধ্যে না আনি, তাহা হইলে আমরা মিথ্যাবাদী ও দেশের অহিতকামী বলিয়া পরিগণিত হইব। আমরা আমাদের ব্যক্তিগত মত ব্যক্ত করিতে এই কংগ্রেসে আসি নাই, জনসাধারণের মত প্রকাশ করিতেই উপস্থিত হইয়াছি। এই যে ক্রীডের পরিবর্ত্তন করা হইল, ইহার উদ্দেশ্য কি? ইহা দ্বারা ইংরাজ সরকার ও ইংরাজ জনসাধারণকে ইহাই জানান যাইতেছে যে, ইংরাজের সঙ্গে এখনই আমরা সমস্ত সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করিতে চাই না, কিন্তু যদি ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হইয়াও থাকি, তাহা হইলেও কাহারও অধীন হইয়া থাকিব না। আমরা আমাদের দেশে ন্যায়ানুমোদিত এবং শান্তিপূর্ণ উপায়ে যাহা ইচ্ছা করিতে পারিব, ঐরূপ অধিকার আমাদের চাই।

ইংলণ্ড হইতে সমাগত আমার কয়েকজন শ্রদ্ধাভাজন বন্ধু এই সভায় উপস্থিত আছেন। তাঁহাদের মারফতে ইংরাজ জনসাধারণকে আমি এই সংবাদ জানাইতে চাই যে, জাতিগতভাবে তাঁহাদের সহিত শত্রুতা করা আমাদের ঈপ্সিত নহে। তাঁহাদের মারফতে ব্রিটিশ সরকারকে আমরা ইহাই বলিতে চাই যে,ব্রিটিশ সরকারের বিচারবুদ্ধিতে বা সাধুতায় আমাদের কাহারও আস্থা নাই। যখন ব্রিটিশ সরকার পাঞ্জাবের হত্যাকাণ্ড-সম্বন্ধীয় ডেস্‌প্যাচে সার মাইকেল ওডায়ারকে প্রশংসা করিলেন, তখনই আমরা ইংরাজের রাজনীতির উপর সমস্ত বিশ্বাস হারাইয়াছি। এই সভা হইতে আমরা ইহাই ঘোষণা করিতে চাই যে, ঐ ঘটনার পূর্ব্বেই আমরা ইংরাজ রাজনীতিতে বিশ্বাস হারাইয়াছিলাম। তবে পাঞ্জাবের এই ঘটনার পর ব্রিটিশ সাধুতা ও ব্রিটিশ বিচারবুদ্ধির উপর আমাদের সমস্ত আস্থা

সমূলে বিলুপ্ত হইয়াছে। ভারতবর্ষের ইতিহাস পাঠ করিলে আপনারা দেখিতে পাইবেন যে, এই দেড় শত বৎসর ইংরাজ কেবলই তাহার প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করিয়াছে। সম্রাট্ বা সাম্রাজ্ঞীর নামে যে সকল অঙ্গীকারপত্র প্রচারিত হইয়াছে, ইংরাজ তাহার প্রায় কোন সর্ত্তই পালন করেন নাই। আমি ব্রিটিশ রাজত্বের অতীত ইতিহাস অনুসন্ধান করিতে চাহি না, ইদানীন্তন ইতিহাস পাঠ করিলেই আমার কথার সত্যতার প্রমাণ পাইবেন। লর্ড কার্জ্জন কিরূপে মহারাণীর ঘোষণাপত্রকে উড়াইয়া দিয়াছিলেন, তাহা আপনাদের সকলেরই স্মরণ আছে। সেই লর্ড কার্জ্জন এখন ইংলণ্ডের পররাষ্ট্রসচিব। ইংলণ্ডের প্রধান মন্ত্রী মিঃ লয়েড জর্জ্জের কথা আলোচনা করিলেও আমরা সেই প্রতিশ্রুতি-ভঙ্গ দেখিতে পাই। ভারতবর্ষের মুসলমানদের সম্বন্ধে তিনি কিরূপ অঙ্গীকার ভঙ্গ করিয়াছেন—বলিতে গেলে তাহাদিগকে প্রবঞ্চিত করিয়াছেন—এ কথা আপনারা সকলেই জানেন। অথচ তিনি কখনও স্বীকার করেন না যে, তিনি অঙ্গীকার রক্ষা করেন নাই। যখন তিনি অঙ্গীকার ভঙ্গ করিয়া জগতের সমক্ষে বলিয়াছেন যে, তিনি অঙ্গীকার রক্ষা করিয়াছেন, তখন তাঁহার সততায় সন্দিহান হওয়া আমাদের পক্ষে কিছু বিচিত্র নহে।

প্রধান মন্ত্রীর পর সমর-সচিবের কথা ধরা যাউক। আমরা সমর-সচিবকে বিশ্বাস করিতে পারি কি? (সভা হইতে উত্তর—না, না) পররাষ্ট্র-সচিব লর্ড কার্জ্জনকে বিশ্বাস করিতে পারি কি? (না, না) মিঃ ব্যালফুরকে বিশ্বাস করিতে পারি কি? (না, না) আমি জিজ্ঞাসা করি, ব্রিটিশ মন্ত্রিসভার মধ্যে এমন কে আছেন, যাঁহাকে আমরা বিশ্বাস করিতে পারি?

সুতরাং কংগ্রেসের ক্রীড পরিবর্ত্তন করিয়া আমরা ব্রিটিশ সরকারকে এই নোটিশ দিতে চাহিতেছি যে, আমাদের ব্রিটিশ-সাম্রাজ্যের মধ্যে থাকিতে আপত্তি নাই বটে, তবে থাকা না থাকা সম্পূর্ণরূপে আমাদের ইচ্ছার উপর নির্ভর করিবে। আমরা আমাদের স্বার্থ বুঝিয়া নিজেদের

ইচ্ছা অনুসারে কার্য্য করিব, তাহাদের ভয়-প্রদর্শন বা জোরজবরদস্তিতে কাজ করিব না।

ব্রিটিশ জনসাধারণকে আমি জিজ্ঞাসা করি, ব্রিটিশ-গণতন্ত্র এখনও হইয়াছে কি? মিঃ হ্যালফোর্ড নাইট বলিতেছেন, এখনও হয় নাই। যেখানে আমরা সমানভাবে বাস করিতে পারিব, সে ব্রিটিশ-গণতন্ত্রের এখনও কোন অস্তিত্ব নাই।

আমাদের কোন কোন বন্ধু বলেন, স্বরাজ শব্দটি দ্ব্যর্থবোধক, উহাতে ব্রিটিশ-সাম্রাজ্যের ভিতরে থাকা ও বাহিরে থাকা দুই-ই বুঝায়। আমরা বলি, ঐ দুই অর্থই ঠিক এবং এই জন্যই ঐ শব্দটি ব্যবহৃত হইয়াছে। ভিতরে থাকা না থাকা আমাদের ইচ্ছার উপর নির্ভর করিবে, ব্রিটিশ সরকারের কার্য্যকলাপ দ্বারা আমাদের ইচ্ছা নিয়ন্ত্রিত হইবে।

তার পর স্বরাজ-লাভের উপায়ের কথা। আমার কোন কোন শ্রদ্ধেয় বন্ধু বলেন, উপায়ের কথার উল্লেখ না করিলেই ভাল হইত। দুঃখের বিষয়, আমি তাঁহাদের সহিত একমত হইতে পারি না। কারণ, আমি বিশ্বাস করি, সুযোগ উপস্থিত হইলে প্রত্যেক নিপীড়িত জাতিরই পীড়নকারী সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহিতা উপস্থিত করিবার স্বতঃসিদ্ধ অধিকার আছে। অবশ্য, আমি এ কথা বিশ্বাস করি না যে, বর্ত্তমান সময়ে আমাদের ঐরূপ বিদ্রোহের ক্ষমতা বা অভিলাষ আছে। আমি ভবিষ্যৎ সম্ভাবনার আলোচনা করিব না, তবে কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দ স্বীয় উদ্দেশ্যসাধনে কখনই অনাচারের আশ্রয় লইবেন না, ইহা সুনিশ্চিত আমরা সর্ব্বপ্রকার অত্যাচার-অনাচার আন্তরিক ঘৃণা করি, অত্যাচার-অনাচারকে আমাদের উদ্দেশ্য-সাধনের পরিপন্থী বলিয়া মনে করি। এই জন্যই আমাদের প্রস্তাবে বলা হইয়াছে, "ন্যায়সঙ্গত ও শান্তিপূর্ণ উপায়ে।"

আমি আপনাদিগকে আর একটি কথা জানাইতে চাই। আমাদের পথ হয় ত দীর্ঘ হইবে, নানা বাধাবিঘ্ন হয় ত আমাদের সম্মুখে উপস্থিত

হইবে, কিন্তু আপনারা এই বৃহৎ সত্যটি জানিয়া রাখিবেন, ৩৩ কোটি লোকের সমবেত চেষ্টার সমক্ষে পৃথিবীতে অসম্ভব বলিয়া কিছু থাকিতে পারে না। আমরা যদি বীরের মত, মানুষের মত ধীর ও নির্ভীক ভাবে স্বীয় কর্ত্তব্যসম্পাদনে অগ্রসর হই, তবে জগতের কোন বাধা-বিপত্তিই আমাদের সফলতায় বাধা দিয়া রাখিতে পারিবে না। আর এক কথা। যদি কোন ইংরাজ ভদ্রলোক বা ইংরাজ দল আমাদিগকে সহায়তা করিতে চাহেন, তবে আমরা সানন্দে তাঁহাদের সহযোগিতা করিব। আমরা একজন ইংরাজ ভদ্রলোকের কথায় সম্পূর্ণ বিশ্বাস-স্থাপন করিতে পারি, কিন্তু কোন ইংরাজ রাজনীতিকের কথায় বিন্দুমাত্রও বিশ্বাস করিতে পারি না।"

এইবার নাগপুরে নিখিল ভারত গো-রক্ষিণী মহাসমিতির চতুর্থ অধিবেশন হয়। সর্ব্বসম্মতিক্রমে লালাজী এই সভার সভাপতি-পদে বৃত হন। লালাজী ভারতের গো-সমস্যার অতি সুবিস্তৃত ও সুচিন্তিত আলোচনা করেন। তিনি বলেন,—"যতদিন না ভারতে স্বরাজ প্রতিষ্ঠিত হইবে, ততদিন ভারতের গো-সমস্যার সন্তোষজনক সমাধান হইবে না,—হইতে পারে না। শত সহস্র আবেদন নিবেদনেও বিদেশী-ব্যুরোক্রেশীর হৃদয় গলিবে না। তাঁহাদের স্বার্থ ভারতের স্বার্থের বিপরীত, ভারতের ধন-দৌলত শোষণ করাই তাঁহাদের প্রধান চেষ্টা। যতদিন না ভারত পুনরায় ভারতবাসীর হস্তে আসিবে, ততদিন ভারতের অতীতের সংশোধন হইতে পারে না। এ কথা কে না জানে যে, গোবংশের হ্রাসের জন্য ভারতের অর্থনৈতিক অবস্থা দিন দিন হীন হইতে হীনতর হইতেছে। গবর্ণমেণ্ট যুক্তি দেখাইয়া থাকেন যে, ভারতের গোচারণভূমির হ্রাসের জন্য গোবংশ ধ্বংস পাইতেছে। কিন্তু আমি জিজ্ঞাসা করি, ভারতের গোচারণভূমি কিরূপে, কেন হ্রাস হইল? ব্রিটিশ-শাসনের পূর্ব্বে ভারতে অপর্য্যাপ্ত গোচারণভূমি ছিল, তখন প্রত্যেক গৃহস্থের বাড়ীতে গরু থাকিত। কিন্তু ভারতে ব্রিটিশ-শাসন প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই এ অবস্থার পরিবর্ত্তন

হইয়াছে। এই পরিবর্ত্তনের জন্য কি ব্রিটিশ-শাসননীতিই দায়ী নহে? ব্রিটিশ সরকার রাজস্ব, বন, চামড়া প্রভৃতি বিষয়ে এমন সব নীতির প্রবর্ত্তন করিয়াছেন যে, দেশের সমস্ত গোচারণভূমি বাধ্য হইয়া উঠিয়া যাইতেছে। রাজস্ব এত অধিক যে, কেহ কোন স্থান পতিত রাখিতে পারিতেছে না। সরকার গর্ব্ব করেন—দুর্ভিক্ষ-দমনকল্পে, সরকার অতি বৈজ্ঞানিক প্রণালী অনুসরণ করিতেছেন। কিন্তু তাহাতে দুর্ভিক্ষের প্রকৃত কারণের মূলোচ্ছেদ হইতেছে কি?"

এইবার নাগপুরে "নিখিল ভারত ছাত্র মহাসমিতির" প্রথম অধিবেশন হয়। ভারতের অদ্বিতীয় শিক্ষাপ্রচারক লালা লজপৎ রায় এই অধিবেশনে সভাপতির পদে বৃত হন। লালাজী তাঁহার অভিভাষণে ভারতের শিক্ষার আদর্শ এবং বর্ত্তমান সময়ে ছাত্রগণের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে অতি সুযুক্তিপূর্ণ আলোচনা করেন। বক্তৃতা-প্রসঙ্গে লালাজী বলেন,—"বাল্যকাল হইতেই আমার ধারণা, বিদেশী সরকারের অধীনে কোন শিক্ষাপ্রণালীই দেশের কল্যাণজনক হইতে পারে না। প্রত্যেক সরকারই সর্ব্বাগ্রে নিজের স্বার্থের প্রতি দৃষ্টি রাখে এবং নিজের স্বার্থরক্ষা ও ক্ষমতা বৃদ্ধির জন্যই স্কুল-কলেজ স্থাপন করিয়া থাকে। বিদেশী সরকারের প্রতিষ্ঠিত স্কুল কলেজের প্রধান উদ্দেশ্য শাসিতদের উপকার ততটা নয়, যতটা শাসকগণের ক্ষমতার বৃদ্ধি করা। ভারত-সরকার স্কুল-কলেজে যে শিক্ষানীতির অনুসরণ করিতেছেন, আমার মতে তাহা ভারতীয় জাতির পক্ষে নিতান্ত অকল্যাণকর। এই শিক্ষাপ্রণালীর উদ্দেশ্য আমাদের মুক্তি সাধন নয়, ইহার উদ্দেশ্য আমাদিগকে ক্রীতদাসে পরিণত করা। এই জন্য আমরা গত ৩০ বৎসর যাবৎ এই শিক্ষাপ্রণালীর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করিয়া আসিতেছি।

এমন এক সময় ছিল, যখন ইংরাজ-প্রতিষ্ঠিত স্কুল কলেজের শিক্ষার ফলে আমরা মনে করিতে শিখিতাম যে, ভারতীয় যাহা কিছু আছে, সবই মন্দ। আমাদিগকে শিক্ষা দেওয়া হইত যে, ভারতীয় অধিকাংশ জিনিষই

বর্ব্বরতামূলক সুতরাং ঘৃণার পাত্র। ফলে আমরাও বিদেশী অশন, বিদেশী বসনের অনুকরণ করিয়া দেশের যাবতীয় জিনিষকেই ঘৃণার চক্ষে অবলোকন করিতাম।

সৌভাগ্যের বিষয়,এখন সে সময় অতীত হইয়াছে। কিন্তু এখন আবার আর এক বিপদের সম্ভাবনা উপস্থিত। এখন কেহ কেহ মনে করেন, ভারতীয় যাহা কিছু আছে, সবই সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ! কিন্তু আমি ইহাঁদের সহিত একমত হইতে পারি না। আমার ধারণা, সত্য চিরকালই সত্য, জ্ঞান চিরকালই জ্ঞান, বিজ্ঞান চিরকালই বিজ্ঞান। ইহারা প্রাচ্যও নহে, পাশ্চাত্যও নহে, ভারতীয়ও নহে, য়ুরোপীয়ও নহে,ইহারা যাহা,—ঠিক তাহাই। শিক্ষা বিষয়ে আমাদের এ কথাটি বিশেষ করিয়া স্মরণ রাখিতে হইবে। শিক্ষা-ব্যাপারে আমাদিগকে পূর্ব্বাপর সম্বন্ধ বজায় রাখিতে হইবে। জাতি হিসাবে আমরা য়ুরোপীয়ও হইতে চাহি না, আমেরিকানও হইতে চাহি না, আমরা ভারতীয়ই থাকিতে চাহি। তবে আমাদিগকে বর্ত্তমান যুগের কোন জ্ঞান-বিজ্ঞানই বাদ দিলে চলিবে না। আমরা যদি পাশ্চাত্য জগতের বর্ত্তমান জ্ঞান-বিজ্ঞান বাদ দিই, তবে আমাদের পক্ষে নিজের নাক কাটিয়া পরের যাত্রা ভঙ্গ করিবার মত হইবে মাত্র। বর্ত্তমানে যাহা ভাল, তাহা লইয়া আমাদের অতীতের ভিত্তির উপর শিক্ষার আদর্শ প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে। যেখানে যাহা ভাল, সমস্তই আমাদের গ্রহণ করিতে হইবে। ভারতের জাতীয়তার ভিত্তি ধর্ম্মবিরোধের ক্ষুদ্রতা ও তুচ্ছতার বহু ঊর্দ্ধে প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে। ভারতের স্বাধীনতার নিমিত্ত সকল প্রকার জ্ঞান-বিজ্ঞানের সহায়তা লইতে হইবে এবং যে ভাবেই হউক,সে স্বাধীনত বজায় রাখিতে হইবে।"

বর্ত্তমান অসহযোগ আন্দোলনে ছাত্রগণের কি কর্ত্তব্য, তাহাদের স্কুল-কলেজ ছাড়া কর্ত্তব্য কি না এ সম্বন্ধেও লালাজী তাঁহার মতামত ব্যক্ত করেন। লালাজী বলেন, "কলিকাতায় স্পেশ্যাল কংগ্রেসে অসহযোগ প্রস্তাবের যে অংশে স্কুলের ছাত্রগণের বিদ্যালয় ত্যাগের কথা আছে,

আমি তাহার প্রতিবাদ করিয়াছিলাম। লাহোরে এক জনসভায় বক্তৃতা-কালে আমি বলিয়াছিলাম, আর্টস্ কলেজ ও আইন কলেজ উঠাইয়া দেওয়া আমি বাঞ্ছনীয় মনে করি। ইহার পর যখনই ছাত্রগণ আমার কাছে উপদেশের জন্য আসিয়াছে, আমি তাহাদিগকে বলিয়াছি—'আইন কলেজের ছাত্রগণ অবিলম্বে কলেজ ছাড়িয়া দাও। ডাক্তারী,ইঞ্জিনীয়ারিং ও টেকনিক্যাল স্কুলের ছাত্রগণকে বলি, বর্ত্তমানে কলেজ ছাড়িও না। আর আর্টস্ কলেজের ছাত্রগণকে বলি, তোমরা বিষয়টি বেশ করিয়া ভাবিয়া দেখ,যদি দেখ, হৃদয়ে বাস্তবিকই কর্ত্তব্যের আহ্বান জাগিয়াছে, তবে বাহির হইয়া এস। তবে এ ভ্রান্ত ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া যেন বাহির না হও যে, জাতীয় কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দ জাতীয় বিদ্যালয়ে তোমাদের জন্য শিক্ষার বন্দোবস্ত করিতেছেন। অবশ্য, জাতীয় বিদ্যালয়ের ব্যবস্থার চেষ্টা যে না হইতেছে, তাহা নহে, তবে একমাত্র সে ধারণাই যেন তোমাদের কলেজ-ত্যাগের কারণ না হয়।

যাহাতে আমলাতন্ত্র শাসন-প্রণালীর ক্ষমতা নষ্ট হইয়া অচিরে দেশে স্বরাজ প্রতিষ্ঠিত হয়, কংগ্রেসের নেতৃগণ এ জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করিতে-ছেন। ছাত্রগণের এ বিষয়ে মনযোগ প্রদান করা অবশ্য কর্ত্তব্য। জাতীয় গবর্ণমেণ্ট ব্যতীত প্রকৃত জাতীয় শিক্ষার ব্যবস্থা হইতে পারে না। সুতরাং দেশে প্রকৃত জাতীয় শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে হইলে, দেশে স্বায়ত্ত-শাসন আনয়ন করিতে হইবে, স্বরাজ-প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে। সুতরাং আমাদের শক্তি, চেষ্টা, উদ্যম সমস্তই স্বরাজ প্রতিষ্ঠাকল্পে বিনিয়োগ করিতে হইবে। দেশের শক্তিকেন্দ্র জনসাধারণের মধ্যে স্বরাজের বার্ত্তা প্রচারের জন্য বহু কর্ম্মীর প্রয়োজন। এখন কেবল অবসর সময় শিক্ষায় ব্যয় করিয়া বাকী সমস্ত সময় এই মহান্ ব্রতে নিয়োগ করা কর্ত্তব্য।

প্রশ্ন উঠিয়াছে, স্কুল-কলেজ ছাড়িলে ছাত্রগণ খাইবে কি করিয়া? পোষাক-পরিচ্ছদ ও মানসম্ভ্রম বিষয়ে ভ্রান্ত ধারণা ত্যাগ করিয়া ছাত্রগণের কলকারখানায় কাজ করা উচিত, গ্রামে গ্রামে কুটীর-শিল্পের পুনরুদ্ধারের

চেষ্টা করা উচিত। ইহাতে যে শুধু অর্থাগম হইবে, তাহা নহে, ইহাতে তাঁহারা দেশের অশিক্ষিত জনসাধারণের মধ্যে জাতীয়তার মন্ত্র প্রচার করিয়া তাহাদিগকে জাতীয় কাজের জন্য প্রস্তুত করিতে পারিবেন। মহাত্মা গন্ধী বলিয়াছিলেন, আমাদের যুবকগণের রাস্তায় ইট-পাথর ভাঙ্গিয়া অর্থোপার্জ্জন করা উচিত, মহাত্মার কথায় কেহ কেহ বিদ্রূপের হাসি হাসিয়াছিলেন। আমার ছাত্র বন্ধুগণ, তোমাদের মনে রাখা উচিত যে, বর্ত্তমান শিক্ষাপদ্ধতির প্রধান দোষ—ইহা আমাদিগকে স্বাধীনভাবে চিন্তা করিতে বা স্বাধীনভাবে কার্য্য করিতে শিক্ষা দেয় না। প্রকৃত শিক্ষার উদ্দেশ্য মানুষকে প্রকৃত মনুষ্যত্ব প্রদান করা, তাহাকে চিন্তায় ও কার্য্যে স্বাধীন করা। তোমরা বিলাসিতার কেন্দ্র বড় বড় সহর পরিত্যাগ করিয়া গ্রামে গ্রামে গমন কর, সৎপথে থাকিয়া স্বহস্তে কাজ কর। আমার চক্ষে সৎপথে থাকিয়া স্বাধীনভাবে রাস্তা মেরামৎ করার কাজ একজন ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেটের কাজের অপেক্ষা শত গুণে শ্রেয়স্কর। মুষ্টিমেয় শিক্ষিত লোকের চেষ্টায় স্বরাজলাভ হইবে না, ভারতের জনসাধারণকে স্বরাজের প্রেরণায় অনুপ্রাণিত করিতে হইবে। কুটীরেই জাতির বাস। তোমরা যদি প্রকৃতই কর্ত্তব্যের আহ্বান অনুভব কর, যদি ভারতে স্বরাজ প্রতিষ্ঠিত করিতে চাও, তবে গ্রামে গ্রামে গমন কর, কুটীরে কুটীরে স্বরাজের বাণী প্রচার করিয়া জনসাধারণকে স্বরাজ সেবায় উদ্বোধিত কর।

দেশ কর্ম্মী চায়। প্রকৃত কর্ম্মীর বড় অভাব। তোমরা সকলেই এই মহান্ কর্ম্মে আত্মনিয়োগ কর। ডাক্তারী ও ইঞ্জিনিয়ারিং ছাত্রদের সম্বন্ধে আমার ব্যক্তিগত মতামত পূর্ণভাবে স্থির করিতে পারি নাই। আমি জানি, উঁহারা ভারতীয় সৈন্যবিভাগের দুইটি প্রধান অঙ্গ। যাক্, এ বিষয়ে আমি এখনও কিছু স্থির করিতে পারি নাই। অসহযোগ-প্রস্তাব সম্বন্ধে তোমরা কংগ্রেসের নির্দ্দেশ মানিয়া লইবে।"

একাদশ পরিচ্ছেদ

অসহযোগ আন্দোলন

কলিকাতা স্পেশ্যাল কংগ্রেসে যে অসহযোগিতাবর্জ্জন প্রস্তাব গৃহীত হয়, তাহা লইয়া কংগ্রেসের নেতৃগণের মধ্যে যথেষ্ট মতভেদ লক্ষিত হইয়াছিল। প্রস্তাবের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে কোনও মতদ্বৈধ ছিল না, কিন্তু কার্য্য-প্রণালী সম্বন্ধে অনেকের আপত্তি ছিল। কলিকাতা কংগ্রেসের সভাপতি লালা লজপৎ রায় কংগ্রেসের কাজ শেস করিবার সময় যে বক্তৃতা করেন, তাহাতে বলিয়াছিলেন—আজ কংগ্রেসে মহাত্মা গন্ধীর প্রস্তাব গৃহীত হওয়ায় তিনি আনন্দলাভ করিয়াছেন, তিনি স্বয়ং সর্ব্বতোভাবে সহ-যোগিতাবর্জ্জনের সমর্থক। কিন্তু তাঁহার বিশ্বাস, মহাত্মা গন্ধীর প্রস্তাব সর্ব্বাঙ্গসুন্দর বা কার্য্যোপযোগী নহে। এই কারণে নাগপুর কংগ্রেসের অধিবেশনে সহযোগিতাবর্জ্জন প্রস্তাবটিকে একটু পরিবর্ত্তিত ও পরিবর্দ্ধিত আকারে উত্থাপিত করা হয়। এইবার প্রায় অধিকাংশ নেতা- ইহাতে মত দেন, লালা লজপৎ রায় এই প্রস্তাব পূর্ণভাবে সমর্থন করেন। প্রস্তাব সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

নাগপুর কংগ্রেসে যে সহযোগিতাবর্জ্জন-প্রস্তাব গৃহীত হয়, তাহ এই :—

যে হেতু এই মহাসভার মতে ভারতবর্ষের বর্ত্তমান শাসনতন্ত্র দেশ-বাসীর শ্রদ্ধা হারাইয়াছে, এবং যে হেতু ভারতবাসী এখন স্বরাজ-প্রতি-ষ্ঠার জন্য বদ্ধপরিকর হইয়াছে এবং আমাদের ন্যায়সঙ্গত অধিকার ও স্বাধীনতারক্ষার জন্য এবং বহুবিধ অন্যায় অবিচারের প্রতীকারকল্পে আমাদের অবলম্বিত উপায়-সমূহ এতাবৎকাল ব্যর্থ হইয়াছে এবং বিশেষ পাঞ্জাব ও খেলাফতের কথা এখনও অমীমাংসিত রহিয়াছে, সেই জন্য এই কংগ্রেস অহিংসাত্মক অসহযোগনীতিকেই অঙ্গীকার ও গ্রহণ করিয়া

ঘোষণা করিতেছেন যে, এই অহিংসামূলক সহযোগবর্জ্জন ব্যবস্থা সমগ্র-ভাবে বা আংশিকভাবে গ্রহণ করিয়া বর্ত্তমান শাসনতন্ত্রের সহিত স্বতঃ-প্রবৃত্তভাবে সর্ব্বসংস্রব পরিত্যাগ করিবার জন্য প্রথম প্রস্তাব হইতে শেষ প্রস্তাব রাজস্ব দেওয়া বন্ধ করিবার জন্য প্রস্তুত হইতে হইবে এবং কোন্‌টি কখন অবলম্বন করিতে হইবে, তাহা কংগ্রেস বা নিখিলভারত কংগ্রেস সমিতি নির্দ্ধারণ করিয়া দিবামাত্র সকলকে একযোগে কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইতে হইবে। অতএব এই কার্য্যে সমগ্র দেশবাসীকে প্রস্তুত করিবার জন্য নিম্নোক্ত উপায়-সমূহ অবলম্বন করিতে হইবে :—

(ক) গবর্মেণ্ট কর্ত্তৃক স্থাপিত, পরিচালিত বা সাহায্যপ্রাপ্ত বিদ্যালয় হইতে যোড়শবর্ষের অনূন ছাত্রগণকে ছাড়াইয়া লইবার সঙ্গে সঙ্গে ঐ সমস্ত বালকের শিক্ষার জন্য জাতীয় বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার কার্য্যে অভিভাবক ও পিতামাতাদিগকে (ছাত্রগণকে নহে) আহ্বান করিতে হইবে।

(খ) এতদ্দেশবাসিগণ যে শাসনতন্ত্রের অবসান দেখিতে ইচ্ছা করেন, সেই শাসনতন্ত্র পরিচালিত, প্রতিষ্ঠিত বা সাহায্যকৃত শিক্ষায়তনগুলির ষোড়শবর্ষীয় বা ততোধিক বয়সের ছাত্রগণের মধ্যে যাঁহারা উক্ত-বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন ধর্ম্মবুদ্ধিসঙ্গত নহে বলিয়া মনে করেন, তাঁহারা যাহাতে ফলাফল চিন্তা না করিয়া সে সব বিদ্যালয় ত্যাগ করেন, তজ্জন্য তাঁহাদিগকে আহ্বান করিতে হইতে এবং ঐ ছাত্ররা যাহাতে অসহযোগ-সম্বন্ধীয় কোন বিশেষ সেবাকার্য্যে আত্মনিয়োগ করিতে পারেন অথবা জাতীয় বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিতে পারেন, তদ্বিষয়ে তাঁহাদিগকে উপদেশ দিতে হইবে।

(গ) বর্ত্তমান বিদ্যালয়গুলি জাতীয় বিদ্যালয়ে পরিণতির জন্য, মিউ-নিসিপালিটী, লোকাল বোর্ড, এবং গবর্মেণ্টের সম্পর্কিত সাহায্যপ্রাপ্ত বিদ্যালয়ের ট্রাষ্টি (ন্যায়রক্ষক) কর্ত্তৃপক্ষ ও শিক্ষকগণকে আহ্বান করিতে হইবে।

(ঘ) আইন-ব্যবসায়িগণ তাঁহাদের ব্যবসায় স্থগিত রাখিয়া সমব্যব-

স্বামিগণকে ঐরূপ করিতে প্রবৃত্ত করাইতে এবং মামলাকারিগণকে আদালত বর্জ্জন করিয়া সালিশীসভায় মোকদ্দমা নিষ্পত্তি করাইতে এবং একাগ্রচিত্তে দেশসেবায় প্রবৃত্ত করাইতে অধিকতররূপে চেষ্টিত হইবেন।

(ঙ) ভারতবর্ষের আর্থিক স্বচ্ছলতাবিধান এবং স্বাতন্ত্র্য অক্ষুন্ন রাখিবার জন্য যাহাতে ব্যবসায়ী ও বণিক্‌সম্প্রদায় বাণিজ্যব্যপদেশে বৈদেশিক সম্বন্ধ ক্রমে ক্রমে পরিহার করেন, তজ্জন্য তাঁহাদিগকে অনুরোধ করিতে হইবে। চরকায় সূতাকাটা এবং বস্ত্রবয়ন কার্য্যে উৎসাহ প্রদান করিতে হইবে। নিখিলভারত কংগ্রেস কমিটী কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত বিশেষজ্ঞগণ বৈদেশিক পণ্যদ্রব্য বর্জ্জন-সম্বন্ধীয় কার্য্যপ্রণালী নির্দ্ধারণ করিবেন।

(চ) অসহযোগ আন্দোলনকে সফল করিবার জন্য যে পরিমাণ আত্মোৎসর্গের প্রয়োজন, প্রত্যেক নরনারীকেই তাহা অনুষ্ঠান করিবার জন্য নির্ব্বিচারে আহ্বান করিতে হইবে। এই জাতীয় আন্দোলনকে সফল করিবার জন্য প্রত্যেককেই শক্তি ও সামর্থ্যানুযায়ী আত্মোৎসর্গের জন্য প্রস্তুত হইতে হইবে।

(ছ) অসহযোগনীতি প্রচার করিবার জন্য প্রত্যেকে গ্রামে বা কয়েকটি গ্রাম লইয়া সমিতি স্থাপন করিতে হইবে; এবং প্রত্যেক প্রদেশের প্রধান সহরগুলিতেও ঐরূপ একটি সমিতি থাকিবে; এবং প্রত্যেক সমিতিই প্রাদেশিক সমিতির অধীনে থাকিবে।

(জ) "জাতীয়—সেবক—সঙ্ঘ" নামে দেশসেবার জন্য একটি জাতীয় সেবকদল গঠন করিতে হইবে।

(ঝ) জাতীয় সেবাকার্য্য পরিচালনের এবং অসহযোগনীতি প্রচারের সহায়তার জন্য নিখিলভারত তিলকস্বরাজ ভাণ্ডার নামে একটি ধনভাণ্ডার প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে।

ভারতবাসী অসহযোগনীতি পালনে অনেক দূর অগ্রসর হইয়াছেন; ইহা কংগ্রেস আনন্দের সহিত জ্ঞাপন করিতেছেন। বিশেষতঃ

ভোটদাতৃগণ যে ব্যবস্থাপক সভায় সভ্যনির্ব্বাচন ব্যাপার পরিহার করিয়াছেন, তজ্জন্য তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ দিতেছেন। বর্ত্তমান ব্যবস্থাপক সভা এতদ্দেশীয় জনসাধারণের মতামত প্রকাশ করিবার মুখপাত্র নহে। অতএব কংগ্রেস আশা করেন যে, যে সমস্ত সভ্য সাধারণের অসম্মতি সত্ত্বেও উক্ত সভায় প্রবেশ করিয়াছেন, তাঁহারা সত্বর পরিত্যাগ করিবেন। যদি তাঁহারা গণতন্ত্রের নিয়ম অবহেলা করিয়া ভোটদাতৃগণের অনিচ্ছা সত্ত্বেও ব্যবস্থাপক সভার সদস্যপদ ত্যাগ না করেন, তাহা হইলে নির্ব্বাচনকারিগণ তাঁহাদিগকে রাজনৈতিক কোন কার্য্যে সহায়তা করিবেন না।

পুলিশ ও সামরিক বিভাগের কর্ম্মচারিগণের সহিত জনসাধারণের সম্প্রীতি ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছে, ইহা এই সম্মিলনী লক্ষ্য করিয়াছেন, এবং আশা করেন যে, প্রথমোক্ত সম্প্রদায় ঊর্দ্ধতন কর্ম্মচারীর আজ্ঞা পালনের জন্য নিজের দেশ ও বিশ্বাসকে পরিহার করিবেন না এবং শিষ্টাচার ও ধীরতার পরিচয় দিয়া তাঁহারা যে দেশবাসীর আশা ও আকাঙ্ক্ষার প্রতি শ্রদ্ধাবান্ নহেন, এই দুর্নাম ক্ষালন করেন।

[illegible] সম্মিলনী গবর্মেণ্টের কর্ম্মচারিগণকে অনুরোধ করিতেছেন যে, [illegible] যেন দেশের আহ্বানে স্ব স্ব কর্ম্মে ইস্তফা দিবার জন্য প্রস্তুত [illegible] এবং দেশের কার্য্যে সহায়তা করিবার জন্য দেশবাসীর সহিত [illegible]দার ও সাধু ব্যবহারে অভ্যস্ত হয়েন। ব্যক্তিগতভাবে দেশের কার্য্যে যোগদান না করিলেও তাঁহারা নির্ভীক এবং প্রকাশ্যভাবে সর্ব্বপ্রকার জনসাধারণের সভায় যোগদান করুন, এবং এই জাতীয় আন্দোলনের সফলতার জন্য অর্থসাহায্য করুন।

এই সম্মিলনী বিশেষভাবে দৃঢ়তার সহিত ঘোষণা করিতেছেন যে, এই অসহযোগ আন্দোলনের মূল ভিত্তি অহিংসা। বাক্যে ও কর্ম্মে জনসাধারণ গবর্ণমেণ্টকে কোনপ্রকার আঘাত করিবেন না, এবং গবর্মেণ্টেরও যে এই নীতি পালন করা উচিত, ইহা এই কংগ্রেস প্রত্যেক সভ্যকে বিশেষভাবে স্মরণ করাইয়া দিতেছেন। এই কংগ্রেস বলিতেছেন

যে, প্রতিহিংসামূলক শক্তিপ্রয়োগ গণতন্ত্রের মূলতত্ত্বের বিরোধী এবং (প্রয়োজন হইলে) অসহযোগনীতি সর্ব্বাংশে প্রয়োগ করিবার পথে বিঘ্ন উৎপাদন করিবে।

পরিশেষে যাহাতে পাঞ্জাব ও খেলাফৎ সমস্যা সুমীমাংসিত হয় এবং এই বৎসরের মধ্যেই স্বরাজপ্রতিষ্ঠা হয়, তজ্জন্য গবর্মেণ্টের সহিত সর্ব্বপ্রকার সংস্রব ত্যাগ করিবার জন্য প্রত্যেক ভারতবাসীকে এই সম্মিলনী অনুরোধ করিতেছেন। অপরদিকে নিজেদের মধ্যে ঐক্য ও পরস্পরের সহায়তা করিবার ভাব বৃদ্ধি করিবার উপরেই আন্দোলনের সাফল্য নির্ভর করিতেছে। হিন্দুমুসলমানের ঐক্য-বিধান এবং হিন্দুদিগের মধ্যে ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণেতর জাতি-সমূহের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিরোধের মীমাংসা করিবার জন্য এই কংগ্রেস সকলকে অনুরোধ করিতেছেন। বিশেষতঃ হিন্দু ধর্ম্মের অঙ্গ হইতে ছুৎমার্গ কলঙ্ক অপনোদন করিতে হইবে। পতিত জাতি-সমূহকে উদ্ধার করিবার জন্য ধর্ম্মনায়কদিগকে এই সভা অনুরোধ করিতেছেন।"

নাগপুর কংগ্রেসের পর হইতে সহযোগিতাবর্জ্জন আন্দোলন খরতরবেগে প্রবাহিত হইতেছে। এ আন্দোলনের প্রবল বন্যায় আ[illegible] হিমাচল সমগ্র ভারতবর্ষ প্লাবিত, উচ্ছ্বসিত, উদ্বেলিত। এ আন্দো[illegible] তথাকথিত উচ্চ বা শিক্ষিত শ্রেণীর মধ্যে নিবদ্ধ নহে, ইহা [illegible] শক্তিকেন্দ্র জনসাধারণের মধ্যে প্রবেশ লাভ করিয়াছে, তাহাদের মধ্যে এক নবজীবনের সূচনা করিয়াছে। এই ক্ষুদ্র পুস্তকে এই আন্দোলনের স্বরূপ বুঝান কঠিন, আর বুঝাইবার সময়ও ইহা নহে। এ আন্দোলনের নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা পাঠকগণ সংবাদপত্র পাঠে অবগত হইতেছেন। লালা লজপৎ রায়ের জীবনী সম্পর্কে যেটুকু বলা প্রয়োজন, আমরা তাহা বলিয়াই ক্ষান্ত থাকিব।

ভারতের অসহযোগ আন্দোলনে লালা লজপৎ রায়ের স্থান কোথায়, নির্দ্দেশ করিবার সময় এখনও আসে নাই। তবে এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে যে, মহাত্মা গন্ধীর পর লালা লজপৎ রায়ই এ

আন্দোলনের অন্যতম প্রধান কর্ণধার। অসহযোগের সাফল্যের জন্য লজপৎ রায় যথাসর্ব্বস্ব দান করিয়াছেন, নিজের জীবন প্রাণ উৎসৃষ্ট করিয়াছেন।

কংগ্রেসে সহযোগিতাবর্জ্জন নীতি গৃহীত হইলে সহযোগিতাবর্জ্জনের স্তর-বিন্যাস করা প্রয়োজন হয়। সহযোগিতাবর্জ্জনের প্রথম স্তর কর্ম্মী, অর্থ ও চরকা সংগ্রহ করা। এ বিষয়ে আলোচনার জন্য ১৯২১ সনের মার্চ্চ মাসের শেষভাগে মাদ্রাজপ্রদেশের অন্তর্গত বেজওয়াদাতে নিখিল-ভারত কংগ্রেসকমিটীর এক বিশেষ অধিবেশন হয়। তাহাতে স্থির হয়, কংগ্রেসের তিলক-স্বরাজভাণ্ডারের জন্য ১ কোটি টাকা, কংগ্রেসের এক কোটি সদস্য এবং ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে চালাইবার জন্য ২০ লক্ষ চরকা সংগ্রহ করিতে হইবে। লালা লজৎপৎ রায় এই সভায় যোগদান করেন এবং সভার মতামত নির্দ্ধারণে বিশেষ সহায়তা করেন। তিনি এই সভায় দেশবাসীর বর্ত্তমান কর্ত্তব্য সম্বন্ধে যে এক ওজস্বিনী বক্তৃতা করেন, তাহা দেশবাসীর হৃদয়ে চিরকাল জাগরূক থাকিবে।

অর্থ, সদস্য ও চরকা সংগ্রহের ভার বিভিন্ন প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটী নেতৃবর্গের হস্তে ন্যস্ত হয়। লালা লজপৎ রায় পাঞ্জাব প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটীর সভাপতি ও পাঞ্জাবের অবিসংবাদিত জননায়ক। তিনি পাঞ্জাবের ভার গ্রহণ করেন, এবং অত্যাল্পকালমধ্যেই নির্দ্দিষ্ট অর্থ, চরকা ও সদস্য সংগ্রহ করিতে সমর্থ হন। অর্থসংগ্রহ কার্য্যে তিনি পাঞ্জাবের নানা স্থানে ভ্রমণ করিয়া বক্তৃতা করেন এবং পাঞ্জাববাসীর হৃদয়ে এক অপূর্ব্ব স্বদেশপ্রেমের উদ্দীপনা জাগাইয়া তুলেন। এই সময়ে ব্যুরো-ক্রেশীর হস্তে তাঁহাকে অনেক নিগ্রহ ভোগ করিতে হয়। তাঁহার পক্ষে পেশোয়ার ও সীমান্তপ্রদেশে প্রবেশ নিষিদ্ধ হইয়া যায়, রাওয়ালপিণ্ডির পথে তাঁহার গাড়ী আটক করা হয়। কোন কোন দেশীয় রাজ্যেও তাঁহার প্রবেশ নিষিদ্ধ হয়,—কপূর্তলার রাজা তাঁহাকে কপূর্তলায় প্রবেশ করিতে বাধা দেন। কিন্তু এ সব কাণ্ডে লালাজী একটুও

বিচলিত হন না, তিনি দ্বিগুণ উৎসাহ ও অধ্যবসায়ের সহিত তাঁহার কর্ত্তব্য করিয়া যান।

পাঞ্জাবে চরকা ও তাঁতের প্রচলনেও লালাজী অভূতপূর্ব্ব কৃতকার্য্যতা লাভ করেন। বেজওয়াদার প্রস্তাবে সমগ্র ভারতের জন্য ২০ লক্ষ চরকা সংগ্রহের আদেশ হয়। আর লালা লজপৎ রায়ের উদ্যোগে এক মাত্র পাঞ্জাবেই ৪০ লক্ষ চরকা প্রচলিত হয়। এই সকল চরকা রীতিমত চলিতেছে। বর্ত্তমানে পাঞ্জাবে যে যথেষ্ট সূতা ও খদ্দর প্রস্তুত হইতেছে, চরকা ও তাঁত প্রচলনে লজপৎ রায়ের অক্লান্ত পরিশ্রম ও অধ্যবসায় ইহার মূলে নিহিত।

তিলক স্বরাজ-ভাণ্ডারে যখন অর্থ সংগৃহীত হইল এবং কংগ্রেস কমিটীর আশানুরূপ সদস্য পাওয়া গেল, তখন দ্বিতীয় সোপান অতিক্রম করা স্থির হইল—বিদেশী বর্জ্জন। বোম্বাইয়ে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটীর অধিবেশন বসিল—তাহাতে স্থির হইল,৩০শে সেপ্টেম্বরের মধ্যে বিদেশী বর্জ্জনব্রত পূর্ণরূপে উদ্‌যাপন করিতে হইবে, বিদেশী বস্ত্র বর্জ্জন করিয়া স্বদেশী বস্ত্র গ্রহণ করিতে হইবে। লালা লজপৎ রায় এই অধিবেশনে যোগদান করেন। মহাত্মা গন্ধী বিদেশী বস্ত্রবর্জ্জনের প্রস্তাব উত্থাপন করেন, লালা লজপৎ রায় সে প্রস্তাব সমর্থন করেন। লালাজী আজীবন পাকা স্বদেশী। তাঁহার মতে স্বদেশী ও বয়কট একই কথা। স্বদেশী আন্দোলনের সাফল্যকল্পে তিনি কিরূপ কাজ করিয়াছিলেন, তাহা যথাস্থানে উল্লিখিত হইয়াছে। লালাজীর মতে স্বদেশীই স্বরাজলাভের প্রধান সোপান। স্বদেশীই ভারতে স্বরাজ আনয়ন করিবে। আবার বয়কট বা বিদেশী-বর্জ্জন ব্যতীত স্বদেশী সাফল্য লাভ করিতে পারে না। এই জন্যই বিদেশী বর্জ্জনের আবশ্যকতা।

বিদেশী বর্জ্জন সহযোগিতা-বর্জ্জনের অন্যতম প্রধান সোপান। বিদেশী বর্জ্জন অনুষ্ঠান সাফল্য লাভ করিলে যে অসহযোগ আন্দোলন কৃতকার্য্যতা লাভ করিতে পারিবে, তাহা অনেক ইংরাজও স্বীকার করেন।

কিছুদিন হইল বিলাতের "পিপল" নামক সুবিখ্যাত পত্রে লর্ড এম্পথিল এ সম্পর্কে একটি অতি সুচিন্তিত প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। তিনি প্রবন্ধে নানাবিধ অকাট্য যুক্তি দ্বারা প্রমাণ করেন যে, ভারতে বিদেশী বর্জ্জন আন্দোলন সফলকাম হইলে বিলাতের সমূহ ক্ষতি হইবে এবং ইংরাজগণ ভারতবাসীর প্রার্থিত দাবী পূরণ করিতে বাধ্য হইবেন।

সে যাহা হউক, বিদেশী বর্জ্জনের সাফল্যকল্পেও লালাজী পাঞ্জাব ও ভারতের অন্যান্য প্রদেশে পরিভ্রমণ করেন এবং ওজস্বিনী বক্তৃতা করিয়া দেশবাসীকে বিদেশী বর্জ্জনের আবশ্যকতা বুঝাইয়া দেন। তিনি যেখানেই উপস্থিত হইয়াছেন, সেইখানেই সহস্র সহস্র টাকার বিদেশী বস্ত্র অগ্নিসাৎ করা হইয়াছে। তিনি কেবল বিদেশী বস্ত্র দগ্ধ করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই, পক্ষান্তরে যাহাতে প্রচুর পরিমাণে স্বদেশী বস্ত্র প্রস্তুত হইতে পারে, তাহারও নানারূপ সুব্যবস্থা করেন।

এ দিকে সেপ্টেম্বর মাসে ভারতের অন্যতম জননায়ক মৌলানা মহম্মদ আলি, মৌলানা সৌকৎ আলি, ডাক্তার কিচলু, জগদ্‌গুরু শ্রীশঙ্করাচার্য্য প্রমুখ সাত জন নেতাকে গ্রেপ্তার করা হয়। তাঁহাদের অপরাধ—তাঁহারা করাচীর খেলাফৎ কনফারেন্সে সৈন্য, পুলিশ ও অন্যান্য কর্ম্মচারিগণকে সরকারী চাকরী ছাড়িতে অনুরোধ করিয়া এক প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছিলেন। সরকার আলি-ভ্রাতৃদ্বয় ও অন্যান্য নেতৃগণকে মামলা-সোপর্দ্দ করিয়া যে নীতির পরিচয় দেন, তাহাতে কর্ত্তব্য-নির্দ্ধারণ জন্য অক্টোবর মাসের প্রথম ভাগে বোম্বায়ে কংগ্রেস কর্ম্মীদিগের এক পরামর্শ-সভার অধিবেশন হয়। ভারতের সকল প্রদেশের প্রধান প্রধান জননায়কগণ এই সভায় যোগদান করেন। লালা লজপৎ রায়ও এই সভায় উপস্থিত থাকেন। এই সভার ফলে নেতৃগণ নিম্নলিখিত মর্ম্মে এক ঘোষণা প্রচার করেন :—

"বোম্বাই-সরকার গত ১৫ই সেপ্টেম্বর তারিখের ইস্তাহারে আলি-ভ্রাতৃদ্বয় প্রভৃতিকে মামলা সোপর্দ্দ করিবার যে কারণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন

তাহাতে আমরা নিম্নস্বাক্ষরকারীরা ব্যক্তিগতভাবে এই মত ব্যক্ত করিতে চাহি যে, সরকারের সামরিক বা অন্য বিভাগে চাকরী করা দেশবাসীর পক্ষে সঙ্গত কি না, সে বিষয়ে স্বাধীনভাবে মত প্রকাশ করিবার অধিকার প্রত্যেক মানুষেরই আছে।

আমাদের মত সরকারের সহিত সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করিয়া অন্য উপায়ে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করা প্রত্যেক সৈনিকের ও অন্যান্য চাকরীয়ার কর্ত্তব্য।"

মহাত্মা গন্ধী, লালা লজপৎ রায়, মতিলাল নেহেরু প্রভৃতি ৫০ জন নেতা এই ঘোষণাপত্রে স্বাক্ষর করেন। ইহার পর ভারতের সর্ব্বত্রই নানা সভাসমিতিতে করাচীর প্রস্তাব উত্থাপিত, সমর্থিত ও সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

তাহার পর আইন অমান্য করার প্রস্তাব। আইন অমান্য করা সহযোগিতা-বর্জ্জনের অন্যতম সোপান। প্রথমে মহাত্মা গন্ধী প্রবর্ত্তিত অসহযোগ আন্দোলনে এই আইন অমান্য করা গৃহীত হয় নাই। সরকার দেশের লোকের মত পদদলিত করিয়া রৌলট আইন বিধিবদ্ধ করিলে, তখন মহাত্মা গন্ধী যে প্রতিজ্ঞাপত্র প্রচার করিয়াছিলেন, তাহাতে এই কথা ছিল যে, জাতীয় মহাসমিতি যে সব আইন অমান্য করিতে বলিবেন, লোক সেই সব আইন মান্য করিতে অস্বীকার করিবে, এবং সে জন্য সরকার দণ্ডবিধান করিলে, সে দণ্ড গ্রহণ করিবে। পাঞ্জাব, বোম্বাই ও দিল্লী তিন স্থানে হাঙ্গামা হইবার পর আইন অমান্য করা প্রস্তাব প্রত্যাহার করা হয়। তখনও কংগ্রেসে সহযোগিতা বর্জ্জন নীতি গৃহীত হয় নাই। কলিকাতা স্পেশ্যাল কংগ্রেসে সহযোগিতাবর্জ্জন নীতি গৃহীত হইলে সহযোগিতাবর্জ্জনের স্তর বিন্যাস করা প্রয়োজন হয়। প্রথম স্তর কর্ম্মী, চরকা ও অর্থ সংগ্রহ করা। তিলক স্বরাজভাণ্ডারে যখন অর্থ সংগৃহীত হইল এবং কংগ্রেস কমিটীর আশানুরূপ সদস্য পাওয়া গেল, তখন দ্বিতীয় সোপান অতিক্রম করা স্থির হইল—বিদেশী বর্জ্জন।

ইহার পরই আসিল আইন অমান্য করার কথা। যাঁহারা অসহযোগনীতির পক্ষপাতী, তাঁহারা সকলেই স্বীকার করেন, আইন অমান্য করা সে নীতির অন্যতম সোপান এবং সাফল্যলাভ করিতে হইলে সে সোপান অতিক্রম করিতেই হইবে। কেবল দেশ এখনও তাহার জন্য প্রস্তুত কি না এবং সে সোপান অতিক্রম করিবার সময় হইয়াছে কি না, এ বিষয়ে মতভেদ থাকিতে পারে এবং আছেও।

দেশের জনসাধারণ কেন, কেবল ইংরাজি-শিক্ষিত সম্প্রদায় যদি অসহযোগনীতি অবলম্বন করেন, তাহা হইলেই যে সরকারের কাজ অচল হয়, শাসনচক্র বিকল হয়, তাহা সেদিন বিলাতে সার ভ্যালেন্‌টাইন চিরলও স্বীকার করিয়াছেন। তিনি কোন সভায় "ভারতে শাসনসংস্কার" সম্বন্ধে এক প্রবন্ধ পাঠ করেন। সভায় পাঞ্জাবী অনাচারের নায়ক সার মাইকেল ওডায়ার উপস্থিত ছিলেন। তিনি বলেন, শাসন-সংস্কারে কিরূপ ফল ফলিবে, সে বিষয়ে তাঁহার বিশেষ সন্দেহ আছে। দেখা গিয়াছে, দেশের জনসাধারণ প্রাধান্য পায় নাই, প্রাধান্য লাভ করিয়াছে, মুষ্টিমেয় ইংরাজি-শিক্ষিত সম্প্রদায়। তাহারই উত্তরে সার ভ্যালেণ্টাইন বলিয়াছিলেন, [illegible] ইহারাই রাজনীতিক অধিকার লাভ করিবার জন্য আন্দোলন করিয়াছিলেন এবং তাঁহাদের সহযোগিতার অভাব হইলে, সরকারের কাজ অচল হইবে।

৪ঠা নবেম্বর শুক্রবার দিবস দিল্লীতে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটীর অধিবেশন বসে। এই অধিবেশনেই কংগ্রেস কর্ত্তৃক আইন অমান্যের ব্যবস্থা অনুমোদিত হয়। এই অধিবেশনে সর্ব্বসম্মতিক্রমে লালা লজপৎ রায় সভাপতির পদে বৃত হন। লালাজীকে এ অধিবেশনের সভাপতি করিয়া কংগ্রেস কমিটীর সদস্যগণ বুদ্ধিমত্তা ও গুণগ্রাহিতার পরিচয় প্রদান করেন। আদি হইতে অন্ত পর্য্যন্ত লালাজী অতিশয় ধীরতা ও বিচক্ষণতার সহিত এই অতি গুরুতর বিষয়ের মীমাংসায় সহায়তা করেন।

অপরাহ্ণে দুইটার সময় কমিটীর অধিবেশন বসে, এবং রাত্রি ৭টা

পর্য্যন্ত আলোচনাদি চলে। সভায় আইন অমান্যের ব্যবস্থা অনুমোদিত হয়, কিন্তু প্রথমে সাবধানতা অবলম্বনে অল্প অল্প করিয়া আরম্ভ করিবার ব্যবস্থা হয়। মহাত্মা গন্ধী নিজেই বলিয়াছেন, কংগ্রেসের এ ব্যবস্থা প্রকাশ্য বিদ্রোহ, তবে শান্তভাবে। আইন অমান্যের প্রস্তাবটির যেমন গুরুত্ব, এ সম্বন্ধে আলোচনাও তেমনই খুব বেশী রকম হয়। প্রস্তাবটি কংগ্রেস কমিটী কর্ত্তৃক পূরাপূরিভাবে অনুমোদিত করাইয়া লইবার জন্য অনেক বক্তা রীতিমত বাগ্‌যুদ্ধে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। মহাত্মা গন্ধী স্বয়ং এই আইন-ভঙ্গের প্রস্তাবটি উত্থাপিত করেন। এই উপলক্ষে তিনি একটি সুদীর্ঘ বক্তৃতা করেন এবং বক্তৃতায় আইনভঙ্গের ব্যাখ্যা ও প্রণালী নির্দ্দেশ করেন। মহাত্মার বক্তৃতার অবসানে অনেকে অনেক রকম সংশোধন প্রস্তাব উপস্থিত করেন। মোট প্রায় পাঁচ ঘণ্টাকাল তুমুল বাগ্‌যুদ্ধের পর একটু সংশোধিত আকারে মহাত্মার প্রস্তাবই গৃহীত হয়। সংশোধিত প্রস্তাবটি এই:—

"এ বৎসরের মধ্যে স্বরাজের প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য সমগ্র জাতির আগ্রহ। তাহা কার্য্যে পরিণত করিবার পক্ষে আর এক মাস... সময় নাই বলিলেও চলে। তাহার পর আলি-ভ্রাতৃদ্বয় ও অন্যান্য... দের গ্রেপ্তার ও কারাদণ্ডে সমগ্র জাতি সম্পূর্ণ অত্যাচারবর্জ্জিত ... আদর্শ আত্ম-সংযম শক্তির পরিচয় দিয়াছে। আর স্বরাজলাভের পর্... আরও সংযম ও আরও দুঃখ-কষ্ট সহ্য করার ক্ষমতার পরিচয় দেওয়া জাতির পক্ষে আবশ্যক বিবেচিত হইয়াছে। এই জন্য নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটী প্রত্যেক প্রদেশকে নিজ নিজ দায়িত্বে শান্তভাবে আইন লঙ্ঘনের অধিকার দিতেছেন। এই আইন লঙ্ঘনের মধ্যে টেক্স না দেওয়ার ব্যবস্থাও গণনীয়। প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটী যে ভাবে টেক্স দেওয়া বন্ধ করিতে বলিবেন, সেই ভাবেই ঐ কার্য্য করিতে হইবে। কতকগুলি সর্ত্ত এই:—

(১) যে ব্যক্তি আইন লঙ্ঘন করিবেন, তাঁহার চরকায় সুতাকাটা

জানা দরকার ; তাঁহার বিদেশী বস্ত্র সম্পূর্ণভাবে পরিত্যাগ করিয়া থাকা এবং কেবল হাতে কাটা সূতায় হাতে বোনা কাপড় পরা চাই। হিন্দু-মুসলমানের ও বিভিন্ন সম্প্রদায়ীদের একতায় তাঁহার বিশ্বাস থাকা চাই। খেলাফৎ ও পাঞ্জাবের অত্যাচারের প্রতীকারের ও স্বরাজলাভের জন্য যে অত্যাচার বর্জ্জন প্রয়োজন—এ কথাতেও তাঁহার দৃঢ়বিশ্বাস থাকা দরকার। আর দরকার—যদি তিনি হিন্দু হন, তাহা হইলে তাঁহার কার্য্য-ক্ষেত্রে প্রদর্শন করা যে—স্পর্শদোষের ব্যাপার জাতীয়তার পক্ষে যে বিশেষ দোষাবহ, তাহা তিনি বিশ্বাস করেন।

(২) এক সঙ্গে সকলের জন্য আইনভঙ্গের ব্যবস্থা করিতে হইলে একটি তহশীল বা জেলায় সে কার্য্য আরম্ভ করিতে হইবে। আর সে জেলা বা তহশীলে অধিকাংশ লোকের স্বদেশী ব্রত গ্রহণ করিয়া থাকা দরকার ; আর, তাহাদের নিজ জেলায় হাতে কাটা সূতায় হাতে বোনা কাপড় ব্যবহার প্রয়োজন, এবং তাহাদের পক্ষে অসহযোগের আর সকল ব্যবস্থায় বিশ্বাস রাখা ও তাহা কার্য্যে পরিণত করা দরকার।

[illegible] কোন আইনভঙ্গকারী যেন সাধারণ ধনভাণ্ডার হইতে অর্থ-[illegible] আশা না করেন ; তাঁহার পরিবারবর্গ তাঁহার জেলের সময় [illegible] পেঁজা, সূতা কাটা, কাপড় বোনা, বা অন্য রকম কার্য্যের দ্বারাই যেন সংসারের ব্যয় নির্ব্বাহ করেন।

(৪) প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটীর প্রার্থনা অনুসারে কংগ্রেসের কার্য্য-করী কমিটী উল্লিখিত সর্ত্তগুলির কঠোরতা হ্রাস করিয়া দিতে পারিবেন।"

এই অধিবেশনের সভাপতিরূপে লালা লজপৎ রায় আইন অমান্য করার প্রস্তাব সর্ব্বতোভাবে সমর্থন করেন। তিনি একটি সুযুক্তিপূর্ণ বক্তৃতা দ্বারা নির্ব্বিরোধ আইন লঙ্ঘনের প্রয়োজনীয়তা ও প্রণালীর বিশদ ব্যাখ্যা করেন। তিনি বলেন,—"আইন অমান্য করিতে যাইয়া সর-কারের নিকট অবশ্যই আমরা ভাল ব্যবহার আশা করিতে পারি না।

আমাদের সেরূপ আশা করিবারও অধিকার নাই। সরকারকে কোনও প্রকারে আমল না দিবার জন্যই আমরা প্রস্তুত, কাজেই আমাদেরও কিছু আশা করা উচিত নহে। আমাদের প্রতি যতই অধিক অন্যায় করা হইতেছে, আমাদিগকে যত অধিক দুঃখ-কষ্ট ভোগ করিতে হইতেছে, আমাদিগকে যত অধিক ধৈর্য্য ও দৃঢ় সঙ্কল্পতা দেখাইতে হইতেছে, ততই আমরা স্বরাজের পথে অগ্রসর হইতেছি।" তিনি আরও বলেন,—"এ ব্যাপারে আমাদিগকে অত্যন্ত ধীরতা ও সতর্কতার সহিত চলিতে হইবে। আমরা যেন মুহূর্ত্তেকের তরেও আত্মবিস্মৃত না হই, মুহূর্ত্তেকের তরেও সংযম হারাইয়া অনাচার অত্যাচারের আশ্রয় গ্রহণ না করি। আমাদিগকে সর্ব্বতোভাবে অত্যাচারবিহীন হইয়া চলিতে হইবে। আর আমাদের সঙ্কল্পকে হিমালয়ের মত অচল অটল রাখিতে হইবে। আমাদের সঙ্কল্প যেন মুহূর্ত্তেকের জন্য টলিত না হয়; কারণ, একবার আরম্ভ করিয়া পুনরায় পশ্চাৎপদ হইলে চলিবে না। যখন একবার আরম্ভ করিব, তখন শত ঝঞ্ঝাবায়ু অগ্রাহ্য করিয়া আমাদিগকে ভীমবেগে লক্ষ্যমুখে অগ্রসর হইতে হইবে। আমাদের মূলমন্ত্র হইবে, মন্ত্রের সাধন, শরীর পাতন।"

এই সময় দিল্লীতে ৬ই নবেম্বর (১৯২১) তারিখে নিখিল ভারত হিন্দু-মহাসভার বিশেষ অধিবেশন হয়। এই অধিবেশনে স্বধর্ম্মপরায়ণ লালা লজপৎ রায় সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করেন। হিন্দুসভার এই অধিবেশন নানা ভাবে বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। এবার লক্ষ্য করিবার সর্ব্বপ্রধান বিষয়, মুসলমান নেতা হাকিম আজমল খাঁ অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতিরূপে সমবেত প্রতিনিধিবর্গকে অভ্যর্থনা করিয়াছিলেন। সভাপতির অভিভাষণে লালা লজপৎ রায় যাহা বলিয়াছিলেন, তাহাও প্রত্যেক হিন্দুরই বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। লালাজী বলেন, "যাঁহারা এই সভার পূর্ব্বেতিহাস অবগত আছেন, তাঁহারা জানেন, পূর্ব্বে ইহা হিন্দু রাজা মহারাজা জমীদার প্রভৃতির অবসরবিনোদনের ও খ্যাতি অর্জ্জনের উপায়

মাত্র ছিল। পাঞ্জাবে যখন প্রথম হিন্দু-সভা স্থাপিত হয়, তখন ইহার প্রথম অধিবেশনেই বলা হইয়াছিল, এই সভা হিন্দুদিগের মধ্যে একতা স্থাপন করিয়া জাতিগঠনের উদ্দেশ্যে স্থাপিত হইল। কিন্তু সে দিন যে আশা উদ্ভূত হইয়াছিল, তাহা বিলয়ভূমিষ্ঠ বিদ্যুতের মত নির্ব্বাপিত হইয়াছিল। যাঁহারা সভার নেতৃত্বভার গ্রহণ করেন, তাঁহারা সরকারের কৃপাকণালাভই পরমার্থ বলিয়া বিবেচনা করিতে আরম্ভ করেন। সভা হিন্দু-মুসলমানে বিরোধ ঘটাইতে থাকে। কর্ম্মীরা ত্যাগে বিমুখ হইয়া কেহ বা 'খেতাব' কেহ বা 'জায়গীর' লাভের স্বপ্ন দেখিতে থাকেন। কাজেই সভার কাজ সর্ব্ববিধ বৈশিষ্ট্যবর্জ্জিত হয়, এবং ইহাতে হিন্দুর গর্ব্ব করিবার মত কোন কাজই হয় নাই। এমন কি, হিন্দুগণের উন্নতিকর কোন কাজও সভার দ্বারা হয় নাই। কিন্তু যে ভাবের প্রবাহ সমগ্র ভারতে ব্যাপ্ত হইয়াছে, হিন্দুসভাও আর তাহার গতিরোধ করিতে পারেন নাই। গতবার হিন্দুসভার অধিবেশনস্থান হিন্দুর পুণ্যতীর্থ শ্রীবৃন্দ[illegible]। সেই অধিবেশনে সভায় যে প্রস্তাব গৃহীত হয়, তাহাতেই [illegible]পূর্ণ পরিচয় প্রকট হইয়াছিল। সভা[illegible]তি (পণ্ডিত [illegible]লবী) স্বয়ং সহযোগিতা বর্জ্জনের সমর্থক না হইলেও সভায় [illegible]যোগিতাবর্জ্জন সমর্থিত হয় এবং সভাপতির বিরোধ সত্ত্বেও যে বর্জ্জননীতির সমর্থক প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছিল, তাহাতেই বুঝা যায়, দেশের জনসাধারণ এই নীতিরই পক্ষপাতী।

আজকাল কোন কোন হিন্দু বলিয়া থাকেন, রাজা যেমনই হউক না কেন, তাঁহাকে ভক্তি করাই প্রজার কর্ত্তব্য, ইহাই হিন্দু-ধর্ম্মের অনুশাসন। এ কথা শুনিয়া লজ্জায় আমার মাথা হেঁট হয়! এমন কোন কথা হিন্দু শাস্ত্রে নাই। যদি হিন্দু-শাস্ত্রে এ কথা থাকিত, তবে আমি বহু-পূর্ব্বেই হিন্দুধর্ম্ম ত্যাগ করিতাম। যাঁহারা এমন কথা বলেন, তাঁহারা হয় অজ্ঞ, নহে ত স্বার্থান্ধ হইয়া এমন কথা বলেন। কোন ধর্ম্মই মানুষকে চির পরাধীন থাকিতে বলে না। হিন্দুর কাম্য মোক্ষ, জগতের সব বন্ধন

ছিন্ন না করিলে মোক্ষলাভ হয় না; কাজেই যে সব জের আমাদিগকে জড়াইয়া থাকে, সে সব ছিন্ন করিতে হইবে। ইহাই ধর্ম্ম, বর্ত্তমানে এ দেশে ভারতীয় শাসন প্রতিষ্ঠা করাই ভারতবাসীর ধর্ম্ম। এ দেশের পার্লামেণ্ট প্রয়োজন। ইংরাজের পূর্ব্বে এ দেশে বিদেশী শাসক ছিল না; কেন না, মুসলমান এ দেশে আসিয়া দেশের লোক হইয়া শাসনদণ্ড পরিচালিত করিতেন। ভারতবাসী আধ্যাত্মিক শক্তিবলে স্বরাজলাভ করিবে, ধর্ম্মের শাসন মানিলেই আমরা ঈপ্সিত ফললাভ করিতে পারিব।"

তাহার পর গো-রক্ষার কথা। এই সূত্রে লালা লজপৎ রায় বলেন, "হিন্দুগণের তিন জন মাতা—প্রথম, যিনি জন্ম দেন, দ্বিতীয়, জন্মভূমি ভারতবর্ষ, তৃতীয়, গো-জননী, যাহার দেওয়া দুগ্ধে আমাদের দেহ পুষ্ট হয়। আমরা যদি এই জননীগণকে রক্ষা করিতে না পারি, তবে আমাদের পাপের সীমা থাকিবে না। এই রক্ষার জন্যই স্বরাজপ্রতিষ্ঠা আবশ্যক; আবার স্বরাজের জন্য হিন্দু মোস্লেম ঐক্য প্রয়োজন।

এতদিন গো-রক্ষার জন্য আমরা যাঁহাদের মুখাপেক্ষী [illegible] তাঁহারাই গো-খাদক। এক কালে এ দেশের সরকারও [illegible] সন্দেহের দৃষ্টিতে দেখিতেন, কেন না, তাহাতে হিন্দুর বিভিন্ন [illegible]য়ের মধ্যে ঐক্য হয়। তাই গো-রক্ষার প্রয়োজন প্রতিপন্ন-কারীদের গতিবিধি গোয়েন্দা পুলিশ লক্ষ্য করিত। গো-হত্যা লইয়া যে সব দাঙ্গাহাঙ্গামা হইয়া গিয়াছে, তাহার মূলেও পুলিশের কোন চেষ্টা ছিল কি না, কে বলিতে পারে? একান্ত দুঃখের বিষয় যাঁহারা গো-রক্ষানুষ্ঠানে যোগ দিয়াছেন, তাঁহাদিগের কেহ কেহ য়ুরোপীয়ানদিগের সহিত গো-মাংস ভোজন করেন এবং কাহারও কাহারও অর্থে কশাইরা হত্যার জন্য গরু কিনিয়া থাকে। তাঁহারা সাবধান না হইলে, ভবিষ্যতে দেশের লোক আর তাঁহাদিগকে শ্রদ্ধা করিবে না। ইংরাজরা ইংরাজ সৈনিকদের জন্যই বৎসরে ১ লক্ষ ২০ হাজার গরু মারিয়া থাকেন। তাঁহারা কি এ বিষয়ে

আমদিগকে কোনরূপ সাহায্য করিবেন? সে আশা করিবার অবকাশ নাই. এ বিষয়ে হিন্দুমুসলমানকেই চেষ্টা করিতে হইবে।

আমি প্রত্যেক হিন্দুকেই বলিতেছি, অসহযোগই কৃতকার্য্যতালাভের একমাত্র উপায়। কোন কমিশনার, ডেপুটী কমিশনার বা অন্য কোন সরকারী কর্ম্মচারীই এ বিষয়ে আমাদিগকে সাহাব্য করিতে আসিবেন না। আমাদিগকে নিজের পায়ে দাঁড়াইতে হইবে, নিজের শক্তির উপর নির্ভর করিতে হইবে। তবেই আমাদের অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে।"

লালা লজপৎ রায়ের এই উক্তি ভারতবাসীকে ভাল করিয়া বুঝিতে হইবে। তিনি যাহা বলিয়াছেন, তাহাই হিন্দুর মত। পরবশ হওয়াই দুঃখ, আত্মবশ হওয়াই সুখ। গো-রক্ষা বিষয়েও ভারতবাসীকে আত্মনির্ভরশীল হইতে হইবে, পরমুখাপেক্ষী থাকিলে চলিবে না। আর এক কথা। এ দেশে গো-রক্ষার কাজ কেবল হিন্দু সভার নহে, কেবল হিন্দুর নহে, সে কাজ সকল ভারতাবাসীর। মুসলমানগণেরও এ বিষয়ে কর্ত্তব্য আছে। হাকিম আজমল খাঁ অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতিরূপে বলিয়াছেন, দুই [illegible] মানরা গো-বধে বিরত হইবেন—হিন্দুরা গো-বধে ব্যথিত [illegible] আর অর্থনীতিক কারণে। মুসলমানরা যে হিন্দুর মনে ব্যথা লাগি[illegible] ভয়ে গো-বধে বিরত হইবেন, এ জন্য হিন্দুমাত্রেই তাঁহাদের নিকট কৃতজ্ঞ। তাঁহারা যে অর্থনীতিক কারণের স্বরূপ গো-বধের গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়াছেন, ইহা বিশেষ আনন্দের বিষয়। ভারতবর্ষ কৃষিপ্রধান দেশ, অবাধ বাণিজ্যনীতির ফলে আজ কৃষিপ্রাণ! এ দেশে কৃষকের পক্ষে গোধন প্রধান সম্পদ্। ভারতবর্ষে সমস্ত চাষযোগ্য ভূমি চষিবার উপযুক্ত গরুও নাই। আবার এ দেশে বহু অধিবাসী মাংসাশী নহে বলিয়া পুষ্টিকর খাদ্যের মধ্যে দুগ্ধই সর্ব্বপ্রধান বলিয়া বিবেচনা করে। এ অবস্থায় এ দেশের গো-হত্যা কিরূপ বিপজ্জনক, তাহা সহজেই অনুমেয়। কাজেই এ দেশে গো-রক্ষা করা ও গো-জাতির উন্নতি করা বিশেষ প্রয়োজন। সেই কার্য্যে হিন্দু মুসলমানের স্বার্থ অভিন্ন। তাই আজ

কাল ভারতবর্ষে হিন্দুমুসলমানকে একযোগে গো-রক্ষায় যত্নশীল দেখিয়া দেশবাসী আশায় উৎফুল্ল হইয়াছে।

৯ই নবেম্বর তারিখে লাহোরে একটি অভূতপূর্ব্ব উৎসবের অনুষ্ঠান হয়। ইহা লাহোরের জাতীয় কলেজের উপাধি বিতরণ উৎসব। এই জাতীয় যজ্ঞে যজ্ঞেশ্বর স্বয়ং মহাত্মা গন্ধী। লালা লজপৎ রায় এই যজ্ঞে প্রধান ঋত্বিকের কার্য্য করেন। লালাজী চিরকাল জাতীয় শিক্ষার পক্ষপাতী। জাতীয় শিক্ষার প্রচারকল্পে তিনি তাঁহার সর্ব্বস্ব অর্পণ করিয়াছেন বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। পাঞ্জাব জাতীয় শিক্ষাপরিষদের তিনিই প্রাণস্বরূপ। তিনি পরিষদের সভাপতি এবং প্রধানতঃ তাঁহারই পরামর্শে ও অর্থানুকূল্যে পরিষদের সমস্ত কার্য্য পরিচালিত হয়। আজ তাঁহার সাধের জাতীয় বিদ্যালয়ের প্রথম উপাধি-বিতরণ সভা, আজ তাঁহার মনে কি এক অভূতপূর্ব্ব ভাবের সঞ্চার হইয়াছে, তাহা তিনিই বলিতে পারেন।

বিখ্যাত ব্র্যাডল হলের ভিতর সভার অধিবেশন হয়। সভায় অন্যূন দশ সহস্র লোক উপস্থিত। তন্মধ্যে মহিলার সংখ্যাই প্রায় সহস্রাধিক। সমগ্র পাঞ্জাবের অধিকাংশ গণ্যমান্য লোকই সে উৎসবে যো[illegible]য়। মহাত্মা গন্ধী ব্যতীত লালা হংসরাজ, অধ্যক্ষ সায়ন দাস, ডা[illegible] চাঁদ, কে সন্তানম্, লালা গোবর্দ্ধন দাস, ডাক্তার সত্য পাল, [illegible] লাল নেহেরু, মৌলানা আজাদ শোভানি, পণ্ডিত রামভজ দত্ত চৌধুরী, লালা দুনিচাঁদ প্রভৃতি ভারত-বিখ্যাত [illegible] ব্যক্তি সে সভায় যোগদান করেন, কাহাকে ফেলিয়া কাহার নাম ক[illegible]রব।

এই বিখ্যাত জাতীয় উৎসবে লালা লজপৎ রায় "জাতীয় শিক্ষা" বিষয়ে এক অতি সারগর্ভ বক্তৃতা করেন। তাঁহার এই বক্তৃতা তাঁহার ন্যায় জ্ঞানবীর ও শিক্ষা-প্রচারকেরই উপযুক্ত হইয়াছিল। এই বক্তৃতায় তিনি জাতীয় শিক্ষার বিভিন্ন প্রকারের অভিব্যক্তির আলোচনা করেন ও জাতীয় শিক্ষার সহিত জাতীয় মুক্তির আন্দোলনের কি সম্পর্ক, তাহা বিশদভাবে ব্যাখ্যা করেন। তিনি বলেন, জাতীয় মুক্তি ও জাতীয় শিক্ষার আন্দোলন

চিরকাল পাশাপাশি চলিয়া থাকে। এই দুই আন্দোলন এক অচ্ছেদ্য সূত্রে গ্রথিত। ঊনবিংশ শতাব্দীতে ম্যাটসিনি যেরূপ ইহার সত্যতা উপলব্ধি করিয়াছিলেন, বর্ত্তমান সময়ে সিনফিনরাও ঠিক সেইরূপ করিয়াছেন। ইহাঁদের প্রণালী বিভিন্ন সন্দেহ নাই কিন্তু ইহাঁরা উভয়েই বুঝিয়াছেন যে, জাতীয় মুক্তি ও জাতীয় শিক্ষার প্রচেষ্টা অভিন্ন-ভারতের হিন্দু মুসলমান জননায়কগণও প্রথম অবধি এ সত্য হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন। এ বিষয়ে স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতীর নাম সর্ব্বাগ্রে মনে পড়ে। লোকমান্য তিলকও যখন মুক্তির সংগাম আরম্ভ করেন, তখন সর্ব্বপ্রথমে জাতীয় শিক্ষার উপরই তাঁহার দৃষ্টি পতিত হয়। ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে শ্রীযুক্ত অরবিন্দ ঘোষও প্রথমে জাতীয় শিক্ষার প্রতিই মনোযোগ দেন এবং তাহারই ফলে বঙ্গীয় শিক্ষা-পরিষদের প্রতিষ্ঠা। মুসলমানগণের মধ্যে সার সৈয়দ আহ-ম্মদ সর্ব্বপ্রথম জাতীয় শিক্ষান্দোলন আরম্ভ করেন।

তাহার পর বর্ত্তমান আন্দোলনের কথা। মহাত্মা গন্ধী যখন জাতীয় শিক্ষান্দোলন আরম্ভ করেন, তখন সন্দেহ করা গিয়াছিল যে, স্কুল-কলেজ ক[illegible] আন্দোলন সফল হইবে কি না। কিন্তু সে বিষয়ে অনেকের [illegible] কিলেও জাতীয় শিক্ষাদানের আবশ্যকতা সম্বন্ধে সকলেই একমত [illegible] কলিকাতা কংগ্রেসে কোন কোন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয়ে মতভেদ লক্ষিত হইয়াছিল, কিন্তু নাগপুর কংগ্রেসে সে সমস্তই দূর হয়। তখন সর্ব্ববাদিসম্মতরূপে স্থিরীকৃত হয় যে, জাতীয় শিক্ষার ব্যবস্থা করিতেই হইবে।

স্বরাজ লাভ করিতে হইলে সকল প্রকার কুশিক্ষা দূর করিতে হইবে। আমাদের যুবকগণকে বর্ত্তমান অন্তঃসারশূন্য শিক্ষাপদ্ধতির প্রভাব হইতে মুক্ত করিতে না পারিলে সাফল্যলাভের আশা কম। কত জন ছাত্র বর্ত্তমান স্কুল-কলেজ ছাড়িল, তাহা আমাদের বিচার্য্য নহে, কারণ, তাহার উপর আমাদের সফলতা তত নির্ভর করে না। কিন্তু কত জন ছাত্র বর্ত্ত-মান আন্দোলনের আদর্শে অনুপ্রাণিত হইল, তাহাই আমাদের বিচার্য্য।

আমাদের সাফল্য ইহারই উপর নির্ভর করে। আমাদের ছাত্রগণ যতদিন জাতীয় আদর্শে অনুপ্রাণিত না হইবে, ততদিন সাফল্যের আশা নাই।

বাহিরে স্বরাজলাভ করিবার পূর্ব্বে প্রথমে আমাদের অন্তরে স্বরাজের প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে। স্বরাজের আদর্শে প্রত্যেক ব্যক্তিকে অনুপ্রাণিত হইতে হইবে। অন্তরের শক্তিই প্রকৃত শক্তি। জাতিমাত্রেরই এই অন্তঃশক্তির উপর নির্ভর করিতে শিখা উচিত। বিদেশী শিক্ষার দাসত্ব হইতে মুক্ত না হইতে পারিলে এই শক্তি লাভ হইতে পারে না। অসহযোগ আন্দোলনের প্রথম ভাগে অনেকে বলিয়াছিলেন, বর্ত্তমানে আমাদের জাতীয় শিক্ষা ব্যাপারে মনোনিবেশ করা উচিত নহে, কারণ, একটিমাত্র উদ্দেশ্যে আমাদের অখণ্ড মনোযোগ দিতে হইবে। পরে কিন্তু তাঁহারা সকলেই স্বীকার করিয়াছেন, সঙ্গে সঙ্গে জাতীয় শিক্ষার ব্যবস্থা করাও একান্ত আবশ্যক। এই জন্যই এই জাতীয় শিক্ষার আন্দোলন।

অতঃপর লালাজী শিক্ষাদানের ব্যবস্থা সম্বন্ধে আলোচনা করেন। তিনি বলেন, শিক্ষকের কর্ত্তব্য ছাত্রগণকে শিক্ষা দেওয়া নহে, কিন্তু শিক্ষার পথে পরিচালিত করা। যাহাতে ছাত্রগণের শারীরি[illegible] ও আধ্যাত্মিক বৃত্তিগুলির সমুচিত অনুশীলন হয়, প্রত্যেক [illegible] এ বিষয়ে লক্ষ্য রাখা আবশ্যক। বর্ত্তমান শিক্ষা-পদ্ধতিতে [illegible] মোটেই লক্ষ্য রাখা হয় না। প্রত্যেক ছাত্রকেই স্বাবলম্বন শিখিতে হইবে। জাতীয় বিদ্যালয়ে আর কিছু শিক্ষা হউক, আর নাই হউক, আমাদের আদর্শটি যে উচ্চ থাকিবে, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। জাতীয় শিক্ষায় আমাদের তিনটি বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি রাখিতে হইবে ;—প্রথমতঃ মাতৃভাষায় শিক্ষা দিতে হইবে, দ্বিতীয়তঃ ছাত্রগণ যেন না বুঝিয়া কেবল পাশের জন্য মুখস্থ না করে, তৃতীয়তঃ তাহাদের আদর্শের প্রতিকূল কোন শিক্ষাই যেন তাহাদিগকে না দেওয়া হয়।

লালাজী আযৌবন শিক্ষাপ্রচারে ব্রতী। কবে গ্রামে গ্রামে জাতীয় বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইবে, এ জন্য তিনি উদ্‌গ্রীব হইয়া আছেন। তাঁহার

মতে এই উপাধি বিতরণের উৎসব স্বরাজ-প্রতিষ্ঠার অগ্রদূত সত্য বটে, তাঁহাদের বিদ্যালয়ে দালান বা বহুমূল্যবান্ বড় বড় আসবাবপত্র নাই। কিন্তু ঐ সবে কিছু আসিয়া যায় না। দেশে যখন স্বরাজপ্রতিষ্ঠা হইবে, তখন স্বরাজ সরকারের কোষাগার হইতেই টাকা মিলিবে। আমাদের টাকার অভাব তত নহে, যত অভাব প্রকৃত উৎসাহী ছাত্রসমাজের। উপযুক্ত ছাত্র পাইলে টাকার জন্য ঠেকিবে না।

অতঃপর লালাজী মহাত্মার প্রবর্ত্তিত অহিংস অসহযোগের আলোচনা করেন। দেশের জনগণ যে পূর্ণ অহিংসনীতি পালন করিতে সমর্থ হইয়াছেন, ইহা বড়ই আহ্লাদের কথা। লালাজীর মতে পবিত্র অসহযোগ-নীতিই ভারতের মুক্তির সোপান। যে ব্যক্তি দেশের স্বার্থের বিরুদ্ধে কার্য্য করিবে, তাহার মাথা লজ্জায় হেঁট হওয়া উচিত। যখন ভারতে স্বরাজপ্রতিষ্ঠা হইবে, তখন দেশদ্রোহীদলকে সকলেই ধিক্কার দিবে। আর যাঁহারা এই অহিংস স্বরাজ-সংগ্রামে যোগ দান করিবেন, তাঁহাদের নাম বংশের ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে অঙ্কিত থাকিবে। আমাদের ফলাফলের [illegible] করা আবশ্যক করে না, কারণ, আমরা সত্য ও ন্যায়ের পথে [illegible] শীঘ্রই মহাত্মাজী শান্তভাবে আইন ভঙ্গ আরম্ভ করিবেন, লালাজী তাঁহার দেশবাসীর পক্ষ হইতে মহাত্মার কার্য্যে পূর্ণ অনুমোদন করেন।

উপসংহারে লালাজী কাতরভাবে ভগবানের কৃপাভিক্ষা করেন। তিনি বলেন, "হে পরমপিতা পরমেশ্বর! আমাদিগকে শক্তি দাও, আমরা যেন মহাত্মার পদানুসরণ করিতে পারি। আমাদিগকে জয়ের পথে লইয়া চল। প্রভো, তুমি আশীর্ব্বাদ কর, আমরা যেন এই মহাযজ্ঞে আহুতি প্রদান করিতে পারি।"

বক্তৃতা শেষ হইবার পর লালাজী মহাত্মা গন্ধীকে উপাধিপত্র বিতরণ করিবার জন্য অনুরোধ করেন। ছাত্রগণ শুভ্র খদ্দরের জামায় বিভূষিত ছিলেন, তাঁহাদের কোমর হরিদ্রাবর্ণে রঞ্জিত খদ্দরের চাদরে জড়িত ছিল।

প্রত্যেক ছাত্রকে নিম্নলিখিত মর্ম্মে প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করিতে হয়,—"আমি পবিত্রভাবে শপথ করিতেছি, চিরজীবন স্বদেশ ও স্বধর্ম্মের সেবা করিব, স্বদেশ ও স্বধর্ম্মের বিরুদ্ধজনক কোন কাজই করিব না।"

অতঃপর মহাত্মাজী ছাত্রগণের হস্তে উপাধিপত্র প্রদান করেন।

১৯২১ সনের ১৭ই নবেম্বর ভারতের ইতিহাসে চিরকাল উজ্জ্বল অক্ষরে অঙ্কিত থাকিবে। এই দিন আসমুদ্র হিমাচল অখণ্ড ভারতে যে বিরাট হরতাল অনুষ্ঠিত হয়, তাহার দৃষ্টান্ত সকল দেশের ইতিহাসেই বিরল। বাস্তবিক. এমন সর্ব্বব্যাপিক, সর্ব্বজাতিক, সর্ব্বসাম্প্রদায়িক হরতাল আমরা এ জীবনে পূর্ব্বে দেখি নাই, এমনটা যে সম্ভবপর, তাহা কল্পনাতেও আনিতে পারি নাই। ১৭ই তারিখ যুবরাজ প্রিন্স অব ওয়েলস ভারতে প্রথম পদার্পণ করেন, তাঁহার ভারতাগমন উপলক্ষেই এই অভূতপূর্ব্ব হরতাল অনুষ্ঠিত হয়। যুবরাজকে অপমান করা বা তাঁহার প্রতি কোনরূপ অসম্মান করা এ হরতালের উদ্দেশ্য নহে। ভারতবাসী যুবরাজের প্রতি বিদ্বিষ্ট নহেন,—যুবরাজ তাহাদের ভাই। তবে হরতালের উদ্দেশ্য তাঁহাকে বুঝাইয়া দেওয়া—এ দেশের আমলা-তন্ত্র ... অভ্যর্থনা করিতেছে, এ দেশ করে নাই।

হরতাল সর্ব্বত্রই অতিশয় শান্তি ও সুশৃঙ্খলার সহিত অনুষ্ঠিত হয় ... বোম্বাইয়ে ইহার ব্যতিক্রম হয়। যুবরাজ বেলা ১০টার সময় বোম্বাইয়ে পদার্পণ করেন, কিন্তু ইহার কিছুকাল পরেই এক দিকে হিন্দু-মুসলমান ও অপর দিকে পার্শী ও খৃষ্টান এই উভয় দলের মধ্যে ভীষণ দাঙ্গা আরম্ভ হয়। দাঙ্গার সঠিক কারণ জানা যায় না, তবে পার্শী ও ফিরিঙ্গীগণ যুবরাজের সংবর্দ্ধনায় যোগ দেয় বলিয়া হিন্দু-মুসলমানগণ তাহাদের প্রতি ক্রুদ্ধ হয় এবং ফলে দাঙ্গা বাধে। সুযোগ বুঝিয়া গুণ্ডার দল হাঙ্গামায় যোগদান করে এবং হাঙ্গামাকে বড়ই ভীষণতর করিয়া তুলে। ১৭ই, ১৮ই ও ১৯শে এই তিন দিন ব্যাপিয়া বোম্বাইয়ের রাস্তায় দাঙ্গা চলে। দাঙ্গা নিবারণের জন্য সশস্ত্র ফৌজ আনয়ন করা হয় এবং তাহারা কোন কোন

স্থানে গুলী চালাইতে বাধ্য হয়। দাঙ্গার ফলে বহুলোক হতাহত হয়—তিনজন য়ুরোপীয় ভদ্রলোক নিহত হন, এক পুলিশ নিহত হয় এবং বহু পুলিশ আহত হয়। হতাহতের শেষ বিবরণে প্রকাশ—মোটের উপর ৫৩ জন নিহত হয়, তন্মধ্যে চারিজন পুলিশের লোক। আহতগণের সংখ্যা প্রায় তিন শত। দাঙ্গাকারিগণ একটা মদের দোকানে ও কয়েকটি পার্শী মন্দিরে আগুন লাগাইয়া দেয়। দাঙ্গার ফলে তিন শতের উপর লোককে গ্রেপ্তার করা হয়।

এই দাঙ্গা নিবারণকল্পে মহাত্মা গন্ধী, শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু ও অন্যান্য বহু হিন্দু-মুসলমান ও পার্শী নেতাগণ অক্লান্ত পরিশ্রম করেন এবং তাঁহাদেরই সমবেত চেষ্টার ফলে পুনরায় শান্তি সংস্থাপিত হয়। ১৯শে তারিখ মহাত্মা গন্ধী বোম্বাইবাসিগণকে লক্ষ্য করিয়া একটি আবেদনপত্র প্রচার করেন এবং যতদিন পর্য্যন্ত শান্তি প্রতিষ্ঠিত না হয়, ততদিন আহার্য্য গ্রহণ করিবেন না বলিয়া প্রতিজ্ঞা করেন। মহাত্মার আবেদনে অত্যন্ত সুফল ফলে এবং অচিরেই বোম্বাইয়ে পূর্ণ শান্তি সংস্থাপিত হয়। এই [illegible] সহযোগী, অসহযোগী হিন্দু, মুসলমান, পার্শী, খৃষ্টান সকল সম্প্র-[illegible]বর্গ যথেষ্ট সহায়তা করেন।

[illegible] ব্যাপারে আমরা মহাত্মা গন্ধীর প্রকৃত মাহাত্ম্যের পরিচয় পাই। পূর্ণশান্তি প্রতিষ্ঠিত না হওয়া পর্য্যন্ত তিনি আহার্য্য স্পর্শ করেন না। তিন দিন পূর্ণ উপবাসের পর তিনি চতুর্থ দিবসে আহার গ্রহণ করেন। আমরা এই স্থানে মহাত্মা গন্ধীর আবেদনটি উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি। কারণ, ইহা দ্বারা বোম্বাইয়ের হাঙ্গামার উপর যথেষ্ট আলোকসম্পাত হইবে। ১৯শে তারিখ প্রাতঃকালে মহাত্মা গন্ধী নিম্নলিখিত আবেদনপত্র প্রচার করেন:

"বোম্বায়ের নর-নারীগণ গত দুই দিন ধরিয়া আমি যে মানসিক যন্ত্রণা অনুভব করিতেছি, তাহা বলিয়া বুঝাইতে পারিব না। ভোর সাড়ে তিনটার সময় আমি তোমাদের উদ্দেশ্যে এই আবেদনখানি লিখিতেছি। দুই ঘণ্টা ধরিয়া ধ্যান ও ভগবৎ-আরাধনার পর এখন আমার মন সম্পূর্ণ শান্ত হইয়াছে।

যে পর্যান্ত না বোম্বায়ের হিন্দু-মুসলমান জনসাধারণ তথাকার পার্শী, ইহুদী ও খৃষ্টানদের সহিত বিবাদ করিতে ক্ষান্ত না হয়, যে পর্যান্ত না অসহযোগীরা সহযোগীদের সহিত সখ্যতা স্থাপন করেন, সে পর্যান্ত আমি পানীয় জল ছাড়া আর কোন প্রকার আহার্য্য গ্রহণ করিব না। গত দুই দিনে আমি তোমাদের যে স্বরাজের নমুনা দেখিয়াছি, তাহাতে আমাকে অতিষ্ঠ করিয়া তুলিয়াছে। হিন্দু-মুসলমান একতা মুষ্টিমেয় পার্শী, খৃষ্টান ও ইহুদীর পক্ষে বিপদের কারণ হইয়া উঠিয়াছে। অসহযোগীদের অত্যাচার-বর্জ্জনের জের সহযোগীদের অত্যাচার অপেক্ষাও অধিক তীব্র হইয়া উঠিয়াছে। আমরা মুখে অত্যাচার-বর্জ্জনের কথা বলি, কিন্তু যাহাদের সহিত আমাদের মতের বিরোধ ঘটে তাহাদিগকে আমরা ভীতি-প্রদর্শন করিতে ছাড়ি না। আমরা এইরূপে ভগবানের ব্যবস্থা অমান্য করিয়া থাকি। ভগবান্ আমাদের সকলের জন্যই—একমাত্র। যিনি কোরাণে, যিনি বাইবেলে, জেন্দাভেস্তায়,—তিনিই গীতায়। ভগবান্ সত্যের ও প্রেমের! আমার এই বিশ্বাসটিকে ছাড়িয়া আমি বাঁচিয়া থাকিতে চাহি না, সেরূপ জীবনে আমার প্রয়োজন নাই।

কোন ইংরেজ অথবা অন্য সম্প্রদায়ের লোককে ঘৃণা করিতে... আমি ইংরেজদের অনেক অনুষ্ঠানের বিরুদ্ধে লিখিয়াছি ও বক্তৃতা দিয়াছি, তাঁহারা ভারতে যে সব প্রতিষ্ঠানের পত্তন করিয়াছেন, আমি প্রধানতঃ তাহারই বিরোধী। যদি আমি আরও কিছুদিন বাঁচিয়া থাকি, তাহা হইলে জীবনের সে কয়টা দিনও আমি সেই কাজই করিব। কিন্তু আমি ইংরেজদের প্রথা-বিশেষের দোষই দিতেছি, ইংরেজদের দোষ দিতেছি না, আমার দেশবাসীরা যেন এ কথাটা ভাল করিয়া বুঝেন; এ সম্বন্ধে কোন ভ্রান্ত ধারণা পোষণ না করেন। আমার ধর্ম্ম বলিতেছে, আমি নিজেকে যেমন ভালবাসি, ইংরেজকেও যেন সেই রকমই ভালবাসি। এই সঙ্গীন সময়ে আমি যদি সে কথাটা সপ্রমাণ করিবার চেষ্টা না করি, তাহা হইলে ভগবান্‌কে আমার অস্বীকার করা হইবে।

আর, পার্শীদের সম্বন্ধেও আমার সেই কথা। হিন্দু-মুসলমান জনসাধারণ যদি তাঁহাদিগকে রক্ষা না করেন, তাঁহাদের সম্মান অক্ষুণ্ণ ও জীবন নিরাপদ যদি না রাখেন, তাহা হইলে তাঁহারা নিজেদিগকে স্বাধীনতার অযোগ্য বলিয়া সপ্রমাণ করিবেন। হিন্দু-মুসলমান-সমাজ সংপ্রতি তাঁহাদের উদারতা ও অন্যান্যদের প্রতি বন্ধুত্বের পরিচয় দিয়াছেন। মুসলমানরা নিজেরা খেলাফৎ-ভাণ্ডারে যাহা দিয়াছেন, পার্শীরা তাঁহাদের সংখ্যার তুলনায় তাহা অপেক্ষা অনেক অধিক দিয়াছেন। এজন্য পার্শীদের প্রতি মুসলমান সমাজেরই অধিক দৃষ্টি পতিত হইয়াছে। ১৭ই নবেম্বর তারিখে পার্শীদের ভিতর দিয়া যাইবার সময় তাঁহাদের স্ত্রী-পুরুষ সকলের যে করুণ শুষ্ক মুখ দেখিয়াছি, তাহা আর দ্বিতীয়বার দেখিতে আমি সাহস করি না। যদি বোম্বাইয়ের হিন্দু-মুসলমান জনসাধারণ নিজেরা স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া এ ঘটনার জন্য পূর্ণ অনুতাপ প্রকাশ না করেন, তাহা হইলে এণ্ডরুজ পূর্ব্ব আফ্রিকা হইতে ফিরিয়া আসিলে আমি কিরূপে তাঁহার মুখের দিকে তাকাইব? যে সব খৃষ্টানের জন্মভূমি ভারতবর্ষ, যাহাদিগকে আমরা [illegible]র মত রক্ষা করিতে ধর্ম্মতঃ বাধ্য, তাহাদের প্রতি এরূপ ব্যব- [illegible] কোন প্রকার ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা না করিলে চলিবে কেন? [illegible] আত্মরক্ষার জন্য অথবা প্রতিশোধ লইবার উদ্দেশ্যে কি কি করিয়াছেন, সে বিষয়ে দৃষ্টি দিলে আমাদের চলিবে না। প্রধানতঃ আমার চেষ্টার ফলে যে শক্তি জাগরিত হইয়াছে, তাহার দ্বারা এই যে সব মুষ্টিমেয় নর-নারী ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছেন, আমাকে তাঁহাদের জন্য যথাসম্ভব পর্য্যাপ্ত পরিমাণ ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা করিতেই হইবে। এ কথা আপনারা স্পষ্টই বুঝিতে পারিতেছেন। আমি প্রত্যেক হিন্দু-মুসলমানকেও আমার অনুসরণ করিতে বলিতেছি। তবে আমি কাহাকেও উপবাস করিতে বলি না। ভগবৎ-আরাধনার জন্য ও নিজের ভিতরে অনুভূত আগ্রহের নিমিত্ত যদি উপবাস করা যায়, তবেই উপবাস আমাদের উপকারে আসে। আমি তাঁহাদের আরও অনুরোধ করি যে, তাঁহারা যেন নিজ নিজ

গৃহপ্রান্তে একান্তে বসিয়া বোম্বায়ের এই কাণ্ডের নিমিত্ত ভগবানের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করেন। তাঁহারা যেন হৃদয়ের অন্তস্থল হইতে উৎপীড়িত সম্প্রদায়গুলির প্রতি বন্ধুত্ব দেখান।

আমার সহকর্ম্মীদিগকে আমি বলি যে, তাঁহারা যেন আমার প্রতি সহানুভূতি দেখাইবার চেষ্টায় বৃথা সময় নষ্ট না করেন। সহানুভূতি দেখাইবার প্রয়োজন নাই. আমি তাহার যোগ্যও নহি। তাঁহাদিগের নিকট আমার এখন এই মাত্র অনুরোধ যে, এই উচ্ছৃঙ্খল জনমণ্ডলীর উপর তাঁহারা তাঁহাদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য অবিরাম চেষ্টা করুন। ভীষণ হইলেও এ বিলাটটা সত্য। এখন কপট ব্যবহারের বা আড়ম্বরের সময় নয়। দেশের জন্য কর্ম্মক্ষেত্রে অগ্রসর হইবার পূর্ব্বে আমাদিগকে এখন আমাদের হৃদয়ের ময়লা পরিষ্কার করিয়া ফেলিতে হইবে।

আমি আমার মুসলমান ভ্রাতাদিগকে একটি কথা বেশী করিয়া বলিতে চাই: আমি খেলাফৎ আন্দোলনকে পবিত্র বলিয়া মনে করি। হিন্দু-মুসলমানের একতা সাধিত না হইলে ভারত ভবিষ্যতে স্বাধীন থাকিতেই পারে না. এই জন্যই আমি এই দু[illegible] একতার জন্য চেষ্টা করিয়াছি। আমরা যদি পরস্পর[illegible] (হিন্দু-মুসলমানের) স্বাভাবিক শত্রু বলিয়া মনে করি, তাহা[illegible] আমরা উভয় সম্প্রদায়ই ভগবানকে অস্বীকার করিব। আলি-ভ্রাতাদিগকে সত্যে প্রতিষ্ঠিত ও ভগবৎবিশ্বাসী দেখিয়াই আমি তাঁহাদের ক্রোড়ে ঝাঁপাইয়া পড়িয়াছিলাম।

গত দুই দিনের নরহত্যার ব্যাপারের জন্য মুসলমানরাই অধিক দায়ী বলিয়া আমি জানিয়াছি। এ সংবাদে আমি গুরুতর মনোবেদনা পাইয়াছি। আমি এখন প্রত্যেক মুসলমান কর্ম্মীকে পূর্ণ উদ্যমে উদ্যোগী হইতে বলি। তাহার ধর্ম্ম তাঁহাকে যে কর্ত্তব্যের কথা বলে, তাহার মর্ম্ম তিনি যেন বুঝিবার চেষ্টা করেন এবং তাহা বুঝিয়া এই নরহত্যার ব্যাপার বন্ধ করিয়া দেন।

যে কোন প্রকারে ঠিক কাজ করিবার জন্য ভগবান্ যেন আমাদের প্রত্যেককে সৎবুদ্ধি ও সাহস প্রদান করেন।

তোমাদের সেবক,

এম, কে, গন্ধী।

১৭ই নবেম্বরের বোম্বাই হাঙ্গামার অব্যবহিত পর লালা লজপৎ রায় বোম্বাই গমন করেন। ২৩শে নবেম্বর তারিখ সুরাটে নিখিল ভারত কংগ্রেসের কার্য্যকরী-সমিতির অধিবেশন বসিবার কথা ছিল। কিন্তু হাঙ্গামার জন্য মহাত্মা গন্ধী বোম্বাই ত্যাগ করিতে না পারায় কার্য্যকরী সমিতির অধিবেশন বোম্বাইতে বসে। লালাজী এই অধিবেশনে যোগ-দান করেন,—

বোম্বাই হইতে ফিরিয়া আসিয়া লালাজী "ট্রিবিউন" পত্রে বোম্বাই হাঙ্গামা সম্পর্কে স্বীয় মত প্রকাশ করেন। লালাজীর মতামত তাঁহার দেশবাসীর বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। পাঠকবর্গের অবগতির জন্য আমরা তাঁহার মর্ম্মানুবাদ প্রকাশ করিলাম।

বোম্বাইয়ে কি শিখিলাম।

"যে দিন যে বোম্বাইয়ে গিয়াছিলাম, তাহাতে যেমন আনন্দ লাভ করিয়াছি, মনে তেমনই ব্যথা পাইয়াছি। গত ১৭ই নবেম্বর ও তাহার পরবর্ত্তী কয় দিনে যে হাঙ্গামা হইয়াছে এবং তাহার ফলে যে ধনপ্রাণ-নাশ ঘটিয়াছে, তাহাতে আমি বিশেষ বেদনানুভব করিয়াছি। ধনপ্রাণনাশই আমার বেদনার একমাত্র কারণ নহে; বিশেষ কারণ, ইহার ফলে সহযোগিতাবর্জ্জনানুষ্ঠানের সাফল্যে বিলম্ব ঘটিতে পারে। জড়প্রায় জগৎকে উজ্জীবিত করায় সর্ব্বত্রই বিপদের সম্ভাবনা থাকে। কিন্তু আমরা অসহযোগীরা আমাদের দায়িত্বের বিষয় বিস্মৃত হই নাই—আমরা কেবল যে জাতির দেহে নবজীবন-সঞ্চারের চেষ্টা করিয়াছি, তাহাই নহে, পরন্তু

নবজীবনে জাগ্রত জাতিকে সংযত রাখিবার প্রয়াসও করিয়াছি। বোম্বাইয়ে আমরা আমাদের সেই প্রভুত্ব কয় দিনের জন্য হারাইয়াছিলাম—তাই অসংযমের বিকাশ হইয়াছিল। যদি বোম্বাইয়ে হাঙ্গামা আরও দীর্ঘকালস্থায়ী হইত অথবা যদি সরকারের চেষ্টা ব্যতীত তাহা দলিত করা অসম্ভব হইত, তবে আমার হতাশার সীমা থাকিত না। কিন্তু বোম্বাইয়ের এই হাঙ্গামায় আমরা এক পক্ষে যেমন আমাদের শক্তির পরিমাপ করিতে পারিয়াছি, অপর পক্ষে তেমনই আমাদের দৌর্ব্বল্যের পরিমাণ বুঝিতে পারিয়াছি। বোম্বাইয়ের অসহযোগীরা এই হাঙ্গামার সময় যে ভাবে কাজ করিয়াছেন, তাহাতে আমাদের কর্ম্মীদিগের স্বার্থত্যাগের ও পদ্ধতিভাবে কাজ করিবার ক্ষমতা আমার নিকট সপ্রকাশ হইয়াছে। কংগ্রেসের ও খেলাফতের কর্ম্মীরা যে ভাবে এই বিপদে কাজ করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহাদের ব্যবহারে শ্রদ্ধায় মস্তক নত করিতে হয়। তাঁহারা উচ্ছৃঙ্খল জনতার মধ্যে যাইয়া আপনাদের জীবন বিপন্ন করিয়া জনতাকে সংযত করিতে চেষ্টা করিয়াছেন, হাসিমুখে ক্রোধোন্মত্ত লোকের সম্মুখীন হইয়াছেন, মিষ্ট কথায় রুষ্ট লোককে সন্তুষ্ট করিয়াছেন, দুর্ব্বল ও ব্যক্তিদিগকে আবশ্যক সাহায্য প্রদান করিয়াছেন এবং স্বেচ্ছাকৃত পালনে জীবন তুচ্ছ জ্ঞান করিয়াছেন। তাঁহারা শান্তি ও শৃঙ্খ[illegible] জন্য দিবারাত্রি পরিশ্রম করিয়াছেন। কয়জনের মাথা ভাঙ্গিয়াছে, প্রায় সকলেই আহত হইয়াছে, কয়জন জীবন হারাইয়াছেন। একজন পার্শী ভদ্রলোক আমাকে বলিয়াছেন, এই অসহযোগীরা না আসিলে অনেক পার্শীর গৃহ লুণ্ঠিত হইত এবং সংখ্যায় অল্প পার্শীরা উন্মত্ত জনতার হস্তে নিহত হইত। পাঞ্জাবের পক্ষ হইতে গর্ব্ব করিয়া এই প্রসঙ্গে পণ্ডিত নেকীরাম শর্ম্মার কৃতকার্য্যের উল্লেখ করিতে পারা যায়। তিনি পুনঃ পুনঃ আপনার জীবন বিপন্ন করিয়াছিলেন। একটি চারিতল গৃহ অগ্নিতে দগ্ধ হইতেছিল। তিনি তাহাতে প্রবেশ করিয়া সেই অনলশিখার মধ্য হইতে বিপন্ন ব্যক্তিদিগের উদ্ধার-সাধন করিয়াছিলেন। বোম্বাইয়ের বহুলোক

পণ্ডিত নেকীরামেরই মত কাজ করিয়াছিলেন। আর এই পণ্ডিত নেকীরাম ১৫৩ এ ধারায় অভিযুক্ত হইয়া সাধারণ হীন অপরাধীর মত ব্যবহৃত হইয়াছেন। যে স্থলে সকলেই এমন ভাবে কাজ করিয়াছেন, সে স্থলে বিশেষ করিয়া কাহারও নাম উল্লেখ করা অসঙ্গত। কিন্তু শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু ভারতীয় মহিলাচরিত্রের যে আদর্শ দেখাইয়াছেন, তাহার উল্লেখ না করিয়া থাকা যায় না। এই কবি সহসা কর্ম্মীতে পরিণতিলাভ করিয়াছিলেন। তিনি বিপদ তুচ্ছ করিয়া হাঙ্গামার স্থলে গিয়াছিলেন—সকলকে শান্ত করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, তিনিও আহত হইয়াছিলেন; কিন্তু লোকের প্রতি তাঁহার এমনই প্রগাঢ় ভালবাসা যে, তিনি বলেন, কেহ ইচ্ছা করিয়া তাঁহাকে আঘাত করে নাই। তাঁহার কথা স্মরণ করিয়া আমার মনে হয়, যে জাতির মধ্যে সরোজিনীর উদ্ভব, সে জাতির উন্নতি সম্বন্ধে আর সন্দেহ থাকিতে পারে না।

বোম্বাইয়ের হাঙ্গামায় অন্ধকারে যে আলোক দেখিয়াছি, তাহার কথা বলিলাম। আমার বিশ্বাস দৃঢ় হইয়াছে যে, আমরা জনগণকে আয়ত্তাধী[illegible]থিতে পারি। সে বিশ্বাস বিচলিত হইয়াছিল বটে, কিন্তু সে [illegible] নাই। সময় সময় বিশৃঙ্খলা ঘটিবে, কিন্তু এই যে ভিন্ন ভিন্ন স[illegible]দায় মনোমালিন্য দূর করিয়া সদ্ভাবে সম্প্রীতি স্থাপন করিয়াছে ইহাতে কি ভবিষ্যতে শুভ সূচনাই হয় নাই? আমার বিশ্বাস, ইহাতে প্রতিপন্ন হইয়াছে, আমাদের মধ্যে যদি কলহ হয়, তবে আমরাই তাহা মিটাইতে পারিব, সে জন্য বাহিরের লোকের সাহায্যের প্রয়োজন হইবে না।

আমি যখন বোম্বাইয়ে গিয়াছিলাম, তখনকার অপেক্ষা আজ সংযত, কিন্তু আনন্দিত। শিখ ভ্রাতৃগণের কার্য্যে আমার আনন্দ আরও বর্দ্ধিত হইয়াছে। অনেকে মনে করিয়াছিলেন, যোদ্ধার জাতি বলিয়া তাঁহারা সহজে অহিংসনীতি গ্রহণ করিতে পারিবেন না। লোক মনে করিয়াছিল, তাঁহারা মুক্তিলাভ চেষ্টায় পশ্চাৎপদ রহিবেন। কিন্তু তাঁহারা প্রতিপন্ন

করিয়াছেন, সে বিশ্বাস সত্য নহে, হয়ত প্রথমে তাঁহারা কিছু পশ্চাতে ছিলেন, কিন্তু এখন আর তাহা বলা যায় না—তাঁহারা এখন আর সকলের সহিতই যাত্রা করিতেছেন। সঙ্কটকালে তাঁহারা ইহার পূর্ণ পরিচয় দিয়াছেন। আর নানকানা সাহেবে, আজনালায় ও অমৃতসরে তাঁহারা অহিংসার যে পরিচয় দিয়াছেন, তাহাও সর্ব্বজনবিদিত। তাঁহারা শিখ-গুরুদিগের বংশধরের উপযুক্ত কাজই করিয়াছেন এবং স্বার্থত্যাগের, সাহসের এবং উত্তেজনার সময়েও যে সংযমের পরিচয় দিয়াছেন, তাহা অতুলনীয়।

একটি কথা বলিয়া শেষ করিব। পরীক্ষাকাল সমাগত। এ সময় সকলেরই কর্ত্তব্য—যথাসাধ্য কাজ করা। কেহ যেন বৃথা গুজবে বিশ্বাস না করেন, সেরূপ গুজব রটনা না করেন—সকলে যেন বিশেষ বিবেচনা করিয়া কথায় বিশ্বাস করেন, কারণ, তাহা না করিলে অনেক অনিষ্ট হইতে পারে—রক্তপাত হইতে পারে। সকলে আপনার ও বন্ধুজনের সর্ব্ববিধ বিপদের জন্যও প্রস্তুত হউন। কখন্ কি হয় বলা যায় না।"

১৭ই নবেম্বরের হরতালের অদ্ভুত কৃতকার্য্যতা দেখিয়া এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান সমাজ ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়া উঠিলেন। এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান কাগজগুলা দলিত ফণিনীবৎ গর্জ্জিয়া উঠিল—অসহযোগ আন্দোলনকে সমূলে বিধ্বংস করিবার জন্য অবিরত গরল উদ্গারণ করিতে লাগিল। সরকার ইতিপূর্ব্বেই প্রচণ্ড দণ্ডনীতির প্রবর্ত্তন করেন। করাচীর বিচারে আলি-ভাই ও ডাক্তার কিচলু প্রভৃতি ৬ জন নেতা ২ বৎসরের সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। ইহার পর ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের শত শত খেলাফৎ ও কংগ্রেস কর্ম্মী স্বেচ্ছায় হাসিমুখে জেলে গমন করেন। ১৭ই নবেম্বরের হরতালের পর সরকারের দলন-নীতি আরও রুদ্রমূর্ত্তি ধারণ করে। সরকার অসহযোগ আন্দোলনকে সমূলে বিনাশ করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হন। কংগ্রেস ও খেলাফতের স্বেচ্ছাসেবক সমিতিগুলিকে বে-আইনী বলিয়া ঘোষণা করা হইল, নানাস্থানে সভাসমিতি বন্ধের আদেশ জারী

হইল। যে কয়জন প্রধান প্রধান নেতা গ্রেপ্তার হইতে বাকী ছিলেন তাঁহারাও অচিরে গ্রেপ্তার হইলেন। লালা লজপৎ রায় ভারতের অন্যতম প্রধান নেতা, সরকারের দৃষ্টি অচিরেই তাঁহার উপর পতিত হইল।

৩রা ডিসেম্বর তারিখ লালাজী তাঁহার তিন জন সহকর্ম্মীর সহিত গ্রেপ্তার হইলেন। এই সহকর্ম্মিগণ তিন জনেই পাঞ্জাবের অন্যতম জননায়ক। ইঁহাদের নাম শ্রীযুত কে, সন্তানম্, ডাক্তার গোপীচাঁদ ও মালীকলাল খাঁ। ৩রা ডিসেম্বর তারিখ ইঁহারা পাঞ্জাব প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটীর এক বিশেষ সভা করিতেছিলেন। লাহোরে পূর্ব্বেই রাজদ্রোহ সভাবন্ধের আইন জারী করা হইয়াছিল। এই আইনের চতুর্থ ধারা অনুসারে লালাজী ও অন্যান্য নেতৃবর্গকে গ্রেপ্তার করা হয়।

৩রা তারিখে কংগ্রেস কমিটীর সভা বসে, ২রা তারিখ সভার পূর্ব্বের দিন, লাহোরের ডেপুটী কমিশনার মিঃ ফেরার কংগ্রেস কমিটীর সম্পাদক রূপে শ্রীযুত টি, সি, কাপূরকে নিম্নলিখিত মর্ম্মে এক পত্র লিখেন—"মহাশয়, আমি জানিতে পারিলাম যে, আগামী ৩রা তারিখ বেলা ২টার সময় [illegible] সালিম প্রাসাদে কংগ্রেস কমিটীর এক সভা বসাইবার প্রস্তাব করিয়াছেন। এই সভা রাজদ্রোহসভা বন্ধ আইন অনুসারে জনসাধারণের সভা বলিয়া গণ্য, সুতরাং ঐ আইনের চতুর্থ ধারা অনুসারে আপনারা আমার অনুমতি লইতে বাধ্য। কিন্তু আমি আপনাদের নিকট হইতে এরূপ কোন আবেদন বা নোটিশ পাই নাই।

আপনাদের সভা বন্ধ করিয়া দিব কি না,এ বিষয়ে স্থির-সিদ্ধান্ত করিবার পূর্ব্বে, আপনার নিকট হইতে আপনাদের আলোচ্য বিষয়ের একটা পাকাপাকি বিবরণ জানিতে পারিলে সুখী হইব। এ সম্বন্ধে আপনার নিকট বক্তব্য এই যে, আপনার বর্ণিত বিষয়গুলি বাদে আপনারা অন্য কোন নূতন বিষয় আলোচনা করিতে পারিবেন না, এই মর্ম্মে আমাকে প্রতিশ্রুতি দিতে হইবে।

পত্র পাওয়ামাত্র আমার লিখিত বিষয়টি বিবেচনা করিয়া যথাসম্ভব উত্তর প্রদান করিলে বাধিত হইব। ইতি—

(স্বাক্ষর) এম. এল. ফেরার.

ডেপুটী কমিশনার, লাহোর।"

এই চিঠির উত্তরে পঞ্জাব প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটীর সাধারণ সম্পাদক শ্রীযুত সন্থানম্ নিম্নলিখিত উত্তর প্রদান করেন :—

"আপনার ২রা ডিসেম্বর তারিখের ৪৯১৫ নম্বরের চিঠি আমার হস্তগত হইয়াছে। আমিই পাঞ্জাব প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটীর সাধারণ সম্পাদক। আমি আপনার পত্রের নিম্নলিখিত উত্তর প্রদান করিতেছি :—

রাজদ্রোহ সভাবন্ধ আইনের ৪ ধারা অনুসারে 'জনসাধারণের সভা' করিতে হইলে জেলা-ম্যাজিষ্ট্রেট বা পুলিশ-কমিশনারের নিকট নোটিশ দেওয়া দরকার। এক্ষণে জনসাধারণের সভা কাহাকে বলে? উপরি-উক্ত আইনের ৩ ধারার ১ শাখা অনুসারে 'জনসাধারণের সভার' নিম্ন-বর্ণিত সংজ্ঞা দেওয়া হইয়াছে—৩ (১) এই আইনে 'জনসাধারণের সভা' [illegible] এরূপ একটি সভা বুঝায় যাহাতে জনসাধারণ বা জনসাধারণের [illegible] সম্প্রদায় বা অংশবিশেষ স্বাধীনভাবে ও স্বেচ্ছামতে উপস্থিত [illegible] পারিবে।

সুতরাং এই ৩ ধারা মতে জনসাধারণের সভার যে সংজ্ঞা দেওয়া হইয়াছে, সে অনুসারে আগামী ৩রা তারিখ বেলা ২ ঘটিকার সময় পাঞ্জাব প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটীর যে সভা বসিবে, তাহাকে জনসাধারণের সভা বলা চলে না। এই সভায় কেবলমাত্র কংগ্রেস কমিটীর সদস্যগণই উপস্থিত থাকিতে পারিবেন। এই সদস্যগণ পাঞ্জাব প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটীর নিয়মকানুন অনুসারে বিভিন্ন জেলা কংগ্রেস কমিটীগুলি কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। এই সদস্যগণের প্রত্যেকের নিকট যথারীতি নোটিশ দেওয়া হইয়াছে। যথানিয়মে নির্ব্বাচিত ও নোটিশ-প্রাপ্ত সদস্যগণ ব্যতীত অপর

কেহই এই সভায় উপস্থিত থাকিতে পারিবেন না। সুতরাং ইহা দ্বারা স্পষ্ট প্রমাণ হইতেছে যে,কংগ্রেস কমিটীর এই সভা কোন ক্রমেই জনসাধারণের সভা নহে; অতএব আপনার নিকট বা পুলিশের নিকট কোনরূপ আবেদন ও নোটিশ দেওয়া আবশ্যক করে না।

সভার নোটিশে আলোচ্য বিষয়ের বিবরণী দেওয়া হইয়াছে, আমি এ বিষয়ে আপনাকে আর অধিক খবর জানাইতে পারি না। ইতি—

(স্বাক্ষর) কে, সন্তানম্।
সাধারণ সম্পাদক,
পাঞ্জাব প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটী।"

২রা ডিসেম্বর এরূপ পত্র লেখালেখি হয়। ৩রা ডিসেম্বর যথাসময়ে কংগ্রেস কমিটীর সভা বসে। পূর্ব্বদিন ডেপুটী কমিশনারের সহিত যে পত্র-ব্যবহার হয়, তাহা দেখিয়া লালাজী স্পষ্ট বুঝিয়াছিলেন, হয় ত সভাতেই তাঁহাদিগকে গ্রেপ্তার করা হইবে—বিশেষতঃ তাঁহাকে,—কারণ, তিনি প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটীর সভাপতি। কিন্তু তাই বলিয়া তাঁহার পশ্চাৎপদ হওয়া চলে না। তিনি পশ্চাৎপদ হইবার লোকও নহেন। সুতরাং তিনি গ্রেপ্তারের জন্য এক প্রকার প্রস্তুত হইয়াই সভায় আগমন করেন। সভার কার্য্য যথাসময়ে আরম্ভ হইল, লালাজী সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন। সভার কার্য্য চলিতেছে, এমন সময় এক জন স্বেচ্ছাসেবক ছুটিয়া আসিয়া লালাজীকে জানাইল যে, ২ জন দারোগা ও ৮ জন কনেষ্টবল নীচে দণ্ডায়মান আছে। তাহারা উপরে আসিবার অনুমতি চায়। লালাজী বলিলেন, "তাহাদিগকে অবিলম্বে লইয়া আইস।" পুলিশ উপরে যাইবার অনুমতি পাইয়া শ্রীযুত সন্তানম্‌কে ডাকিয়া পাঠাইল। সন্তানম্ নীচে নামিয়া আসিয়া দেখিলেন,—মেজর ফেরার ও কর্ণেল গ্রেগ্সন বহু সশস্ত্র পুলিশ লইয়া দাঁড়াইয়া আছেন। তাঁহাকে ডাকিবার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, মেজর ফেরার তাঁহার হাতে

একখানা লিখিত আদেশ প্রদান করিলেন। সন্তানম্ উহা লইয়া উপর তলায় গেলেন এবং আদেশপত্রখানা সভার মধ্যে পড়িয়া শুনাইলেন। তখন লালা লজপৎ রায় বলিলেন, যাঁহারা চলিয়া যাইতে চাহেন, তাঁহারা যাইতে পারেন। কিন্তু জনপ্রাণীও আসন হইতে নড়িলেন না। সভা বসিবার পূর্ব্বেই লালাজী কোন কোন ব্যক্তিকে সভা হইতে প্রস্থান করিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন, কেননা, তিনি আশঙ্কা করিয়াছিলেন, সভার সমস্তই গ্রেপ্তার হইবেন এবং তাহা হইলে কংগ্রেসের কার্য্য চালাইবার কোন নেতা আর থাকেন না। তিনি লালা হংসরাজ, সৈয়দ আলা উল্লা সাহ এবং আবদুর রসিদকে বিশেষ করিয়া অনুরোধ করেন। কিন্তু তাঁহারা সকলেই যাইতে অস্বীকার করেন, বলেন,—"যদি গ্রেপ্তার হই, তবে একযোগে গ্রেপ্তার হওয়াই মঙ্গল।"

যাহা হউক, কিয়ৎকাল পরেই মেজর ফেরার, জেলা-মাজিষ্ট্রেট ও কর্ণেল গ্রেগসন পুলিশের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট সভাগৃহে প্রবেশ করিলেন। জেলা-মাজিষ্ট্রেট বলিলেন, "আমি এ সভাকে অবৈধজনতা বলিয়া ঘোষণা করিতেছি এবং আদেশ করিতেছি, এ সভা ভঙ্গ হউক।" তখন সভাপতির আসন হইতে লজপৎ রায় বলিলেন,—"আমার বিবেচনায় এ সভা [illegible] বৈধ, এবং সভাপতিরূপে আমি এ সভা ভঙ্গ করিতে অস্বীকার করিতেছি।" তখন মেজর ফেরার পণ্ডিত রামভজ দত্ত চৌধুরীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ইনি কে?" পণ্ডিতজী বলিলেন, "লালা লজপৎ রায়।" লালা লজপৎ রায় নিজে বলিলেন, "আমি লজপৎ রায়।" তখন মেজর ফেরার বলিলেন, "আমি আপনাকে গ্রেপ্তার করিলাম।" লালাজী তৎক্ষণাৎ হাসিমুখে আত্মসমর্পণ করিলেন। জেলা-মাজিষ্ট্রেট তখন শ্রীযুত সন্তানম্ ও ডাক্তার গোপীচাঁদকে ডাকিলেন এবং গ্রেপ্তার করিলেন। নীচে একখানা মোটর অপেক্ষা করিতেছিল, তিন জনকেই মোটরে লইয়া যাওয়া হইল।

এ দিকে কিন্তু সভার কার্য্য চলিতে লাগিল। পণ্ডিত রামভজ দত্ত

চৌধুরী সভাপতির স্থান পূরণ করিলেন। ধৃত নেতাগণকে অভিনন্দিত করিয়া একটি প্রস্তাব গৃহীত হইল। তখন পুলিশ-সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট বলিলেন, "এ সভা অবৈধ জনতা, সভাভঙ্গ হউক।" পণ্ডিত রামভজ দত্ত চৌধুরী তাঁহার প্রতিবাদ করিলেন, বলিলেন, জোর করিয়া সরাইয়া না না দিলে তাঁহারা সরিবেন না। পণ্ডিতজী কারণ দেখাইতে যাইতেছিলেন, অমনি পুলিশ-সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট অধারভাবে বলিলেন, তিনি কারণ শুনিতে চাহেন না। এই বলিয়া পুলিশকে জোর করিয়া সভা ভাঙ্গিয়া দিতে আদেশ করিলেন। তখন সভার সদস্যগণ ধীরে ধীরে নামিয়া গেলেন। সকলে নীচে নামিলে পুলিশ মালীক লালা খাঁকেও গ্রেপ্তার করিল। মালীক সাহেব বলিলেন, "আমি এই সুযোগেরই প্রতীক্ষা করিতেছিলাম।"

লালা লজপৎ রায়, সন্তানম্ ও গোপীচাঁদকে লইয়া মোটরখানা ইতিপূর্ব্বেই চলিয়া গিয়াছে। মোটর ছাড়িবার সময় লালাজী বলিলেন, "বন্ধুগণ, নমস্কার।" মুহূর্ত্তের মধ্যে সহস্র সহস্র লোক সমবেত হইল। তাঁহারা "বন্দে মাতরম" "গান্ধী মহারাজকি জয়" "লালা লজপৎ রায় কি জয়" প্রভৃতি রবে গগন পবন প্রতিধ্বনিত করিল। লালাজী উভয় পার্শ্বের জনগণকে নমস্কার করিতে করিতে চলিলেন। তাঁহাদের মোটর টেলিগ্রাফ আফিসের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল, তাঁহাদিগকে টেলিগ্রাফ আফিসের ভিতর রাখা হইল। পাঠকের হয়ত স্মরণ থাকিতে পারে, পাঞ্জাবে সামরিক আইনের সময় যখন লালা হরকিষণ লাল প্রভৃতি নেতাগণকে ধরা হয়, তখন তাঁহাদিগকেও প্রথমে এই টেলিগ্রাফ আফিসেই আনা হইয়াছিল।

লালা লজপৎ রায় ও অন্যান্য নেতাদিগকে প্রায় দু ঘণ্টাকাল টেলিগ্রাফ আফিসে রাখা হয়। তাঁহাদিগকে দেখিবার জন্য সহস্র সহস্র লোক টেলিগ্রাফ আফিসের সম্মুখে সমবেত হন। লালাজী জনতা লক্ষ্য করিয়া লালা রঘুনাথ সাহয়ের মারফতে জনগণের নিকট তাঁহার বাণী প্রেরণ

করেন। তিনি জনগণকে গৃহে যাইতে অনুরোধ করেন এবং অহিংস অসহযোগ চালাইবার জন্য বলেন। টেলিগ্রাফ আফিসের ভিতরেই লালাজী ও অপর তিন জন নেতাকে অতিরিক্ত জেলা-ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ ফিওফের সমক্ষে হাজির করান হয়। তাঁহাদিগের বিরুদ্ধে দণ্ডবিধির ১৪৫ ধারা মতে অবৈধ জনতা করার অভিযোগ আনা হয়। তাঁহাদিগকে জামীন দিয়া খালাস হইতে বলা হয়। কিন্তু তাঁহারা জামীন দিতে অস্বীকার করেন। জনগণের বিপুল জয়ধ্বনির মধ্যে তাঁহাদিগকে সেন্‌ট্রাল জেলে লইয়া যাওয়া হয়। যাত্রা করিবার পূর্ব্বে লালাজী তাঁহার কয়েক জন বন্ধুকে বলেন, তাঁহার আহার্য্য যেন গৃহ হইতে পাঠান না হয়। তিনি জেলের আহার্য্যই খাইবেন।

লালাজীকে গ্রেপ্তার করিবার সময় পুলিশ অদ্ভুত সতর্কতা গ্রহণ করে। সাধারণ ও সশস্ত্র পুলিশ ত আছেই ; তা ছাড়া বহু মিলিটারী সৈন্য আনা হয় এবং নানাস্থানে মোতায়েন রাখা হয়। এতদ্ব্যতীত লালাজী টেলিগ্রাফ আফিসের মধ্যে আনীত হইলে, আফিসের প্রাঙ্গণে দুইটি মেসিন কামান সাজাইয়া রাখা হয়।

গ্রেপ্তার হইবার পর লালা লজপৎ রায় যে বাণী প্রচার করেন, তাহার মর্ম্মানুবাদ নিম্নে প্রদান করিলাম ;—

লালা লজপৎ রায়ের বাণী।

(দেশবাসীর প্রতি)

স্বদেশবাসিগণ—অদ্য বেলা দুই ঘটিকার সময় আমারই পরামর্শানুসারে প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটীর অধিবেশন বসে। আইনমতে এই অধিবেশনকে কোন প্রকারেই জনসাধারণের সভা বলা চলে না। এই সভার উদ্দেশ্য ছিল, বর্ত্তমান সঙ্কটকালে দেশে কিরূপে শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষার ব্যবস্থা করা যাইতে পারে, সে বিষয়ে উপায় নির্দ্ধারণ করা। ডেপুটী কমিশনার রাজদ্রোহ সভা বন্ধ আইন অনুসারে এই সভা করিতে নিষেধ করিয়াছিলেন।

ইতিমধ্যে মহাত্মা গন্ধীও আমাকে উপদেশ দিয়াছিলেন, আমি যেন এমন কাজ হইতে যথাসম্ভব বিরত থাকি, যদ্দ্বারা আমি গ্রেপ্তার হইতে পারি। কিন্তু এই সভার গুরুত্ব অত্যন্ত অধিক। ডেপুটী কমিশনারের আদেশ সম্পূর্ণ বে-আইনী—এরূপ আদেশ করিবার তাঁহার অধিকার নাই। ইহা দেখিয়া আমার মনে হয়, পঞ্জাব কর্ত্তৃপক্ষ আইনের প্রতি বিশেষ গ্রাহ্য করেন না, এই অবস্থায় আমি এই সভা ক্ষান্ত রাখিতে পারি না, কিংবা সভায় নিজে অনুপস্থিত থাকিতে পারি না। এরূপ করা আমার বিবেকবিরুদ্ধ। এই জন্যই আমি সভায় উপস্থিত হইয়া নিজেকে ধরা দিতে সঙ্কল্প করিয়াছিলাম। আমার বিশ্বাস, আমার অবস্থায় পতিত হইলে মহাত্মা গন্ধীও এরূপ করিতে বাধ্য হইতেন। শেষে যে অবস্থা দাঁড়াইয়াছে, তাহা জানিতে পারিলে মহাত্মাজী বোধ হয় আমাকে ঐরূপ উপদেশ দিতেন না। আমাদের জাতীয় সংগ্রামের উপস্থিত সঙ্কটকালে গ্রেপ্তার হওয়া অপেক্ষা মুক্ত অবস্থায় থাকিয়া বোধ হয় কিছু বেশী কাজ করিতে পারিতাম; কিন্তু বর্ত্তমান অবস্থায় গ্রেপ্তার হইতে আত্মরক্ষা করিতে যাওয়া আমার পক্ষে ঘোরতর অন্যায় বলিয়া মনে হয়। আমি আশা করি, আপনারা আমাকে ভুল বুঝিবেন না। আমি শুধু মনের দুর্ব্বলতাবশতঃ ইচ্ছা করিয়াই ধরা দিতে যাইতেছি না। আমার বিবেক, আমার ধর্ম্ম, আমার কর্ত্তব্যবুদ্ধি সকলেই আমাকে এ সভায় উপস্থিত হইতে আহ্বান করিতেছে। সুতরাং আমি যদি কোন ভুল করিয়া থাকি, তবে মহাত্মাজী ও আমার দেশবাসিগণ আমাকে মার্জ্জনা করিবেন।

আমরা স্থির করিয়াছি, আমার অনুপস্থিতিতে আগা মহম্মদ সফদ্দার সাহেব প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটীর সভাপতিরূপে কার্য্য করিবেন। আগা মহম্মদ সফদ্দার সাহেবের স্বদেশপ্রেম, বুদ্ধিমত্তা ও কর্ত্তব্যপরায়ণতা আপনাদের সকলের কাছে সুবিদিত। আমার বিশ্বাস, তাঁহার অধিনায়কত্বে আপনারা সাফল্যের পথে অগ্রসর হইতে সমর্থ হইবেন।

আমি যখন গণতন্ত্রের লীলাভূমি আমেরিকা হইতে ফিরিয়া আসি,

তখন আমি বেশ জানিতাম যে, জেলের বাহিরে আমাকে অধিকদিন থাকিতে দেওয়া হইবে না, এবং আমার যাত্রাকালে তথাকার বন্ধুবর্গকে বলিয়া আসিয়াছিলাম যে, আমাকে যদি স্বদেশবাসীর মধ্যে অন্ততঃ ছয় মাসও স্বাধীন থাকিয়া কাজ করিতে দেওয়া হয়, তবে নিজেকে ধন্য জ্ঞান করিব। ভগবানের কৃপায় আপনাদের মধ্যে ১৯ মাস কাজ করিতে পারিয়াছি। সুতরাং আজ জেলে যাইবার সময় আমার বড়ই আনন্দ হইতেছে—আমি এই বিশ্বাস লইয়া জেলে যাইতে পারিতেছি যে, আমরা যাহাই করিয়াছি, সমস্তই বিবেক ও ধর্ম্মানুমোদিত চিত্তেই করিয়াছি। আমাদের কার্য্যসম্বন্ধে আমার কোনরূপ সন্দেহ বা আশঙ্কা নাই। আমি স্থির বুঝিয়াছি, আমাদের পথই ন্যায়ের পথ,—আমাদের সাফল্য অবশ্যম্ভাবী। আমার ইহাও মনে হয়, আমি শীঘ্রই আপনাদের মধ্যে ফিরিয়া আসিয়া পুনরায় কার্য্যারম্ভ করিতে পারিব। আর যদি তাহা নাই পারি, তবুও কোন আক্ষেপ নাই, কারণ, আমি যাহা করিয়াছি, তাহা বিধাতার ইচ্ছায়ই করিয়াছি। আমার চিত্ত বড়ই দুর্ব্বল, মহাত্মা গন্ধীর বিরাট আধ্যাত্মিকতার বিন্দুমাত্রও আমার নাই। অনেক সময় আমি ক্রোধ সংবরণ করিতে পারি না; যে সব চিন্তা করা আমার উচিত নয়, অনেক সময় সে সব চিন্তাকে সরাইয়া রাখিতে পারি না। তবে এ কথা জোর করিয়া বলিতে পারি যে, চিন্তায় ও কার্য্যে স্বদেশ ও স্বজাতির কল্যাণকেই চিরকাল সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আসন প্রদান করিয়া আসিয়াছি। আমি জানি, দেশের প্রতি কর্ত্তব্য করিতে যাইয়া অনেক ভুলভ্রান্তি করিয়াছি। এমন সব কথা বলিয়াছি, যাহাতে কেহ কেহ হয় ত মনে ব্যথা পাইয়াছেন। আমি আজ তাঁহাদের নিকট সর্ব্বান্তঃকরণে ক্ষমা-ভিক্ষা করিতেছি। আশা করি, তাঁহারা সকলে, বিশেষতঃ আমার মডারেট ও আর্য্যসমাজের ভাইগণ আমার সকল অপরাধ মার্জ্জনা করিবেন।

যে সকল দেশবাসী সরকারী চাকরী করেন, তাঁহাদের অবস্থা একটু বৈশিষ্ট্যজনক; তাহাদের সঙ্কট অবস্থা আমি সম্পূর্ণ হৃদয়ঙ্গম করি।

আমার বড়ই দুঃখ হয় যে, দারুণ অন্নসমস্থার গতিকে তাঁহারা অনেক সময় বিবেকের বিরুদ্ধে কাজ করিতে বাধ্য হন। কোন অসহযোগীই যেন সরকারী চাকুরীয়াগণকে ঘৃণা বা তাচ্ছিল্যের চক্ষে না দেখেন। তাঁহাদিগের প্রতি কটু ভাষা প্রয়োগ না করেন। এরূপ করিলে আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কাজ করিবেন।

আমাদের আন্দোলনকে সাফল্যমণ্ডিত করিতে হইলে কি কি করা আবশ্যক, তাহাই সংক্ষেপে বর্ণনা করিতেছি :—

প্রথমতঃ, বিভিন্ন জাতি ও সম্প্রদায়ের মধ্যে পূর্ণ ঐক্য ও প্রীতির ভাব স্থাপিত করিতে হইবে। কোনও ক্রমেই যেন এই সম্প্রীতির ব্যত্যয় না হয়, সে বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হইবে।

দ্বিতীয়তঃ, সর্ব্বপ্রকার অনাচার অত্যাচার বর্জ্জন করিতে হইবে। সরকারী কর্ম্মচারিগণ নানাপ্রকারে জনসাধারণকে উত্তেজিত করিতে চেষ্টা করিতেছে। কন্তু উত্তেজনার গভীরতম কারণ সত্ত্বেও আমাদিগকে সম্পূর্ণ নিরুপদ্রব থাকিতে হইবে। আমরা যদি অনাচার বর্জ্জন না করি, তবে আমাদের মধ্যে-অন্তর্বিবাদ ঢুকিতে পারে। তাহা হইলেই সর্ব্বনাশ হইবে। সুতরাং দেশবাসীর প্রতি আমার সানুবন্ধ অনুরোধ, তাঁহারা যেন সর্ব্বপ্রযত্নে অনাচার অত্যাচার বর্জ্জন করেন। কেহ গ্রেপ্তার হইলে তাঁহারা যেন কোনরূপ হরতাল বা সভাসমিতি না করেন, কিংবা যেন সরকারী আদালতে না যান। প্রত্যেকেই ধীর প্রশান্ত চিত্তে আপন কর্ত্তব্য করিয়া যাইবেন, কংগ্রেস ও কংগ্রেস-নেতৃবর্গের আদেশ যথাযথভাবে পালন করিবেন।

তৃতীয়তঃ, কংগ্রেসের কার্য্যে যেন কোনরূপ বিরাম না পড়ে। বিদেশী-বর্জ্জন ব্রতকে পূর্ণভাবে উদ্‌যাপন করিতে হইবে। যুবরাজের আগমনে কেহ কোনরূপ আমোদ আহ্লাদ বা আনন্দ-উৎসব করিবেন না। সংক্ষেপতঃ আপনারা সকলেই মহাত্মার নির্দ্দেশ অনুসারে কার্য্য করিবেন।

যুবকগণের প্রতি।

পঞ্জাবের যুবকগণ, আমি তোমাদিগকে দুই একটি কথা বলিতে চাই। বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা পাশ করাটাকেই জীবনের চরম উদ্দেশ্য বলিয়া মনে করিও না। কেবল স্বার্থান্বেষণেই জীবন পরিচালিত করিও না। যাহারা জীবনের উচ্চ ভাব ও উচ্চাকাঙ্ক্ষাগুলি বিসর্জ্জন দিয়া কেবল ভোগ-বিলাসের আদর্শে জীবন গঠিত করে, তাহারা মানুষ নহে—পশু, তাহাদের বাঁচা অপেক্ষা মৃত্যু শ্রেয়। আশা করি, তোমরা এই মহাসত্য উপলব্ধি করিয়া কার্য্য করিবে। কখনও অন্যায় উত্তেজনার বশে কাজ করিও না।

আমি আশা করি. তোমরা অন্ততঃ দুইটি কাজ করিবে—সর্ব্বদা খদ্দর পরিবে, আর যুবরাজের পরিদর্শন বয়কট করিবে।

ললনাগণের প্রতি।

পঞ্জাবের ললনাগণ, আমি জানি, তোমরা দেশের সেবা করিতে লালায়িত হইয়াছ. মাতৃভূমির সেবায় জেলে যাইতেও প্রস্তুত হইয়াছ। কিন্তু আমি একটি কথা বলিতে চাই। ভারতের জেলগুলি জ্বলন্ত নরক—তথায় পাপ ও কলুষতা বীভৎস আকারে বিরাজমান। সুতরাং আমি তোমাদিকে জেলে যাইবার কল্পনা ত্যাগ করিতে অনুরোধ করিতেছি। তোমাদের সমগ্র শক্তি স্বদেশী প্রচার কার্য্যে বিনিয়োগ কর। তোমরা আর একটি কাজ করিতে পার। যাঁহারা দেশের সেবায় জেলে যাইতে-ছেন, তাঁহাদের শিশু সন্তানগুলির রক্ষণাবেক্ষণ করিতে পার।

হে স্বদেশবাসিগণ! আমি তোমাদিগের নিকট হইতে বিদায় লই-তেছি। আমার প্রিয় জন্মভূমির সম্মান তোমাদের হাতে নিরাপদ থাকিবে, এই বিশ্বাস লইয়াই আমি আজ জেলে যাইতেছি। "বন্দে মাতরম্" (পত্রিকা) ও তিলক রাষ্ট্রীয় বিদ্যালয়—আমার দুইটি সন্তান;

ইহাদিগকে আমি তোমাদেরি হস্তে রাখিয়া যাইতেছি। ভাই সব, বিদায় হই!

তোমাদের শুভানুধ্যায়ী
(স্বাক্ষর) লালা লজপৎ রায়।

* * * *

লালা লজপৎ রায়ের গ্রেপ্তার-সংবাদে সমগ্র ভারতবর্ষে একটা বিরাট চাঞ্চল্য উপস্থিত হয়; তবে এ চাঞ্চল্য কোনরূপ অনাচার বা অত্যাচার-কলুষিত নহে, ইহা শান্ত, সংযত ও গম্ভীর। দেশবাসী এ সংবাদে একটুও বিস্মিত হন নাই, তাঁহারা এজন্য সম্পূর্ণ প্রস্তুত ছিলেন। লালাজী অসহযোগ আন্দোলনের অন্যতম প্রধান স্তম্ভ; অসহযোগ আন্দোলন দমন করিবার জন্য সরকার যেরূপ প্রচণ্ড চণ্ডনীতির আশ্রয় লইয়াছেন, তাহাতে লালাজী অচিরেই এ নীতির কবলে পতিত হইবেন, ইহা সকলেই ধ্রুব সত্যরূপে ঠিক করিয়া রাখিয়াছিলেন। তাই দেশবাসী যখন লালাজীর গ্রেপ্তার সংবাদ শুনিতে পাইলেন, তখন তাঁহারা বিন্দুমাত্র দুঃখিত বা বিচলিত হইলেন না, বরং লালাজী যে আজ স্বরাজ আশ্রমের অতিথি হইতে চলিলেন, এ জন্য লালাজীকে অভিনন্দিত করিতে লাগিলেন। ইতিপূর্ব্বেই কলিকাতা, লাহোর, এলাহাবাদ প্রভৃতি ভারতের অধিকাংশ নগরেই সভাবন্ধের আদেশ জারী হইয়াছে এবং এই আইন অমান্য করার কল্পিত অপরাধেই লালাজী গ্রেপ্তার হন। যে সব স্থানে এখনও সভাসমিতি-বন্ধের আদেশ জারী হয় নাই, সে সব স্থানে নানারূপ সভাসমিতি করিয়া লালাজীকে অভিনন্দিত করা হয়। যে সকল নেতা এখনও গ্রেপ্তার হইতে অবশিষ্ট ছিলেন, তাঁহারা লালাজীর গ্রেপ্তারে ঈর্ষানুভব করিতে লাগিলেন এবং কবে তাঁহাদেরও তাঁহার মত সৌভাগ্যোদয় হইবে, এ শুভ সুযোগের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। মহাত্মা গান্ধী লালাজীকে অভিনন্দন করিয়া তার করিলেন। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন লালাজীর গ্রেপ্তারে কলিকাতার ছাত্রসমাজকে লক্ষ্য করিয়া এক

আবেদন প্রচার করিলেন এবং সরকার তাঁহাকে ধরিতেছে না বলিয়া আক্ষেপ প্রকাশ করিলেন। তিনি লিখিলেন :—

"লালা লজপৎ রায়ের গ্রেপ্তারে আমাদিগের আন্দোলনের ইতিহাসে একটি নূতন পরিচ্ছেদ আরম্ভ হইল। ইহার উদ্দেশ্য স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে। আমাদিগের সাফল্যহেতু আমলাতন্ত্র অধীর হইয়াছেন। তাঁহারা এত দূর বিচলিত হইয়াছেন যে, তাঁহারা আঘাত করিতে উদ্যত হইয়াছেন। এতদিন আমলাতন্ত্র কতকটা অপ্রত্যক্ষভাবে আক্রমণ করিতেছিলেন। এবার প্রত্যক্ষভাবে তাহা করিতেছেন। লজপৎ রায় কংগ্রেস আন্দোলনের স্তম্ভস্বরূপ। সুতরাং তাঁহাকে গ্রেপ্তার করায় কংগ্রেসকেই আক্রমণ করা হইয়াছে। এই প্রত্যক্ষভাবে আক্রমণের আমি পক্ষপাতী। এতদ্দ্বারা প্রকাশ্যভাবে আমলাতন্ত্র ও কংগ্রেসের শক্তির পরীক্ষা হইবে; কংগ্রেসের আর এক বৎসর পূর্ণ হইবার অব্যবহিত পূর্ব্বে ইহা ঘটায় এই পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ করিবারও সময় উপস্থিত। বাঙ্গালাতেও যে সকল ব্যক্তি গ্রেপ্তার হইয়াছে, তাহাদের কথাও উল্লেখযোগ্য। বাঙ্গালাতে পীর বাদশা মিঞা ও ডাক্তার সুরেশচন্দ্রকে হাতকড়ি লাগাইয়া একসঙ্গে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া লইয়া যাওয়া হইয়াছিল। এতদ্দ্বারা হিন্দু-মুসলমানের অধীনতা ও একতা স্পষ্টীকৃত হইয়াছিল। যতীন্দ্রমোহন জেলে যাইয়া চট্টগ্রামের জয় ঘোষণা করিয়াছেন। অধ্যাপক নৃপেন্দ্রচন্দ্র সেইরূপ ভাগ্যকে বরণ করিয়া লইয়াছেন। রংপুরের অধ্যাপক বীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় সহস্র স্বেচ্ছাসেবককে কারাগারের পথ প্রদর্শন করিয়াছেন। তথায় আরও বিংশতি সহস্র স্বেচ্ছাসেবক সেইরূপ গ্রেপ্তারের গৌরবলাভের প্রতীক্ষা করিতেছেন। কুমিল্লার ব্রাহ্মণবাড়িয়াও সেইরূপ প্রস্তুত রহিয়াছেন।

* * * *

আমি দিন দিন বৃদ্ধ ও জরাজীর্ণ হইতেছি,—এই সময়েই সংগ্রাম উপস্থিত। তাহারা এখনও আমাকে ধরে নাই, কিন্তু আমি আমার হস্তে হাতকড়ির বেদনা ও দেহে শৃঙ্খলের ভার অনুভব করিতেছি। ইহা

বন্ধনের বেদনা। সমগ্র ভারতবর্ষ একটি বিরাট কারাগার। অতএব আমাকে ধরিলে বা না ধরিলে কিছু আসিয়া যায় না।

তবে একটা বিষয় স্থির। আমি মরি বা বাঁচি, কংগ্রেসের কার্য্য চালাইতেই হইবে।"

লালা লজপৎ রায়ের গ্রেপ্তারের পর সরকারের রুদ্রমূর্ত্তি আরও রুদ্রতর হইল—চণ্ডনীতির তাণ্ডব-লীলায় সমগ্র দেশ লণ্ডভণ্ড হইতে লাগিল। ভারতেব সর্ব্বত্র খানাতল্লাস ও ধরপাকড়ের ধূম পড়িয়া গেল। বাঙ্গালা, বিহাব, উড়িষ্যা, পঞ্জাব, যুক্তপ্রদেশ প্রভৃতি স্থানে প্রত্যহ শত শত অসহযোগী স্বেচ্ছায় ও হাসিমুখে কারাবরণ করিতে লাগিলেন। যে দিন লাহোরে লজপৎ রায়, সন্তানম্ প্রভৃতি গেপ্তার হন, ঠিক সেই দিনই প্রাতঃকালে লাহোবের পথে রেল-ষ্টেশনে অসহযোগী মার্কিণ ভাবতবন্ধু মিঃ ষ্টোক্‌স্‌কে গ্রেপ্তার করা হইল। ইহাঁরা ৩রা ডিসেম্বর গ্রেপ্তার হইলেন, আর ইহার তিন দিন পর ৬ই ডিসেম্বর এলাহাবাদে পণ্ডিত মতিলাল নেহেরু, তদীয় পুত্র পণ্ডিত জহরলাল নেহেরু, ভ্রাতুষ্পুত্র পণ্ডিত শ্যামলাল ও মোহনলাল নেহেরু, 'ইণ্ডিপেণ্ডেন্ট' পত্রের সম্পাদক মিঃ জর্জ্জ যোসেফ, মৌলানা কমিলুদ্দীন জাফ্রী প্রভৃতি বহু নেতাকে গ্রেপ্তার করা হইল। লালাজীব গ্রেপ্তারের দু এক দিন পর পরই পঞ্জাবেব আরও অনেক নেতা ও শিখসর্দ্দার গ্রেপ্তার হইলেন, লালাজী ও অন্যান্যের গৃহে খানাতল্লাস হইল। পঞ্জাব-জননায়ক ডাক্তার সত্যপাল গ্রেপ্তার হইলেন। ইহাঁদেব বিচারও প্রায় সঙ্গে সঙ্গে হইয়া গেল। পণ্ডিত মতিলাল নেহেরুর ৬ মাস, মিঃ জর্জ্জ যোসেফের ১৮ মাস, ডাক্তার সত্যপালের ১ বৎসর বিনাশ্রমে কারাদণ্ডেব বিধান হইল। এ যাবৎ কোন অসহযোগীই আদালতে আত্মপক্ষ সমর্থন করেন নাই; ইহাঁরাও কেহ করিলেন না।

বাঙ্গালায় চণ্ডনীতি চরমে উঠিল। ইতিপূর্ব্বে বাঙ্গালার মফঃস্বলের প্রায় সমস্ত নেতাই গ্রেপ্তার হইয়া কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছিলেন,

কলিকাতার প্রধান প্রধান কয়েকজন নেতাই কেবল অবশিষ্ট ছিলেন। ১৭ই নবেম্বরের হরতালের অভূতপূর্ব্ব কৃতকার্য্যতা দেখিয়া বাঙ্গালার আমলাতন্ত্র সরকার বড়ই প্রমাদ গণিলেন। তখন চণ্ডনীতি পূর্ব্বাপেক্ষা দ্বিগুণ প্রচণ্ডভাবে চলিতে আরম্ভ হইল। কলিকাতায় ৩ মাসের জন্য সভাসমিতি বন্ধের আদেশ জারী হইল। প্রথমে শ্রীযুত জিতেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায় গ্রেপ্তার হইলেন, বিচারে তাঁহার প্রতি ২ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ হইল। তাহার পর দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাসের কৃতী পুত্র চিররঞ্জন দাশ কয়েকজন স্বেচ্ছাসেবকের সহিত খদ্দর বিক্রয়ে বাহির হইয়া পুলিশের হস্তে গ্রেপ্তার হইলেন। পরের দিন ৭ই ডিসেম্বর দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের পত্নী শ্রীযুক্তা বাসন্তী দেবী, দেশবন্ধুর ভগ্নী শ্রীযুক্তা ঊর্ম্মিলা দেবী এবং নারীকর্ম্মমন্দিরের সম্পাদিকা শ্রীযুক্তা সুনীতি দেবী কয়েকজন স্বেচ্ছাসেবকসহ স্বয়ং পিকেটিংএ অবতীর্ণা হইলেন। পুলিশ ইহাঁদিগকে গ্রেপ্তার করিয়া লালবাজার থানায় লইয়া গেল, তাঁহাদিগকে লালবাজার হইতে প্রেসিডেন্সী জেলে স্থানান্তরিতা করা হইল। তাঁহাদিগকে জামীনে মুক্ত হইবার জন্য বহু অনুরোধ উপরোধ করা হইল, কিন্তু তাঁহারা অচল, অটল। তখন লাটের আসন টলিল, লাটসাহেব মহিলাগণকে বিনা সর্ত্তে মুক্তি দিবার আদেশ করিলেন। মহিলাগণ সেই দিনই রাত্রিতে সাড়ে এগারটার সময় মুক্তিলাভ করিলেন। মহিলাগণের গ্রেপ্তারে কলিকাতা ওলটপালট হইল, তখন শত শত ব্যক্তি স্বেচ্ছাসেবকের দলে নাম লিখাইয়া রাস্তায় খদ্দর বিক্রয়ে বাহির হইতে লাগিলেন এবং পুলিশের হস্তে ধরা দিতে লাগিলেন। মহাত্মা গন্ধীর পুত্র শ্রীযুত হীরালাল গন্ধী, শ্রীযুত বিপিনচন্দ্র পালের পুত্র শ্রীযুত জ্ঞানাঞ্জন পাল প্রভৃতি এইরূপে পুলিশের হস্তে আত্মসমর্পণ করেন এবং হাসিমুখে কারাদণ্ড বরণ করিয়া লয়েন। প্রত্যহ শত শত ধৃত স্বেচ্ছাসেবকগণের বিচার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই হইয়া যাইতে লাগিল। তাঁহারা কোন প্রকার জামীন বা প্রতিশ্রুতি না দিয়া সকলেই একবাক্যে জেল বরণ করিয়া

লইলেন। ১০ই ডিসেম্বর শনিবার দিবস কলিকাতার প্রায় সমস্ত নেতাই গ্রেপ্তার হইলেন। ঐ দিন বেলা প্রায় পৌনে পাঁচটার সময় দেশবন্ধু শ্রীযুত চিত্তরঞ্জন দাশ মহাশয়কে গ্রেপ্তার করা হইল। ঐ দিনই মৌলানা আবুল কালাম আজাদ, মৌলানা আক্রাম খাঁ, শ্রীযুত বীরেন্দ্রনাথ শাসমল, পদ্মরাজ জৈন, অম্বিকাপ্রসাদ বাজপেয়ী, ভোলানাথ বর্ম্মন, সুভাষচন্দ্র বসু প্রভৃতি সকল নেতা গ্রেপ্তার হইলেন।

লালা লজপৎ রায়ের গ্রেপ্তারের পর এইরূপ শুধু বাঙ্গালায় নহে, ভারতের অন্যান্য প্রদেশেও প্রচণ্ড চণ্ডনীতি চলিতে লাগিল। এদিকে গ্রেপ্তারের পর লালাজীকে লাহোরের সেন্‌ট্রেল জেলে লইয়া যাওয়া হয়। লালাজীর বন্ধুবান্ধবগণ তাঁহার জন্য গৃহ হইতে আহার্য্য পাঠাইবার ব্যবস্থা করেন। তিনি বলেন, "আজ আমার ন্যায় শত শত ব্যক্তি দেশের সেবায় হাজত ও কারাভোগ করিতেছেন। তাঁহাদের অধিকাংশই গৃহজাত আহার্য্যলাভে বঞ্চিত রহিয়াছেন, আমি কোন্ মুখে গৃহজাত উৎকৃষ্ট খাদ্যাদি ভক্ষণ করিব? জেলের আহার্য্যই আমার পক্ষে যথেষ্ট।" সুতরাং হাজতবাস করিবার কালেও লালাজী বরাবর জেলের আহার্য্যই তৃপ্ত রহিলেন।

লালাজী ৩রা ডিসেম্বর গ্রেপ্তার হন, ৭ই ডিসেম্বর তাঁহাদের মামলার দিন ধার্য্য হয়। ৭ই ডিসেম্বর লালাজী ও অন্যান্য নেতাকে লাহোরের অতিরিক্ত জেলা-ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ কিওফের এজলাসে উপস্থিত করা হয়। কিন্তু সরকারপক্ষ প্রস্তুত না থাকায় ঐ তারিখে মামলা আরম্ভ হইতে পারে না, মামলা ১২ই ডিসেম্বর পর্য্যন্ত মুলতুবী রাখা হয়।

১২ই ডিসেম্বর দ্বিপ্রহরে অতিরিক্ত জেলা-ম্যাজিষ্ট্রেটের এজলাসে লালা লজপৎ রায়, শ্রীযুত সন্তানম্, ডাঃ গোপীচাঁদ ও শ্রীযুত মালীকলাল খাঁর মামলা আরম্ভ হয়। গবর্মেণ্ট এডভোকেট মিঃ হার্কার্ট এবং পাবলিক প্রসিকিউটার মিঃ শিবনারায়ণ সরকারপক্ষ সমর্থন করেন। লালাজী প্রভৃতির পক্ষে কোন উকীল উপস্থিত হন না, তাঁহারা কেহই

আত্মপক্ষ সমর্থন করেন না। নেতৃগণের বিচার দর্শনার্থ সহস্র সহস্র লোক আদালতের পার্শ্বস্থ রাস্তায় ও দরজার নিকট সমবেত হন, কিন্তু পুলিশ ও সৈন্যের কড়া পাহারার বন্দোবস্ত থাকায় তাঁহারা ভিতরে প্রবেশ করিতে পারেন না। কয়েকজন বাছা বাছা উকীল, কংগ্রেস ও খেলাফৎ কমিটীর কয়েকজন নির্দ্দিষ্ট সভ্য ও জনসাধারণের কয়েকজন মনোনীত ব্যক্তিকে বিচার-গৃহে উপস্থিত থাকিতে দেওয়া হয়। নেতাগণকে আদালতে আনা হইলে, জনগণের মধ্য হইতে "বন্দে মাতরম্" "মহাত্মা গন্ধী কি জয়" লালা লজপৎকি জয়" প্রভৃতিরূপ হর্ষধ্বনি উত্থিত হইল। নেতাগণ বিচার-গৃহে প্রবেশ করিলে গৃহের সমস্ত লোক সসম্ভ্রমে দাঁড়াইয়া উঠেন এবং তাঁহাদিগকে অভিবাদন করেন। তখন বিচারপতি ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ কিওফ বিচার আরম্ভ করেন।

প্রথমেই শ্রীযুত সন্তানম্ ম্যাজিষ্ট্রেটকে জিজ্ঞাসা করেন,—তাঁহাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ কি এবং কোন্ ধারা অনুসারে তাঁহাদের বিচার হইবে। একটু ইতস্ততঃ করিয়া ম্যাজিষ্ট্রেট নেতাদের জানান যে, রাজদ্রোহজনক সভা-বন্ধের আইনের ৬ ধারা অনুসারেই প্রথমে তাঁহাদের বিচার করা হইবে, তাহার পর দণ্ডবিধির ১৪৫ ধারার [বে-আইনী জনতা [illegible]ার] অপরাধের বিচার হইবে।

লাহোরের জেলা-ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ ফেরার সরকারপক্ষে সর্ব্বপ্রথম সাক্ষ্য দেন। তাঁহার সাক্ষ্য প্রথম অভিযোগ সম্বন্ধে। কংগ্রেসের সেক্রেটারীর সহিত তাঁহার যে পত্রের আদান-প্রদান হইয়াছে, তিনি তাহা পাঠ করেন। জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের নামে পত্র না লিখিয়া ডেপুটী কমিশনারের নামে পত্র লিখিতে যে ভুল হইয়াছে, তাহা তিনি স্বীকার করেন। বিচারকারী ম্যাজিষ্ট্রেট তখন লালাজীকে বলেন, তাঁহাকে কেন উক্ত অপরাধে দণ্ডিত করা হইবে না, তিনি তাঁহার কারণ প্রদর্শন করুন। সে প্রশ্নে লালাজী নিম্নলিখিত মর্ম্মে এক একরার করেন:—

"আমি বর্ত্তমান সরকারের ও বর্ত্তমান আদালতের কর্ত্তৃত্ব স্বীকার

করিতে ইচ্ছা করি না। যাহা হউক, আমি এখন কেবল কতকগুলি ঘটনার উল্লেখ করিয়া যাইব। মেজর ফেরার যে আদেশ জারী করেন, তাহা তিনি জেলা-ম্যাজিষ্ট্রেটরূপে জারী করেন নাই। লাহোরের ডেপুটী কমিশনারের মারফতেই সকল আদেশ পাওয়া যায়। রাজদ্রোহজনক সভা-বন্ধের আইন এরূপ কর্ত্তৃপক্ষের মারফতে জারী হইবার কথা নয়। পঞ্জাবের প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির যে অধিবেশন ৩রা ডিসেম্বর তারিখে বসে, তাহা সাধারণ সভা নয় 'প্রাইবেট' সভা। তাহাতে জনসাধারণের অথবা তাহাদের কোন সম্প্রদায়ের প্রবেশাধিকার ছিল না। কেবল সভ্য-দিগকেই সভায় উপস্থিত হইতে বলা হইয়াছিল। ডেপুটী কমিশনারকেও জানান হয় যে, উহা সাধারণ সভা নহে। কংগ্রেস আফিসের কেরাণী ও চাপরাশীদেরও সে সভায় উপস্থিত থাকিতে দেওয়া হয় নাই। ৩রা তারিখে বেলা দুইটার সময় কমিটির অধিবেশন বসে। সকল সভ্যই আমার পরিচিত। মেজর ফেরার যখন পুলিশের সিনিয়র সুপারিণ্টেণ্ডে-ণ্টের সহিত সভাস্থলে যাইয়া উপনীত হন, তখন সকল কাজ শেষ হইয়া গিয়াছে। মেজর ফেরার যাইয়া বলেন—"আমি বলিতেছি—ইহা সাধা-রণ সভা, সভা ভাঙ্গিয়া দিন।" তিনি উহাকে বে আইনী জনতাও বলেন নাই, এই দুইটি কথা পরে জুড়িয়া দেওয়া হইতেছে। মেজর ফেরারের প্রশ্নের উত্তরে আমি বলি, "সভাপতিরূপে আমি বলিতেছি যে, ইহা সাধারণ সভা নয়; কাজেই আপনার আদেশ আইন-সঙ্গত নয়, আর আমিও সভা ভাঙ্গিয়া দিতেছি না।" মেজর তখন জিজ্ঞাসা করেন, আমি কে। বোধ হয়, পণ্ডিত রামভজ সে প্রশ্নের উত্তব দেন।

আমিও আমার নাম বলি। সে কথায় তিনি পুলিশ-সুপারি-ণ্টেণ্ডেণ্টকে আমার গ্রেপ্তারের আদেশ দেন। আমি আইনের ফাঁকি খুঁজিতেছি না। আমি কেবল জানাইতেছি যে, সভাস্থলে মেজর ফেরারের কার্য্য-কলাপ আগাগোড়া বে-আইনীই হইয়াছিল। গবর্ণমেণ্টকে অস্বী-কার করার পক্ষে উহাও আর একটি নূতন কারণ। এ গবর্ণমেণ্ট পাশব

শক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত; মেজর ফেরারে গবর্ণমেণ্টের সে মূর্ত্তি পরিস্ফুট।"

সরকারী এডভোকেট মিঃ হার্ব্বার্ট ঐ শেষোক্ত উক্তিতে আপত্তি করেন; বলেন, বিচারে যেন ঐ কথাটা নথিভুক্ত না করেন।

ম্যাজিষ্ট্রেট উত্তরে বলেন, তিনি সরকারী এডভোকেটের কথামতেই কাজ করিতেছেন।

তখন লালাজী সরকারের শাসন-পদ্ধতি সম্বন্ধে কিছু বলিতে চান। কিন্তু বিচারক তাহাতে আপত্তি করেন। লালাজী বলেন, "তাহা হইলে লিখিয়া লউন, তাঁহার কতকগুলি কথা লিপিবদ্ধ করা হয় নাই।"

লালাজী বলেন, কংগ্রেস কমিটিতে তিনি ছাড়া আর কেহ বক্তৃতা করেন নাই। সভার কার্য্য পরিচালন করার ও সভাপতিত্ব করার দায়িত্ব তাঁহারই।

বিচারক তখন শ্রীযুত সন্তানম্‌কে বলেন, তাঁহাকেও ঐ অভিযোগে অভিযুক্ত করা হইয়াছে। তাঁহাকেও ঐরূপ কারণ প্রদর্শন করিতে হইবে।

শ্রীযুত সন্তানম্ বলেন, "আমি অসহযোগী; আমি এ আদাল[illegible] কর্ত্তৃত্ব স্বীকার করি না। আমাদিগকে গ্রেপ্তার করিবার নয় দিন পরে এ অভিযোগ উপস্থিত করা হইয়াছে। এ জন্যও মেজর ফেরারের উল্লিখিত ব্যবহারে আমার দৃঢ় বিশ্বাস হইতেছে যে, বর্ত্তমান গবর্ণমেণ্টের নিকট তাঁহাদেরই কথিত আইনের সম্মান বজায় রাখিবার আশা করা মূর্খতা ব্যতীত আর কিছুই নহে।"

শ্রীযুত গোপীচাঁদ বলেন,—'এরূপ আদালতে ভারতবাসীর প্রতি ন্যায্য বিচার হইবে না জানিয়া আমি কিছু বলিতে চাহি না।"

শ্রীযুত মালীকলাল খাঁ বলেন—"তিনি এখন কিছু বলিতে চাহেন না।"

অতঃপর দ্বিতীয় অভিযোগ সম্বন্ধে সাক্ষ্য গ্রহণ করা হইতে থাকে।

মেজর কেয়ার ও উল্লিখিত পুলিশ-সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট সাক্ষ্য প্রদান করেন। তখন মামলা ১৬ই পর্য্যন্ত মুলতুবী রাখা হয়। নেতারা কেহ সাক্ষীদের জেরা করেন নাই। আদালতের বাহিরে বিরাট জনতা নেতাদের এক-বার দেখিবার জন্য অপেক্ষা করিতেছিল; নেতাদিগকে পুষ্পমাল্যে বিভূষিত করিবার উদ্দেশ্যে তাহারা মালা-হস্তে দাঁড়াইয়াছিল। পুলিশ চতুরতা করিয়া একটি গুপ্ত দ্বার দিয়া নেতাদিগকে লইয়া প্রস্থান করিতে-ছিল। জনতাও ইহা টের পাইয়া তাড়াতাড়ি অগ্রসর হয় এবং চলন্ত মোটর গাড়ীর গায়ে মালা পরাইয়া দেয়। তখন শত সহস্র কণ্ঠোত্থিত তুমুল "বন্দে মাতরম্" ধ্বনির মধ্যে নেতাগণকে লইয়া মোটরখানা সবেগে প্রস্থান করে।

১৬ই ডিসেম্বর তারিখ অতিরিক্ত জেলা-ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ কিওফের সমক্ষে লালাজী ও অন্যান্য নেতাগণের বিচার পুনরায় আরম্ভ হয়। এবারকার বিচার পূর্ব্বদিনের বিচার অপেক্ষা নানা ভাবে বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ছিল। পূর্ব্ব-দিবস প্রকাশ্য আদালত-গৃহে বিচার আরম্ভ হয় এবং নেতাগণের পক্ষে ব্যক্তিবিশেষকে বিচারস্থলে উপস্থিত থাকিতে দেওয়া হয়। কিন্তু এবার সেণ্ট্রাল জেলের ভিতর বিচার হয় এবং বাহিরের কোন লোককেই বিচারস্থলে উপস্থিত থাকিতে দেওয়া হয় না। কেবল দুই জন সংবাদ-পত্রের প্রতিনিধি ও এক জন উকীল তথায় থাকিতে অনুমতি পায়েন। পূর্ব্বদিনের ন্যায় নেতাগণ এবারও আত্মপক্ষ সমর্থন করেন না কার্য্য আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে লালাজী জেলের ভিতর রুদ্ধদ্বার কক্ষে বিচার হই-তেছে বলিয়া প্রতিবাদ করেন, কিন্তু ম্যাজিষ্ট্রেট তাঁহার কথার কোন উত্তর দেন না। কর্ত্তার ইচ্ছায় কর্ম্ম, সুতরাং এ বিষয়ে আমাদেরও কোন মন্তব্য অনাবশ্যক।

প্রথমে সরকারপক্ষের সাক্ষ্য গ্রহণ করা হয়। পুলিশের সব-ইন্স্পেক্টর আজীজুদ্দীন বলে, ৩রা ডিসেম্বর, তারিখ সে ডাক্তার সত্যানমের উপর এক নিষেধাজ্ঞার নোটীশ জারী করে এবং "ট্রিবিউন" পত্রের সহযোগী

সম্পাদকের নিকট লালা লজপৎ রায়ের স্বাক্ষরিত ইস্তাহারের একখণ্ড নকল প্রাপ্ত হয়।

অতঃপর "বন্দে মাতরম্" পত্রের সহযোগী সম্পাদক লালা রামপ্রসাদের সাক্ষ্য লওয়া হয়। তিনি বলেন, লালা লজপৎ রায় যে বাণী প্রচার করেন, তিনি সেই মূল কাগজখানা নষ্ট করিয়া ফেলিয়াছেন। প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির প্রেরিত এক লোকের মারফতে তিনি সভায় গৃহীত প্রস্তাবগুলি প্রাপ্ত হন। ঐ লোকটির নাম তাঁহার স্মরণ নাই। "বন্দে মাতরম্" পত্রিকার বিশেষ সংখ্যায় যে প্রবন্ধ কয়টি প্রকাশিত হয়, সে সম্বন্ধে কোন নিষেধাজ্ঞা তিনি পায়েন নাই।

এই সময় লালা লজপৎ রায় বলেন, "উল্লিখিত ইস্তাহারে যে স্বাক্ষর বাহির হইয়াছে, তাহা আমারই স্বাক্ষর এবং "বন্দে মাতরমের" বিশেষ সংখ্যায় যে বাণী প্রচারিত হইয়াছে, তাহা আমারই লিখিত।

অতঃপর পঞ্জাব প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সম্পাদক লালা ত্রিলোক-চাঁদ কাপুরকে ডাকা হয়। লালা ত্রিলোকচাঁদ হাজির হইলে পাবলিক প্রসিকিউটার তাঁহাকে কয়েকটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেন। তখন ত্রিলোক-চাঁদ বলেন, দিল্লীর নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির অধিবেশনে আইন অমান্য করা সম্বন্ধে যে প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে, সে প্রস্তাবের নির্দ্দেশ অনুসারে তিনি কোন প্রশ্নেরই উত্তর দিবেন না বলিয়া স্থির করিয়াছেন। বিশেষতঃ তাঁহার বিবেকও প্রশ্নের উত্তর দিতে বলিতেছে না।

তখন গবর্মেণ্ট এডভোকেট ফৌজদারী কার্য্যবিধির ৬৪ ও ৬৫ ধারার প্রতি আদালতের দৃষ্টি আকর্ষণ করিলেন।

লালা ত্রিলোকচাঁদকে আবার প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা হইল, তিনি আবার উত্তর দিতে অস্বীকার করিলেন। তখন ম্যাজিষ্ট্রেট ত্রিলোকচাঁদকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "আমি আপনাকে আর একবার সময় দিতেছি, আপনি প্রশ্নের উত্তর দিউন।"

লালা ত্রিলোকচাঁদ :—আমি দুঃখিত হইতেছি যে, আপনার প্রশ্নের উত্তর দিতে পারিতেছি না।

ম্যাজিষ্ট্রেট :—আপনার নিকট যে সকল কাগজপত্র চাওয়া হইতেছে, আপনি তাহাও দিতে অস্বীকার করিতেছেন ?

লালা ত্রিলোকচাঁদ :—হাঁ, মহাশয়।

তখন ম্যাজিষ্ট্রেট তাঁহাকে আদেশ করিলেন যে, তাঁহাকে যে প্রশ্ন করা হইতেছে, তাহার উত্তর না দেওয়ার অপরাধে কেন তিনি ভারতীয় দণ্ডবিধির ১৭৫ ও ১৭৯ ধারা মতে অভিযুক্ত হইবেন না, তাহার কারণ প্রদর্শন করুন।

লালা ত্রিলোকচাঁদ বলিলেন, তাঁহার কিছু বলিবার নাই, তবে ম্যাজিষ্ট্রেট যদি অনুমতি দেন, তবে তিনি লিখিত একরার পেশ করিবেন।

তখন ম্যাজিষ্ট্রেট তাঁহাকে মিঃ কিলানের এজলাসে অভিযুক্ত করিবার জন্য আদেশ জারী করিলেন এবং তাঁহাকে জামীনে খালাস দিতে চাহিলেন। কিন্তু ত্রিলোকচাঁদ জামীন দিতে অস্বীকার করিলেন। অতঃপর ম্যাজিষ্ট্রেট আদেশ করিলেন, লালা ত্রিলোকচাঁদকে হাজতে রাখিতে হইবে এবং তাঁহাকে পরের দিন মিঃ কিলানের এজলাসে কাগজপত্র হাজির করিতে হইবে।

তাহার পর "ট্রিবিউন" পত্রের সহযোগী সম্পাদক মিঃ প্যারীমোহনের সাক্ষ্য লওয়া হয়। তিনি ৮ই সেপ্টেম্বর, ৬ই নবেম্বর এবং ৬ই ডিসেম্বর তারিখের "ট্রিবিউন" দাখিল করেন এবং বলেন, কাগজে পঞ্জাব-প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির কার্য্য-বিবরণী সম্বন্ধে যে বিবরণী প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা অন্যের মুখে শুনিয়া লেখা হইয়াছে।

অতঃপর আরও দুই জন পুলিশের সাক্ষ্য গ্রহণের পর রাজদ্রোহ সভা-বন্ধ আইনের ৬ ধারা মতে অভিযোগের সাক্ষ্যগ্রহণ শেষ হয় এবং মামলা পুনরায় ১৯শে তারিখ পর্য্যন্ত মুলতুবী রাখা হয়।

১৯শে তারিখে পুনরায় মামলা আরম্ভ হয়, কিন্তু সামান্য কিছু আলোচনার পর ২১শে তারিখ পর্য্যন্ত মামলা স্থগিত রাখা হয়।

২১শে ডিসেম্বর অতিরিক্ত ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ কিওফের এজলাসে সেন্ট্রেল জেলের ভিতর পুনরায় বিচার আরম্ভ হয়। একটা খোলা জায়গায় সামিয়ানা টাঙ্গাইয়া তাহার নীচে বিচার-কার্য্য আরম্ভ হয়। বিচারস্থলে প্রায় ৭০ জন বাহিরের লোককে উপস্থিত থাকিতে দেওয়া হয়। তন্মধ্যে শ্রীযুত সন্তানমের পত্নী ও জলন্ধরের 'কন্যা মহাবিদ্যালয়ের' প্রিন্সিপাল শ্রীমতী লজ্জাবতী দেবীও ছিলেন।

আসামী লালা লজপৎ রায়, শ্রীযুত সন্তানম্, ডাক্তার গোপীচাঁদ ও মালীকলাণ খাঁ মধ্যস্থলে চেয়ারে উপবিষ্ট থাকেন।

ম্যাজিষ্ট্রেট যথাসময়ে বিচার আরম্ভ করিলেন।

ম্যাজিষ্ট্রেট :—মিঃ লজপৎ রায়, আপনি কি লিখিত একরার পেশ করিতেছেন?

লালাজী :—আমি একটি লিখিত একরার আনিয়াছি সত্য, কিন্তু আমি পড়িবার আগে ইহা কাহাকেও দেখাইব না।

মিঃ হার্ব্বার্ট :—যদি লালা লজপৎ রায় এরূপ একটি প্রতিশ্রুতি দেন যে, তাঁহার একরারে মোকদ্দমা-সম্পর্কিত কথা ব্যতীত বাজে কথা নাই, আর তাহাতে রাজদ্রোহমূলক কিছু নাই, তবেই আমি তাঁহাকে তাঁহার একরার পড়িতে অনুমতি দিতে পারি।

লালাজী :—আমার একরারে কোন রাজদ্রোহমূলক কথা নাই। মোকদ্দমার সম্পর্ক-রহিত বাজে কথা যে কি, তাহা আমি বুঝি না। যখন সমস্ত বক্তৃতাই লিখিয়া লওয়া হয়, তবে ইহা বাদ যাইবে কেন?

ম্যাজিষ্ট্রেট :—আগে আমাকে একরারটি দেখিতে দেন, আপনি পরে পড়িতে পারেন। (আইনের বই খুলিয়া পড়িয়া) একরার পড়িবার পূর্ব্বে বিচারপতিকে তাহা দেখান আবশ্যক।

মিঃ হার্ব্বার্ট :—যদি তিনি বলিতে চাহেন, তবে তাঁহার মৌখিক একরারই গ্রহণ করুন।

ম্যাজিষ্ট্রেট :—তাহাতে যে কি ফল হইবে, আমি বুঝি না। আসামী যদি তাঁহার একরার না দেখান, তবে তাঁহার লিখিত একরারে যে সব কথা লিখিয়াছেন, মুখে তাহাই বলিবেন।

মিঃ হার্ব্বার্ট :—তিনি যদি মৌখিক একরার দেন, তবে তিনি একটা নির্দ্দিষ্ট সীমা অতিক্রম করিতে পারিবেন না। আদালত যে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, তিনি তাহারও উত্তর দিয়াছেন। মিঃ সলীমের যে আসামীর সহিত বিতর্ক উপস্থিত হইয়াছে, ইহাতে আমি আপত্তি করিতেছি।

লালাজী :—আমি আদালতের এই কার্য্যপ্রণালীর প্রতিবাদ করিতেছি। ইহা দ্বারা আদালত বা মিঃ সলীমের প্রতি কোন অসম্মান দেখান আমার উদ্দেশ্য নহে, কিন্তু আমি বলিতে চাই যে, এই প্রদেশে এমন অনেক রাজনৈতিক মামলা হইয়া গিয়াছে, যাহাতে এরূপ বিতর্ক উপস্থিত হইয়াছে। আপনি ইহার সময় আপত্তি করেন কেন?

সন্থানম্ :—আমি এই প্রতিবাদে যোগ দিতে চাই, আমার কথাতেই হউক, কি অন্যের কথাতেই হউক, আমাকে কেহ কোনরূপ সাহায্য করে, ইহা আমি চাই না।

ম্যাজিষ্ট্রেট :—মিঃ সন্থানম্, আমি আপনার জন্য সাহায্য চাহিতেছি না, আদালতের জন্য সাহায্য চাহিতেছি।

ম্যাজিষ্ট্রেট :—মিঃ লজপৎ রায়, ১৯২১ সনের ৩রা ডিসেম্বর সলীম-প্রাসাদে পঞ্জাবপ্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটীর যে অধিবেশন হয়, তাহাতে কি আপনি সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন?

লালাজী :—আমি দুঃখিত, আমি আদালতের কোন প্রশ্নের উত্তর দিতে পারি না। কোনরূপ অসম্মান দেখান ইহার উদ্দেশ্য নয়, কিন্তু অসহযোগিগণ সমগ্র ভারতে এই পন্থাই অবলম্বন করিয়া আসিতেছেন। আমি

যে একরার দিতে যাইতেছি, তাহাতে মোকদ্দমা-সম্পর্কিত সকল কথাই আছে।

ম্যাজিষ্ট্রেট:—বেশ, আপনাকে একরার করিতে অনুমতি দিতেছি, কিন্তু আপনি আগে আমার হাতে না দিলে, আপনাকে উহা পড়িতে দিতে পারি না।

লালাজী:—আচ্ছা, এই নিন।

ম্যাজিষ্ট্রেট:—(একরারখানা পড়িয়া) আপনাকে ইহা পড়িতে দিতে পারি না। এ জায়গা রাজনৈতিক বক্তৃতা দিবার স্থান নহে।

লালাজী:—ইহা একটি রাজনৈতিক মামলা।

ম্যাজিষ্ট্রেট:—তা বটে। কিন্তু এই মামলার সম্পর্কিত ছাড়া অন্য লোকের কথায় আমার কোন কাজ নাই। আপনার একরারের এই অংশ আপনাকে পড়িতে দিব না।

লালাজী:—আমি কিছুই পড়িতে যাইতেছি না। আপনার কাছেই কাগজখানা রাখিয়া দিলাম।

মিঃ হার্ব্বার্ট:—(আদালতকে লক্ষ্য করিয়া) সংবাদপত্রওয়ালারা যদি ঐ একরার চাহে, তবে যাহাতে ঐ অংশ কাটিয়া ফেলা হয়, আপনি তাহার প্রতি লক্ষ্য রাখিবেন।

সন্তানম্:—মিঃ হার্ব্বার্ট এইখানেই একটা নূতন গভর্মেণ্ট স্থাপন করিতে চাহেন। অন্যের লিখিত একরারের অংশ কাটিবার অধিকার তাঁহার কি আদালতের, তাহা আমি বুঝিতে পারিতেছি না। মিঃ হার্ব্বার্ট পৃথিবীশুদ্ধ শাসন করিতে চান। তিনি খবরের কাগজে কিছুই যাইতে দিবেন না।

ম্যাজিষ্ট্রেট:—আমিই এই মকদ্দমা পরিচালন করিয়াছি, আদালত আসামীর একরারের যে কোন অংশ কাটিয়া দিতে পারে।

সন্তানম্:—হাঁ, মিঃ হার্ব্বার্টের কথায়।

অতঃপর ম্যাজিষ্ট্রেট পণ্ডিত সন্তানম্, ডাক্তার গোপীচাঁদ ও মালীকলাল

খাঁকে প্রশ্ন করিলে তাঁহারা সকলেই কোন উত্তর দিতে অস্বীকার করেন। তাঁহারা বলেন, তাঁহারা ঐ আদালতের বা ম্যাজিষ্ট্রেটের কোন কর্ত্তৃত্বই স্বীকার করেন না। তখন ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ সলীমকে বলিলেন, "আপনাকে এখানে আনার উদ্দেশ্য এই যে, আপনি আগামী কল্য আসামীদের পক্ষে এই মামলায় সওয়াল জবাব করিবেন। মিঃ সলীম স্বীকৃত হইলেন।

ম্যাজিষ্ট্রেট :—লালা লজপৎ রায়, পণ্ডিত সন্তানম্, ডাক্তার গোপীচাঁদ ও মালীকলাল খাঁ, আপনাদিগকে ভারতীয় দণ্ডবিধির ১৪৫ ধারা মতে অবৈধ জনতা করার অপরাধে অভিযুক্ত করা যাইতেছে। আপনারা কি দোষ স্বীকার করেন?

লালাজী :—আমরা কিছুই স্বীকার করি না।

সন্তানম্ :—আমিও তাই।

গোপীচাঁদ :—আমিও তাই।

মালীক :—আমিও তাই।

ম্যাজিষ্ট্রেট :—আপনারা কি জেরা করিবার জন্য সরকারী সাক্ষীদিগকে ডাকিতে চাহেন?

লালাজী :—না।

ম্যাজিষ্ট্রেট :—কোন আসামীই না?

লালাজী :—না।

ম্যাজিষ্ট্রেট :—আত্মপক্ষসমর্থনে কিছু বলিবেন?

লালাজী :—কিছুই না।—দয়া করিয়া কাগজপত্রের একটা নকল দিবেন কি?

ম্যাজিষ্ট্রেট :—সমস্ত কাগজপত্র?

লালাজী :—হাঁ, মহাশয়।

ম্যাজিষ্ট্রেট :—আচ্ছা।

মিঃ হার্ব্বার্ট :—লিখিত একরারের ঐ অংশগুলি বাদ দিবেন কি?

ম্যাজিষ্ট্রেট :—হাঁ, দেওয়া হবে।

তখন পরের দিনের জন্য মামলা মুলতুবী রহিল।

পরের দিন ২২শে তারিখ আবার ১১টার সময় জেলের ভিতর মামলা আরম্ভ হয়, পূর্ব্বদিনের ন্যায় প্রায় ৭০ জন লোক উপস্থিত থাকেন। পণ্ডিত সন্তানমের পত্নী এবং শ্রীমতী পার্ব্বতী দেবীও উপস্থিত ছিলেন। ঠিক ১২টার সময় মামলা আরম্ভ হয়।

ম্যাজিষ্ট্রেট গভমের্ণ্ট এডভোকেট মিঃ হার্ব্বার্টকে সওয়াল জবাব করিতে আদেশ করেন।

মিঃ হার্ব্বার্ট :—আসামীগণের বিরুদ্ধে রাজদ্রোহ সভা আইনের ৬ ধারা এবং ভারতীয় দণ্ডবিধির ১৪৫ ধারার (অবৈধ জনতা) অভিযোগ আনা হইয়াছে। এই বিশেষ মামলায় আইনের বিধান এই যে, আসামীগণকে জিজ্ঞাসা করিতে হইবে যে, কেন তাঁহারা উপরি-উক্ত অভিযোগে দোষী সাব্যস্ত হইবেন না, তাহার কারণ প্রদর্শন করুন। প্রথম নম্বরের আসামী লালা লজপৎ রায় পূর্ণ জবানবন্দী করিবেন এবং অন্যান্য আসামী সংক্ষিপ্ত জবানবন্দী করিবেন, কেননা, লালা লজপৎ রায়ই তাঁহাদের মুখপাত্র। আমার মনে হয়, এ বিষয়ে আইন সম্বন্ধে তাঁহারা বড়ই ভুল করিতেছেন। তাঁহারা বলিতেছেন যে, প্রথমতঃ ডেপুটী কমিশনারের এই সভা বন্ধ করিবার কোন অধিকার ছিল না, দ্বিতীয়তঃ তিনি বলেন নাই যে, ঐ সভা নিষিদ্ধ হইয়াছে, তৃতীয়তঃ এই সভা জনসাধারণের সভা নহে। আমি প্রমাণ করিতে চাই যে, আসামীগণের কথা সত্য বলিয়া ধরিয়া লইলেও তাঁহারা দণ্ডবিধির ১৪৮ ধারা অনুসারে অবশ্যই অভিযুক্ত হইবেন।

অন্যান্য কথার পর মিঃ হার্ব্বার্ট বলিলেন, "রাজদ্রোহ সভা আইন অনুসারে কোন সভা করিতে হইলে পূর্ব্বে অনুমতি লওয়া আবশ্যক। মানিয়া লইলাম যে, ডেপুটী কমিশনার বলেন নাই, উহা নিষিদ্ধ সভা, কিন্তু সভাটি যে নিষিদ্ধ সীমার ভিতর হইয়াছে এবং উহাতে যে ডেপুটী

কমিশনারের অনুমতি লওয়া হয় নাই, তাহা ত ঠিক। আসামীগণ আর কিছু বলেন নাই, তাঁহারা প্রকাশ্য সভারও কোন ব্যাখ্যা করেন নাই।

সন্তানম্ :—আমি যে স্থানে বলিয়াছিলাম যে, আমি এই আদালতের কর্তৃত্ব স্বীকার করি না, আপনি আমার সেই উক্তির কথা বলিতেছেন। আচ্ছা, আপনি একটা ব্যাখ্যা করিবেন কি?

মিঃ হার্কার্ট :—আমি আপনার উক্তির কথা বলি নাই। আমি লালা লজপৎ রায়ের উক্তির কথা বলিতেছি। (বিচারককে লক্ষ্য করিয়া) লালা লজপৎ রায় ইহাঁদের মুখপাত্র ও অন্যান্য সকলে তাঁহার চেলা মাত্র।

সন্তানম্ :—আমি এ কথার প্রতিবাদ করিতেছি। আমি আদালতকে জানাইতেছি যে, ইনি চালাবাজী আরম্ভ করিয়াছেন। (বিচারককে লক্ষ্য করিয়া) আপনি ইহাঁকে সতর্ক করিয়া দিবেন কি?

মিঃ হার্কার্ট :—আমি মিঃ সন্তানম্ বা আর কাহারও কথায় চলিতে চাই না।

সন্তানম্ :—আপনি আদালতের কথায় চলিতে চাহেন।

মিঃ হার্কার্ট :—আমার প্রমাণ করিতে হইবে যে, প্রথমতঃ এই সভা প্রকাশ্য জনসাধারণের সভা, দ্বিতীয়তঃ ইহা নিষিদ্ধ স্থানে হইয়াছে, তৃতীয়তঃ ইহা জেলা-ম্যাজিষ্ট্রেটের অনুমতি ব্যতীত করা হইয়াছে। এই তিনটি বিষয় প্রমাণ করিতে পারিলেই আসামীগণ ঐ ধারা অনুসারে দোষী সাব্যস্ত হইবেন। আসামী তাঁহার একরারে বলিয়াছেন যে, ইহা প্রকাশ্য জনসাধারণের সভা নহে, কারণ, ইহাতে জনসাধারণের প্রবেশাধিকার ছিল না। কিন্তু ডেপুটী কমিশনার তাঁহাদের বিরুদ্ধে ৬ ধারা অনুসারে যে অভিযোগ আনিয়াছেন, তাহা আইনত ঠিক অভিযোগ। ইহাঁরা বলিতেছেন যে, কেবল নির্বাচিত সদস্যগণের মধ্যেই ইহা সীমাবদ্ধ ছিল, কিন্তু সভার আলোচ্য বিষয় ত রাজনৈতিক ছিল। "পাব্লিক" বা "প্রকাশ্য সভা" শব্দটির সাধারণ ব্যাখ্যা করিলে চলিবে না, ইহার

আইনসঙ্গত ব্যাখ্যা করিতে হইবে। অভিধানের ব্যাখ্যায় চলিবে না। ৩রা ডিসেম্বরের সভা এই আভিধানিক ব্যাখ্যার অন্তর্গত নয়। এমন কি, ডিরেক্টারগণের সভার ন্যায় 'প্রাইভেট' সভাও এই আইনের মধ্যে পড়ে। সাধারণের কোন কার্য্যের আলোচনার জন্য যে সভা, তাহাই 'পাব্লিক' সভা, আর কোন ব্যক্তিবিশেষের (সাধারণের নহে) কার্য্যালোচনার জন্য যে সভা, তাহাই 'প্রাইভেট' সভা। 'সিনেমা'ও ত কেবল যাহারা টিকেট কিনে, তাহাদের কাছেই খোলা থাকে, কিন্তু তাই বলিয়া কি উহা 'পাবলিক' নয়? সেইরূপ পঞ্জাব-প্রাদেশিক কংগ্রেস-কমিটীর এই দুই শত লোক কেবল নিজেদের ব্যক্তিগত বিষয়ের আলোচনার জন্য ঐ স্থানে সমবেত হন নাই, তাঁহারা জনসাধারণের বিষয়ের আলোচনার জন্যই সমবেত হইয়াছিলেন। লালা লজপৎ রায় বলেন যে, ইহা 'পাবলিক' সভা নহে, কারণ,ইহা কয়েকজন সদস্যের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল, কিন্তু ইহা 'সিনেমার' ব্যাপারের মত, 'সিনেমাও' ত কেবল টিকেট-ক্রেতাগণের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে। 'পাবলিক সভার' সাধারণ অর্থে উহা পাবলিক সভা না হইতে পারে, কিন্তু আইনের অর্থে উহা পাবলিক সভা সন্দেহ নাই। ঐ সভা একটি নির্দ্দিষ্ট উদ্দেশ্য লইয়া আহূত। সভার আলোচ্য বিষয় দ্বারা জনসাধারণের মধ্যে দাঙ্গাহাঙ্গামা ও চাঞ্চল্য সৃষ্টির সম্ভাবনা ছিল। মেজর ফেরার এবং সাধারণ সম্পাদকের মধ্যে যে পত্রাপত্রি হইয়াছে, তাহাতে মেজর ফেরার লিখিয়াছেন যে, সভার আলোচ্য বিষয় দ্বারা জনসাধারণের মধ্যে একটা চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হইতে পারে, সভার উদ্দেশ্য এরূপ না হইলে তিনি উহা নিষেধ করিতেন না। সাধারণ সম্পাদক বলেন নাই যে, উহা 'পাবলিক' সভা নহে। কেবল তাহাই নহে, লালা লজপৎ রায়ের উক্তিতে ইহাও দেখা যায় যে, তিনি বলেন নাই যে, সভায় আইন-নিষিদ্ধ বিষয়ের আলোচনা হইবে না। সভায় কোন্ বিষয়ের আলোচনা হইবে, তাহা জানাইবার জন্য সাধারণ সম্পাদককে সকল প্রকার সুযোগই দেওয়া হইয়াছিল, কিন্তু তিনি এ বিষয়ে কোন উত্তরই

দিলেন না। তিনি যখন কোন উত্তর দিলেন না এবং সভার আলোচ্য বিষয় কিরূপ হইবে, তাহার কিছু বলিলেন না, তখন ইহা সহজেই অনুমান করা গিয়াছিল যে, সভায় নিষিদ্ধ ও বে-আইনী বিষয়ের আলোচনা হইবে। উঁহাদের ইস্তাহার ও ডেপুটী কমিশনারের প্রতি মিঃ সন্তানমের উত্তর এই দুইটি বিষয়ের দিকে আমি আদালতের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। তাঁহার চিঠিতে যে ভাব দেখাইয়াছেন, তাহাতে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, তাঁহারা সমস্তই জানিতেন এবং তাঁহারা বলেন যে, কোন কোন আইন মানিব না। ইহার দ্বারা তাঁহারা নির্ব্বিরোধ আইন অমান্য সমর্থন করিয়াছেন সন্দেহ নাই। জেলা-ম্যাজিষ্ট্রেটের অনুমতি না লইয়া নিষিদ্ধ স্থানে সভা করা হইতেছিল। ম্যাজিষ্ট্রেট তাঁহাদিগকে অনুমতি লওয়াইতে গিয়াছিলেন। লালা লজপৎ রায়ের উক্তিতে মোকদ্দমার সম্পর্কহীন অনেক বাজে কথা বলা হইয়াছে। ফিরোজপুরে তিনি যে একরার করিয়াছিলেন, তাহাতেও সেইরূপ।

সন্তানম্ :—এই একরার তাঁহারই কি না, আপনি সন্ধান করিয়া দেখিবেন কি? তিনি ত দাগী আসামী।

মিঃ হার্বার্ট :—দ্বিতীয় কথা, এখানে দণ্ডবিধির ১৪৫ ধারা খাটে কি না। এই সম্পর্কে আমি বলিতে চাই যে, ডেপুটী কমিশনারই সাধারণতঃ জেলা-ম্যাজিষ্ট্রেট। আমি পূর্ব্বে দেখাইয়াছি যে, ইহা সাধারণের সভা এবং নিষিদ্ধ সভা। সুতরাং ইহা হইতে প্রমাণ হয় যে, ইহা অবৈধ জনতা। এই সম্বন্ধে লিখিত আদেশ দেওয়া হইয়াছিল। টাইপ করা আদেশে মেজর ফেরারের নাম টাইপ করা হইয়াছিল। মেজর ফেরার তাহা কাটিয়া তাহার স্থানে "ডিঃ এম" কথাটি লিখিয়া দেন এবং ঐ কাগজে তাহার শীল মারেন। "ডিঃ এম" ডিষ্ট্রীক্ট ম্যাজিষ্ট্রেটের সংক্ষিপ্ত নাম। সকলেই জানেন, মেজর ফেরার একজন ডিষ্ট্রীক্ট ম্যাজিষ্ট্রেটও। আমার মনে হয়, মিঃ সন্তানম্ ও ডাক্তার গোপীচাঁদও তাঁহাকে ভালরূপ জানেন।

লালাজী :—তিনি মিউনিসিপাল কমিটীরও সভাপতিত্ব করেন।

সন্তানম্ :—আমি তাঁহাকে মাত্র তিনবার দেখিয়াছি।

মিঃ হার্ব্বার্ট :—দ্বিতীয় কথা এই—কোন প্রকাশ্য নোটিশ দেওয়া হইয়াছে কি না। আমি বলিতেছি, তা দেওয়া হইয়াছে। কর্ণেল গ্রেগশন তাঁহার একরারে বলিয়াছেন যে, তিনি আফিসের ফটকের নিকট একদল পুলিশ পাঠাইয়াছিলেন। ইহাতেই প্রমাণ হয় যে, অন্ততঃ এই চারি জন আসামীর পক্ষে নোটিশ দেওয়া হইয়াছে। হলের মধ্যেও মেজর কর্ত্তৃক এরূপ নোটিশ দেওয়া হইয়াছে। অবৈধ জনতা কাহাকে বলে, তাহাও বলিতেছি। যদি ৫ জন কিংবা ততোধিক ব্যক্তি কোন এক স্থানে আইন অমান্য করিবার উদ্দেশ্যে জনতা করে, তবে আইনমতে সেই জনতাকে অবৈধ জনতা বলে। এই সভা বিশেষতঃ আইন অমান্য করিবার উদ্দেশ্যেই বসিয়াছিল। নির্ব্বিরোধ আইন অমান্য বলিতে যে কোন আইন অমান্য বুঝায়। সুতরাং আমার বক্তব্য এই যে, এই সভা অবৈধ জনতা। ৫ ধারায় বলিতেছে যে, যদি জেলা-ম্যাজিষ্ট্রেটের মতে কোন সভা রাজদ্রোহজনক বলিয়া মনে হয়, তবে তিনি উহা বন্ধ করিয়া দিতে পারেন। সুতরাং এই মামলায় আদালতের কোন স্বাধীন ইচ্ছা নাই।

উপসংহারে আমি আসামীগণের অসম্মানজনক ব্যবহারের প্রতি আদালতের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। মিঃ সন্তানম্ বলিয়াছেন যে, তিনি এই আদালতের কর্ত্তৃত্ব স্বীকার করেন না, তিনি জানেন না যে, তাঁহার সম্মুখে একজন প্রধান কর্ম্মচারী উপস্থিত। লালা লজপৎ রায়ও তাঁহার একরারে এই সব অসংলগ্ন কথা বলিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, সরকার পশুশক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত, মেজর ফেরার তাঁহার প্রতীক। ইহা দ্বারা কি ইহাই বুঝায় না যে, এই লোকগুলাই রাজদ্রোহ প্রচার করে এবং জনসাধারণের মধ্যে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করে? যখন আদালতেই তাঁহারা এই সব কথা বলিতে সঙ্কোচ করেন না, তখন বাহিরে যে তাঁহারা কত কি বলিতে পারেন, তাহা ত সহজেই বুঝা যায়। ম্যাজিষ্ট্রেট সত্যই বলিয়াছেন যে, রাজদ্রোহ প্রচারের জন্যই এই সভা

আহূত হইয়াছিল। ইঁহারা প্রকাশ্য আদালতে প্রকাশ্যভাবে সরকারের নিন্দা ঘোষণা করিতেছেন। সুতরাং আমি আদালতকে বলিতেছি, আদালতের যত কঠোরতম শাস্তি দেওয়ার ক্ষমতা আছে, আসামীগণের প্রতি সেই শাস্তিই দেওয়া হউক I recommend to the Court to inflict the utmost sentence that is in the power of the Court on the accused.

সন্তানম্ :—বহুৎ আচ্ছা।

তখন ব্যারিষ্টার মিঃ সলীম বিচারপতির অনুরোধে কেবল আদালতকে সাহায্য করিবার জন্যই আসামীদের পক্ষ সমর্থন করিয়া সওয়াল-জবাব করিতে আরম্ভ করেন।

মিঃ সলীম :—৫ ধারা মতে আমাদের দেখিতে হইবে যে, ঐ সভা 'পাবলিক' কি না এবং ৪ ধারা মতে দেখিতে হইবে যে, সাধারণের মধ্যে চাঞ্চল্যসৃষ্টি করিবার উদ্দেশ্যেই উহা বসান হইয়াছিল কি না। 'পাবলিক' সভার আভিধানিক অর্থ এই যে, যে সভায় 'পাবলিক' অর্থাৎ জনসাধারণ প্রবেশ করিতে পারে, তাহাই পাবলিক সভা। এক্ষণে দেখিতে হইবে, ইহা কি পাবলিক সভা, না 'প্রাইভেট' সভা। অপর পক্ষের ব্যারিষ্টার সিনেমার সহিত তুলনা দিয়াছেন। কিন্তু তাহা ঠিক নয়। প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটীর সদস্যগণ বিভিন্ন জেলার নির্ব্বাচিত সদস্যগণের মধ্য হইতে নির্ব্বাচিত হন। কমিটির এই সভায় সদস্যগণ তাঁহাদের ব্যক্তিগত অধিকারবলে উপস্থিত হইয়াছিলেন। দ্বিতীয়তঃ, জনসাধারণের মধ্যে চাঞ্চল্য সৃষ্টি করিবার উদ্দেশ্যেই এই সভা বসিয়াছিল কি না, তাহা কেবল সংবাদপত্রের রিপোর্ট দেখিয়া বুঝা যায় না। তার পর এই সভা নিষিদ্ধ সভা কি না, সে সম্বন্ধে ৫ ধারার আলোচনা করা আবশ্যক। ৫ ধারায় বলে—যে সভা সম্বন্ধে ম্যাজিষ্ট্রেট লিখিত আদেশ জারী করিয়া প্রকাশ্যে নোটিশ দেন, তাহাকেই নিষিদ্ধ সভা বলে। একদল কনষ্টেবল পাঠাইয়া ফটকের নিকট মোতায়েন রাখাকেই

প্রকাশ্য নোটিশ দেওয়া বলা চলে না। এমন কি, যদি পুলিশকর্ম্মচারিগণ কোন সদস্যকে বলিয়াও থাকে যে, উহা নিষিদ্ধ সভা, তথাপি ইহা দ্বারা প্রকাশ্যে নোটিশ দেওয়া বুঝায় না।

আরও বলা হইয়াছে যে, দণ্ডবিধির ১৪৫ ধারা অনুসারে ঐ সভা অবৈধ জনতা। কিন্তু কেবল খবরের কাগজের সাক্ষ্যে কোন সভাকে অবৈধজনতা বলা চলে না, সাক্ষ্য আইনে (Evidence Act) এ কথা বলে না। নোটিশ হইতে ইহা বুঝায় যে, সভায় আইন অমান্য বিষয়ে আলোচনা করিবার কথা ছিল, কিন্তু প্রকৃতপ্রস্তাবে ইহা আইন অমান্য করে নাই। সভার কোন বে-আইনী কাজ করিবার অভিপ্রায় ছিল না। সভায় কেবল এ বিষয়ে আলোচনা করিবার কথা ছিল, আর কিছু নয়। যখন কোন প্রকাশ্য নোটিশ দেওয়া হয় নাই, তখন ৫ ধারা এ ক্ষেত্রে খাটে না। সুতরাং ঐ সভা অবৈধজনতা নহে।

মিঃ হার্ব্বার্ট:—(দাঁড়াইয়া উঠিয়া) নোটিশ দেওয়া হইয়াছিল, লালা লজপৎ রায় যে ঐ দিন গ্রেপ্তার হইবেন, তাহা তিনি জানিতেন।

সন্থানম্ :—এখানে একটা পাগলা কুকুর আছে,ভয় হয়, আমাদিগকে কামড়াইবে।

মিঃ হার্ব্বার্ট :—আমি আদালতকে জানাইতে চাই যে, মিঃ সলীমের পক্ষসমর্থনে আমি যে শাস্তির কথা বলিয়াছি, তাহা একটুও কমিতে পারে না।

সন্থানম্ :—আমি একটা কথা বলিতে চাই—২২শে ডিসেম্বরের ট্রিবিউনে যেন লেখা হয়, আসামীগণের প্রতিবাদ সত্ত্বেও মিঃ সলীম তাঁহাদের পক্ষসমর্থন করিয়াছেন।

ম্যাজিষ্ট্রেট :—খবরের কাগজে কি লেখে না লেখে, তাহার সহিত আমার সম্বন্ধ নাই। কেবলমাত্র আদালতকে সাহায্য করিবার জন্যই আমি মিঃ সলীমকে ডাকিয়াছিলাম। মিঃ লজপৎ রায়, আপনি কিছু বলিতে চাহেন কি?

লালাজী :—না।

তখন আদালত ভঙ্গ হইল, বিচারক বলিলেন, আগামী ১৯২১ সনের ৪ঠা জানুয়ারী রায় প্রকাশ করা হইবে।

এই বিচারের পর লালাজী ও তাঁহার সহচরগণ পুনরায় হাজতভোগ করিতে আরম্ভ করিলেন। এই সময় এমন একটি ঘটনা ঘটিল, যাহাতে আমরা লালাজীর স্বরূপের পূর্ণ পরিচয় পাই। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, লালাজী জেলে গৃহজাত খাদ্য গ্রহণ করিতেন না, অন্যান্য কয়েদীর ন্যায় জেলের খাদ্যেই ক্ষুন্নিবৃত্তি করিতেন। কিন্তু কিছুদিন পর উহাঁদিগকে যে খাদ্য দেওয়া হইতে লাগিল, তাহা মনুষ্যের আহারের অযোগ্য। রুটীর মধ্যে অধিকাংশভাগই ভূষি-মিশ্রিত, তাহাও ভাল করিয়া সেঁকা নয়, অধিকাংশই কাঁচা। ডালতরকারীর ব্যবস্থাও প্রায় তদ্রূপ। এই সব কারণে অনেক রাজনৈতিক কয়েদীর পেটে অসুখ হইতে লাগিল, লালাজীরও পেটে অসুখ হইল। লালাজী নিজের জন্য যত না ভাবিলেন, কিন্তু অন্যান্য সহকর্ম্মীর জন্য বড়ই চিন্তিত হইলেন। তাঁহারা সমস্তে ৭৯ জন রাজনৈতিক কয়েদী ঐ জেলে অবস্থিতি করিতেছিলেন। তখন লালাজী স্থির করিলেন, তিনি প্রায়োপবেশন ব্রত গ্রহণ করিবেন। ২৪শে তারিখ তাঁহার নিকট আহার্য্য দেওয়া হইলে তিনি উহা খাইতে অস্বীকার করিলেন। তাঁহার দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া কোন রাজনৈতিক কয়েদীই আহার্য্য গ্রহণ করিলেন না। তখন জেল-কর্ত্তৃপক্ষের চমক ভাঙ্গিল। তাঁহারা সেই দিনই আহার্য্য পরিবর্ত্তন করিলেন, অপেক্ষাকৃত ভাল খাদ্য দিতে লাগিলেন। লালাজী সেই দিন আর জলমাত্র স্পর্শ করিলেন না, তিনি পরের দিন হইতে আহার গ্রহণ করিতে লাগিলেন।

এ দিকে লালাজীর প্রায়োপবেশনের সংবাদ বাহিরে পৌছিলে সমগ্র সহরময় একটা বিরাট চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হইল। লাহোর নগরীর শত শত আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সেন্ট্রেল জেলের ফটকের নিকট আসিয়া ভিড় করিতে লাগিল। সকলের মুখেই দারুণ উৎকণ্ঠা, সুনিবিড় বিষাদের ছায়া।

সকলেই উহাঁদের দেখিবার জন্য, উহাঁদের সঠিক খবর জানিবার জন্য একান্ত উদ্‌গ্রীব। একজন প্রত্যক্ষদর্শী ২৭শে ডিসেম্বরের 'ট্রিবিউন' পত্রে এই সম্বন্ধে একটি করুণ কাহিনী বর্ণন করিয়াছেন। তিনি বলেন, "২৬শে ডিসেম্বর সেন্‌ট্রেল জেলের প্রধান ফটকের নিকট শত শত নরনারী সমবেত হইয়াছিলেন। উহাঁদের মধ্যে কেহ কেহ জেলে আত্মীয়গণের সহিত দেখা করিতে গিয়াছেন, কোন কোন অসহযোগী নেতাগণের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছেন, আবার অধিকাংশই নেতাগণের দর্শনলাভের জন্য,উহাঁদের অবস্থা স্বচক্ষে দেখিবার জন্য তথায় উপস্থিত। ইহাঁদের মধ্যে প্রায় ৪০ বৎসরবয়স্কা একটি প্রৌঢ়া মহিলা অনেকেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিলেন। তাঁহার মুখচ্ছবি বিষাদে মলিন,তাঁহার চোখে দারুণ উৎকণ্ঠার ছায়া। তাঁহার পরণের বসন সামান্য, তাঁহার এক হাতের নীচে অঞ্চল দিয়া কিসের একটি পাত্র ঢাকা, তাঁহার চেহারা ও পোষাক দেখিয়া মনে হইল, তিনি লাহোরেরই অধিবাসিনী, তিনি অত্যন্ত উৎকণ্ঠিতভাবে এদিক ওদিক ঘুরিতেছেন, বার বার হাত জোড় করিয়া জেলের ওয়ার্ডার ও নায়েব দারোগাগণকে করুণভাবে কি বলিতেছেন। একবার দেখা গেল, তিনি প্রধান জেইলারের পিছু পিছু যাইয়া অতি কাতরভাবে কি প্রার্থনা করিতেছেন। এমন সময় এসিষ্টান্ট জেইলারের নিকট হইতে আমার ডাক পড়িল, আমি জেলের ভিতর আমার এক আত্মীয় বিচারাধীন কয়েদীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলাম। সাক্ষাৎ করিয়া ফটকের বাহিরে আসিলে সেই মহিলা আমার নিকট উপস্থিত হইলেন এবং করুণ মিনতি স্বরে বলিলেন, 'ওগো, আমাকে ভিতরে যাইতে অনুমতি লওয়াইয়া দিন।' আমি বলিলাম, 'আপনি কাহার সহিত দেখা করিতে চাহেন?' রমণী বলিলেন, 'আমি তাঁদের নাম জানি না, লোকে তাঁকে লজপৎ বলিয়া ডাকে। আজ ভোর না হইতে আমি এখানে এসেছি। ভিতরে যাইবার জন্য এই সকল লোককে কত কাকুতি-মিনতি করছি, আমার ছেলেরা যে না খেয়ে রয়েছে, আমি

তাঁদের জন্য খাবার এনেছি, কিন্তু ওরা খাবার দিতে দিবে না।’ আমি তাঁহার মুখের দিকে তাকাইলাম—দেখিলাম, তাঁহার দু আঁখি ছল ছল করিতেছে। একটু থামিয়া তিনি আবার বলিলেন, ‘আজ দু দিন যাবৎ আমি কিছু খাই নাই, আমার ছেলেদের না খাওয়াইয়া আমি কিছু খেতে পারবো না।’

মুহূর্ত্তের তরে আমি আত্মহারা হইলাম, আমার বাক্‌স্ফূর্ত্তি হইল না। ক্ষণেক পরে বলিলাম, ‘মা, সন্ধ্যা হয়েছে, এখন এরা আপনাকে লালা লজপৎ রায় ও অন্যান্যের সহিত দেখা করিতে দিবে না। আমার কথা বিশ্বাস করুন, তাঁহারা আহার গ্রহণ করেছেন। আপনিও বাড়ী যেয়ে আহার গ্রহণ করুন।’ তিনি একপদও নড়িলেন না কেবল বলিলেন, ‘না, আমার ছেলেরা ক্ষুধার্ত্ত, আমার তাদের খাওয়াতেই হবে।’ এই বলিয়া তিনি আমাকে কাকুতি-মিনতি করিতে লাগিলেন আমি অনেক বলিয়া কহিয়া তাঁহাকে বিশ্বাস লওয়াইলাম যে, লালাজী আর উপবাসী নহেন। অবশেষে তিনি বিশ্বাস করিলেন, কিন্তু তাঁহার আনীত খাদ্য বাড়ী ফিরাইয়া লইয়া যাইতে চাহিলেন না। তখন সমবেত আমরা সকলে অন্নপূর্ণার প্রসাদ জ্ঞানে তাঁহার আহার্য্য গ্রহণ করিলাম—গ্রহণ করিয়া নিজকে ধন্য জ্ঞান করিলাম। আমি রমণীকে আমার গাড়ীতে বসাইয়া বাড়ী পৌঁছাইয়া দিয়া আসিলাম।”

আখ্যায়িকাটি সামান্য, কিন্তু লালা লজপৎ রায় পঞ্জাবের নরনারী-গণের উপর কিরূপ অপূর্ব্ব প্রভাব বিস্তার করিয়াছেন, তাহার সম্যক্ পরিচয় প্রদান করে।

১৯২২ খৃষ্টাব্দের ৪ঠা জানুয়ারী লালাজী ও অন্যান্যের মামলার রায় প্রকাশ করিবার কথা, কিন্তু ঐ দিন রায় প্রকাশিত হইল না। আবার ৭ই তারিখ রায় প্রকাশের দিন স্থির হয়। ৭ই তারিখে সেন্‌ট্রেল জেলের ভিতর রায় প্রকাশ করা হয়। ম্যাজিষ্ট্রেট এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, পঞ্জাব প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটীর অধিবেশনকে রাজদ্রোহজনক সভা

বন্ধের আইন অনুসারে সাধারণ সভা ও ভারতীয় দণ্ডবিধির ১৪৫ ধারা অনুসারে বে-আইনী জনতা বলিয়া বিবেচনা করা যাইতে পারে। এই সিদ্ধান্ত অনুসারে তিনি অভিযুক্ত নেতা চারজনের সকলকেই দণ্ডিত করেন। রাজদ্রোহজনক সভাবন্ধের আইনের ৬ ধারা অনুসারে লালা লজপৎ রায় ও পণ্ডিত সন্তানম্ ছয় মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ডে ও ৫০০ টাকা হিসাবে অর্থদণ্ডে, এবং ডাক্তার গোপীচাঁদ ও মালীকলাল খাঁ ৪ মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ডে ও ৩০০ টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হন। এতদ্ব্যতীত দণ্ডবিধির ১৪৫ ধারা অনুসারে নেতারা চারজনেই একবৎসরের সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। এই দুই প্রকার দণ্ড পর পর ভোগ করিতে হইবে এবং সশ্রম কারাদণ্ড প্রথমে আরম্ভ হইবে।

ইংরাজ বিচারকের বিচারে লালা লজপৎ রায় দেড় বৎসরের জন্য কারাগারে প্রেরিত হইলেন। লালাজী দেশমাতৃকার একনিষ্ঠ সেবক এ দেশে তাঁহার দেশসেবার যথাযোগ্য পুরস্কার কারাগার ভিন্ন আর কি হইতে পারে? আইন ও শাসন মানুষকে কঠোর দণ্ডে দণ্ডিত করিতে পারে, কিন্তু মানুষের মনের উচ্ছ্বাস দমন করিতে পারে না। আইন ও বিচার লজপৎ রায়কে—পুরুষসিংহকে নির্জ্জন কারা কক্ষে অবরুদ্ধ রাখিতে পারে, কিন্তু তাঁহাকে দেশবাসীর ভক্তিশ্রদ্ধায় বঞ্চিত রাখিতে পারে না। যে মহাপুরুষ, যে অসাধারণ মনীষী, যে সর্ব্বত্যাগী স্বদেশভক্ত জনসেবায় চিরজীবন যাপন করিয়াছেন, যে স্বতঃসিদ্ধ জননায়ক জ্ঞানাঞ্জন-শলাকায় অজ্ঞান জনসাধারণের চক্ষু উন্মীলিত করিয়াছেন, যে পুরুষসিংহ পৌরুষ ও চরিত্রবলে বলীয়ান্ হইয়া দেশবাসীকে কর্ত্তব্যের পথে প্রণোদিত করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন, যে উদারচরিত নিঃস্বার্থ নিষ্কাম মাতৃভক্ত দেশের ও দশের জন্য আত্মদান করিয়াছেন, ভারতের জনসাধারণ তাঁহাকে হৃদয়রাজ্য হইতে নির্ব্বাসিত করিতে পারে না। তিনি আজন্ম ব্যুরোক্রেশীর চক্ষুশূল হইতে পারেন, কিন্তু রাজদণ্ড তাঁহাকে প্রজাসাধারণের শ্রদ্ধা-পুষ্পাঞ্জলিলাভে বঞ্চিত করিতে পারে না।

লালা লজপৎ রায় গত ৩০ বৎসর যাবৎ স্বদেশের সেবা করিয়া আসিতেছেন। তাঁহার স্বদেশপ্রেমে কোনও কালে কোনরূপ আবিলতা বা কৃত্রিমতা স্পর্শ করিতে পারে নাই। দেশের জন্য লালাজী সর্ব্বস্ব অর্পণ করিয়াছেন, তাঁহার ধনমনতনু দেশের সেবায় নিযুক্ত হইয়াছে। তিনি নিষ্কাম কর্ম্মযোগী; সংসারে থাকিয়াও তিনি দেশমাতৃকার জন্য সন্ন্যাসী। এ ত্যাগ, এ সর্ব্বস্বত্যাগের মহিমা কি ভুলিবার? বাঙ্গালী ত্যাগীর চরণে সসম্ভ্রমে মস্তক অবনত করিতেছে।

দেশমাতৃকার সেবা করিতে যাইয়া লজপৎ রায় পুনঃ পুনঃ রাজরোষ বরণ করিয়া লইয়াছেন। তাঁহার ত্রিশ বৎসরের সাধনার প্রাণগত মাতৃভক্তির পুরস্কার—লাঞ্ছনা, কারাদণ্ড। পঞ্চদশ বৎসর পূর্ব্বে তিনি অজ্ঞাতকারণে জন্মভূমি হইতে সুদূর মান্দালয়ে নির্ব্বাসিত হইয়াছিলেন। বিগত মহাযুদ্ধের সময় তাঁহাকে জন্মভূমিতে প্রবেশাধিকার দেওয়া হয় নাই, তাঁহাকে একপ্রকার নির্ব্বাসিতের অবস্থায় আমেরিকায় কালযাপন করিতে হইয়াছে। পাঞ্জাবী দুর্ঘটনার পর তিনি দেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিবার অনুমতি প্রাপ্ত হন। যে দিন তিনি লাহোরে প্রবেশ করিলেন, সে দিন লাহোরবাসী কয়জন দণ্ডিত পাঞ্জাবীর জন্য দুঃখ প্রকাশ করিতেছিলেন। সেই দুঃখের ভার মাথায় লইয়া লালাজী লাহোরে প্রবেশ করিলেন। আবার দেশমাতৃকার সেবায় আত্মোৎসর্গ করিলেন।

তাহার পর ভারতে যখন নবভাবের ভেরী জীমূতমন্দ্রে বাজিয়া উঠিল, মহাত্মা গন্ধীর "অহিংস অসহযোগ" মন্ত্রের তুমুল রোলে হিমালয় হইতে কন্যাকুমারী পর্য্যন্ত কাঁপিয়া উঠিল, মার মঙ্গলশাঁখ স্বর্গমর্ত্ত্য পূর্ণ করিয়া ভারতবাসীর হৃদয়ে হৃদয়ে প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল, তখন লজপৎ রায় সেই শঙ্খ-নিনাদে মার আহ্বান শুনিতে পাইলেন। তিনি মহাত্মা গন্ধীর নবমন্ত্রের উপাসক হইলেন। সমগ্র ভারতের নবভাবের ভক্তগণ ও নায়কগণ তাঁহাকে নেতা বলিয়া বরণ করিয়া লইলেন। তাঁহার

ভাগ্য-বিবর্ত্তনের সূচনা হইল, এমন সময় তিনি ধৃত হইলেন; দেড় বৎসরের জন্য কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়া দেশবাসীর নিকট হইতে বিদায় লইলেন।

লালা লজপৎ রায় আজ কারাগারে। পণ্ডিত শ্রীযুত মতিলাল নেহেরু ও শ্রীযুত সত্যপাল বলিয়াছেন, বর্ত্তমানে কারাগারই আত্মসম্মানজ্ঞান-সম্পন্ন ভারতবাসীর আশ্রয় হইয়াছে; লালাজীও আজ সেই আশ্রয়ে আশ্রয় লইলেন। আজ লালাজী স্বরাজ আশ্রমের অতিথি। বীরপ্রসূ ভারতজননীর কত সুসন্তান আজ একে একে কারাগারে বিশ্রাম লইতে বাধ্য হইতেছেন। কিন্তু দুঃখ করিবার সময় এ নহে; সুবিস্তৃত কর্ম্মক্ষেত্র দেশবাসীকে দুঃখের শোকের অবকাশ দিতেছে না। আইস ভারতবাসী, ত্যাগী মহাপুরুষগণের শুভ আশীর্ব্বাদ মাথায় লইয়া আমরা কর্ম্মক্ষেত্রে অগ্রসর হই; ত্যাগের পুণ্য প্রভাব আমাদিগকে শত বিপদ্ হইতে রক্ষা করিবে। লালাজী "স্বরাজ আশ্রমে" গিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার অশরীরী বাণী ভারতবাসীর মর্ম্মে মর্ম্মে ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হইতেছে, তাঁহাদের ত্যাগের আলোকে ভারতবাসী তাহাদের প্রকৃত পথ দেখিতে পাইয়াছে, সে পথ তাহারা পরিত্যাগ করিবে না, দেশভক্তের সম্মান তাহারা দেশসেবার দ্বারাই রক্ষা করিবে।

তবে যাও ভারতের স্বরাজসাধক, তুমি কিছুদিনের জন্য ভারতের স্বরাজ আশ্রমে বিশ্রাম করিয়া আইস। তুমি বীর, তুমি ত্যাগী, তোমার ত্যাগে দেশ আজ সমুজ্জ্বল, সে ভাতি মলিন হইবার নহে। তুমি কর্ম্ম-যোগী, তোমার প্রারব্ধ কর্ম্ম এখন ভারতের আবালবৃদ্ধবনিতার প্রাণের সামগ্রী। তোমার ত্যাগ, এ বৃদ্ধবয়সেও তোমার অক্লান্ত দেশসেবা অপূর্ব্ব। তুমি সন্ন্যাসী, তোমার সর্ব্বস্বপণ বৃথা হয় নাই, দেশ জাগিয়াছে; তোমার আদর্শে তাহারাও নিজ ক্ষুদ্র স্বার্থ ভুলিয়া দেশের কাজে আত্ম-হারা হইয়াছে। তুমি ভারতের বরপুত্র; যে দিন ভারতবাসী তাহার নিজের ইতিহাস লিখিতে বসিবে, সে দিন—সেই অদূর-ভবিষ্যতে

তোমার প্রকৃত মহিমা তাহারা যথাযোগ্য ভাষায় প্রকাশ করিতে সমর্থ হইবে ;—তুমি বাঙ্গালীকে ভালবাস,তাই আজ এক ক্ষুদ্র বাঙ্গালী তোমার উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধাভক্তির এই সামান্য অর্ঘ্য সমর্পণ করিল। ভারতের স্বরাজ-যজ্ঞের প্রবীণ পুরোহিত তুমি, তোমার আহুতিতে দেবতা সন্তুষ্ট। তোমার অসহযোগ মন্ত্র সফল হইয়াছে। তোমার একনিষ্ঠ সাধনায় ভারতের অসাড় দেহে প্রাণসঞ্চার হইয়াছে। তুমি স্বরাজের অগ্রদূত, তুমি দেশে দেশে দ্বারে দ্বারে ভারতের স্বরাজ-সাধনার কথা প্রচার করিয়াছ, পৃথিবীর জাতিসমূহ তোমার সাধনায় সম্মানিত হইয়াছে। তোমার স্বদেশসেবার হোমধূম-সুরভি সমগ্র জগতে পরিব্যাপ্ত হইয়াছে। ভারতের একপ্রান্তে ক্ষুদ্র কারাগারে আজ তুমি বন্দী। ব্যুরোক্রেশীর বাঁধন কি তোমার আত্মাকে—তোমার অমরবাণীকে আটক রাখিতে পারিবে ?

পরিশিষ্ট।

লালা লজপৎ রায় বিচিত্র কর্ম্মী। দেশের যাবতীয় জনহিতকর কার্য্যের সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে। তিনি বলেন, দেশের উন্নতি করিতে হইলে, প্রকৃত ভারতীয় জাতি গঠন করিতে হইলে, দেশহিতকর যাবতীয় কার্য্যেই মনোনিবেশ করা আবশ্যক। রাষ্ট্র, সমাজ,ধর্ম্ম,শিক্ষা সকল বিষয়েই আমাদিগকে উন্নতি ও সংস্কার-সাধন করিতে হইবে। এই জন্যই দেখিতে পাই, ভারতে, বিশেষতঃ পঞ্জাবে এমন কোন দেশহিতকর অনুষ্ঠান নাই, যাহার সহিত লালাজীর প্রত্যক্ষ কি পরোক্ষ সংযোগ না আছে।

লালা লজপৎ রায় একজন প্রথম শ্রেণীর সমাজসংস্কারক, সমাজ-সংস্কারক্ষেত্রে তিনি যে সব কাজ করিয়াছেন এবং করিতেছেন, হিন্দু-সমাজের ইতিহাসে তাহা চিরকাল উজ্জ্বলভাবে অঙ্কিত থাকিবে। আর্য্য-সমাজের সম্পর্কেই তিনি এ সব কার্য্য করিয়াছেন। সমাজসংস্কার

বিষয়ে লালাজীর মত অতিশয় উদার। তিনি সঙ্কীর্ণতা বা গোঁড়ামি আদৌ দেখিতে পারেন না। সমাজের একদল লোক আছে,তাহাদের মুখে একরূপ, কার্য্যে সম্পূর্ণ অন্যরূপ। লালাজী এই শ্রেণীর লোককে ঘৃণা করেন। তাঁহার মতে ত্যাগই সংস্কারের মূলমন্ত্র। যে ত্যাগ করিতে পারে না, সে কি রাষ্ট্র, কি সমাজ, কোন ক্ষেত্রেই প্রকৃত সংস্কারক বলিয়া পরিচয় দিতে পারে না।

লালাজী একজন ধর্ম্মপ্রাণ ব্যক্তি। ধর্ম্মবিষয়েও তিনি অতিশয় উদার। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দর্শনে তাঁহার গভীর জ্ঞান। হিন্দুধর্ম্মের গূঢ়তত্ত্ব সমূহ তিনি অতি মনোযোগের সহিত আলোচনা করিয়াছেন। বেদ, বেদান্ত, উপনিষদ্,গীতা প্রভৃতি হিন্দুশাস্ত্রে তিনি অতিশয় সুপণ্ডিত; বিশেষতঃ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা তাঁহার অতি আদরের গ্রন্থ। লোকমান্য তিলক 'গীতারহস্য' লিখিয়াছেন। লালা লজপৎ রায়ও গীতা সম্বন্ধে একখানি অতি উপাদেয় গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন। গ্রন্থখানির নাম "গীতার বাণী", ইহা ইংরাজী ভাষায় লিখিত। এই পুস্তকে লালাজী গীতার মধুময় ঝঙ্কারের সাহায্যে দেশবাসীর অন্তরে পবিত্র দেশাত্মবোধের অনুপ্রেরণা জাগাইয়া তুলিতে প্রয়াস পাইয়াছেন।

দেশের শিল্প-বাণিজ্যের উন্নতিকল্পেও লালাজীর বিশেষ দৃষ্টি রহিয়াছে। তিনি পঞ্জাবের নানাবিধ দেশীয় শিল্প ও কলকারখানার সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট। তিনি বহু বৎসর "পঞ্জাব ন্যাসনেল ব্যাঙ্কের" ডিরেক্টার ছিলেন, এই ব্যাঙ্ক লাহোরের সর্ব্বপ্রধান ভারতীয় ব্যাঙ্ক। এতদ্ব্যতীত তিনি পঞ্জাবের বহু কাপড়ের কল ও সুতার কলের ডিরেক্টার ও অংশীদার।

লজপৎ রায় আবাল্য একজন পাকা স্বদেশী। যাহাতে স্বদেশী শিল্প-বাণিজ্যের প্রচার হয়,দেশবাসীর অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতি হয়,এ বিষয়ে তাঁহার আপ্রাণ চেষ্টা। ১৯১৯ সালের ১০ই নবেম্বর তিনি মহাত্মা গন্ধীর নিকট একখানা পত্রে লিখেন,—"আমার মনে হয়,এক্ষণে ভারতের

সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রয়োজনীয় বিষয় হইতেছে,—ভারতের জনসাধারণের মধ্যে সার্ব্বজনীন শিক্ষার বিস্তার ও তাহাদের অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতিসাধন। ভারতীয় সংবাদপত্রসমূহের উপর যদি আমার কোন ক্ষমতা থাকিত, তবে আমি তাঁহাদিগকে অনুরোধ করিতাম, প্রত্যেক সংবাদ-পত্রের প্রত্যেক সংখ্যার ঠিক প্রথম পৃষ্ঠার উপরিভাগে নিম্নলিখিত কথা কয়টি যেন বড় বড় অক্ষরে লিখা থাকে :—

দেশের প্রধান প্রয়োজন—
শিশুগণের জন্য দুগ্ধ,
বয়স্কগণের জন্য অন্ন,
সকলের জন্য শিক্ষা।"

১৯২০ সনের নবেম্বর মাসে বোম্বাইয়ে 'নিখিল ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের' প্রথম অধিবেশন হয়। লালা লজপৎ রায় এই অধিবেশনের সভাপতির পদ অলঙ্কৃত করেন। তিনি তাঁহার অভিভাষণে ভারতের 'অর্থনৈতিক পরাধীনতা' সম্বন্ধে অতি সারগর্ভ ও সুযুক্তিপূর্ণ আলোচনা করেন। তিনি বক্তৃতা-প্রসঙ্গে ভারত-গভর্মেণ্টের অমিত-ব্যয়িতা এবং বেতন সম্বন্ধে ঊর্দ্ধতন ও নিম্নতন কর্ম্মচারিগণের মধ্যে অদ্ভুত বৈষম্যের কথা আলোচনা করেন। তিনি বলেন, ভারত-সরকারের মত এত মোটা মাহিনা পৃথিবীর অন্য কোন সরকারই প্রদান করেন না। সমগ্র যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে একমাত্র যুক্তরাষ্ট্রের সভাপতিই বৎসর ৩৫০০০ টাকার অধিক বেতন পাইয়া থাকেন। জাপানে প্রধান মন্ত্রীও এত টাকা পান না। কিন্তু ভারতবর্ষে অনেক অনেক কর্ম্মচারীই ঐরূপ মোটা বেতন পাইয়া থাকেন, অবশ্য তাঁহারা প্রায় সকলেই ইংরাজ। তার পর ঊর্দ্ধতন ও নিম্নতন কর্ম্মচারিগণের মধ্যে বেতন-বৈষম্যের কথা ভাবিলে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। বিশেষতঃ এ বিষয়ে একদিকে ভারতবর্ষ, অপরদিকে ইংলণ্ড ও আমেরিকার অবস্থার বিষয় তুলনা করিলে, বিস্ময়ে অবাক্ হইয়া যাইতে হয়।

যুক্তরাষ্ট্রে সরকারী আফিসের যে কেরাণী বা কুলী সকলের চেয়ে কম বেতন পায়, সে বৎসর ১০০০ হইতে ১২০০ ডলার (১ ডলারে ৩ টাকার কিছু বেশী) পাইয়া থাকে। কেবিনেট মন্ত্রী সকলের চেয়ে অধিক বেতন পায়েন, তিনি বৎসরে ১২০০০ ডলার পায়েন। ভারতবর্ষে, এলাউন্স বাদেই একজন কেবিনেট মন্ত্রী বৎসর পায়েন ৮০,০০০ টাকা আর তাঁহার আর্দ্দালী পায় বৎসর ১২০ টাকা, বড় জোর ১৮০ টাকা। একজন সিভিলিয়ান কর্ম্মচারীর সাধারণ আবশ্যকীয় খরচপত্রের বেলায় সরকার যথেষ্ট ঔদার্য্য দেখাইয়া থাকেন,—সরকার তাঁহার সন্তানগণের শিক্ষার ব্যবস্থা করেন, তাঁহার ভারতে ও য়ুরোপে যাতায়াতের নানারূপ খরচ বহন করেন, সকল বিষয়েই তাঁহারা যাহাতে স্বচ্ছন্দে থাকিতে পারেন, তাহার জন্য ভূরি ভূরি অর্থ ব্যয় করেন। কিন্তু সরকার যখন একজন আদালত বা ডাকের পিয়ন, রেলের কুলী বা সিগনেলার বা একজন আর্দ্দালীর মাহিয়ানা ঠিক করেন, তখন পূর্ব্বোক্ত সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ত দূরের কথা, এমন কি, উহাদের স্ত্রী ও নাবালক পুত্র কি উপার্জ্জন করে, তাহা পর্য্যন্ত গণনায় ধরিয়া থাকেন। শারীরিক পরিশ্রম ও মানসিক পরিশ্রম এবং বিভিন্ন প্রকার কার্য্যের মধ্যে যে তারতম্য আছে, তাহা আমি অস্বীকার করি না। কিন্তু সে তারতম্য কি এতই বৃহৎ, এতই গুরুতর যে, মানুষের সাধারণ জীবিকানির্ব্বাহোপযোগী ব্যাপারেও এরূপ অমানুষিক ও নৃশংস বৈষম্যের সৃষ্টি করিতে হইবে?”

শিক্ষা বিষয়ে লালাজীর অনুরাগ ও কার্য্যের কথা আমরা পূর্ব্বেই অনেকটা উল্লেখ করিয়াছি। বর্ত্তমান ভারতে যে সকল শিক্ষা-প্রচারক আছেন, তাঁহাদের মধ্যে লালা লজপৎ রায় সকলের শীর্ষস্থানীয়। বস্তুতঃ রাজনীতি অপেক্ষা শিক্ষাপ্রচারই লালাজীর নিকট অধিক প্রিয় কার্য্য। লাহোরের ‘দয়ানন্দ এংলোবৈদিক কলেজের’ প্রতিষ্ঠা ও উন্নতিকল্পে তিনি যে সমস্ত কার্য্য করিয়াছেন, তাহা পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে। তিনি বহু বৎসর দয়ানন্দ কলেজের ভাইস প্রেসিডেণ্ট ও সম্পাদক ছিলেন।

এতদ্ব্যতীত তিনি দয়ানন্দ কলেজের উচ্চশ্রেণীর ছাত্রগণকে বহুবৎসর ইতিহাস শিক্ষা দিয়াছেন। তিনি স্বোপার্জ্জিত বহু অর্থ দয়ানন্দ কলেজের উন্নতির জন্য ব্যয় করিয়াছেন। তিনি জলন্ধরের এংলো-সংস্কৃত স্কুলের সেক্রেটারী ছিলেন এবং আর্য্যসমাজের বহু বিদ্যালয়ের কার্য্য-নির্ব্বাহক সমিতির সদস্য ছিলেন।

কিছুদিন হইল, লালাজী লাহোরে একটি অভিনব বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। বিদ্যালয়ের নাম "তিলকরাষ্ট্রীয় বিদ্যালয়" (The Tilak School of Politics)। এই বিদ্যালয়ে রাষ্ট্রনীতি, সমাজনীতি, অর্থনীতি, সংবাদপত্র পরিচালন প্রভৃতি বিদ্যা শিক্ষা দেওয়া হয়। এই বিদ্যালয়ের প্রধান উদ্দেশ্য—ভারতের রাজনীতিক কর্ম্মী গঠন করা। এই বিদ্যালয়ের সহিত সরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনই সম্পর্ক নাই। এই বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিয়া লালাজী যে দেশের প্রভূত উপকারসাধন করিয়াছেন, তাহাতে সন্দেহ নাই।

শিক্ষা বিষয়ে প্রবল অনুরাগের ফলেই লালাজী দুইবার করিয়া আমেরিকায় গমন করেন। তিনি যুক্তরাষ্ট্রের অধিকাংশ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলি বিশেষভাবে পর্য্যবেক্ষণ করেন এবং দেশে ফিরিয়া আসিয়া তথাকার শিক্ষাপ্রণালী ভারতের উপযোগী করিয়া ভারতের শিক্ষানুষ্ঠান-সমূহে প্রয়োগ করিতে প্রয়াস পায়েন। লালাজী পঞ্জাব জাতীয় শিক্ষা-পরিষদের সভাপতি, এ কথা যথাস্থানে উল্লিখিত হইয়াছে।

লালা লজপৎ রায় জীবনে অনেক অর্থ উপার্জ্জন করিয়াছেন, কিন্তু ইহার সমস্তই তিনি দেশের সেবায় ব্যয় করিয়াছেন। তিলক রাষ্ট্রীয় বিদ্যালয়ের জন্য তিনি ৩০,০০০ টাকা দান করিয়াছেন। ১৯১৩ খৃষ্টাব্দের আগষ্টমাসে বর্দ্ধমান বিভাগের ভীষণ বন্যা-পীড়িত ব্যক্তিগণের সাহায্যার্থে এক হাজার টাকা দান করেন। ১৯১৪ খৃষ্টাব্দের নবেম্বর মাসে আর্য্যসমাজের কলেজ বিভাগের উন্নতিকল্পে ৫০ হাজার টাকা, ভারতের উপেক্ষিত সম্প্রদায়-সমূহের উন্নতির জন্য ৩০ হাজার টাকা এবং স্বীয় জন্মভূমিতে

লোকান্তরিত পিতার নামে একটি বিদ্যালয় স্থাপনোদ্দেশ্যে ১০ হাজার টাকা দান করিয়াছেন। তিলক স্বরাজভাণ্ডারেও ইনি বহু অর্থ দান করিয়াছেন। বস্তুতঃ লালাজীর ন্যায় দানশীল ও ত্যাগবীর সমগ্র ভারতে বিরল। দেশ ও দেশবাসীর জন্য সর্বস্ব দান করিয়া আজ ইনি সন্ন্যাসীর বেশ গ্রহণ করিয়াছেন।

লালা লজপৎ রায় একজন প্রথম শ্রেণীর বক্তা। কি ইংরাজী, কি উর্দ্দুতে তাঁহার বক্তৃতাশক্তি অদ্বিতীয়। বিশেষতঃ উর্দ্দু বক্তৃতায় তাঁহার সমকক্ষ বর্ত্তমান ভারতে কেহ আছে বলিয়া মনে হয় না। তাঁহার জ্বালাময়ী বক্তৃতা চতুর্দ্দিকে অগ্নিবর্ষণ করে, তাঁহার প্রতি অক্ষর হইতে লাভা-প্রবাহ বিস্ফুরিত হয়। তাঁহার কণ্ঠস্বর জলদনাদের ন্যায় সমগ্র বক্তৃতা-মণ্ডপকে প্রতিধ্বনিত করে। তিনি যাহা বলেন, সমগ্র মনপ্রাণ দিয়া বলেন, তাঁহার বক্তৃতা শ্রোতার মর্ম্মস্থলে প্রবেশ করিয়া অপূর্ব্ব উদ্দীপনার সৃষ্টি করে।

লালা লজপৎ রায় একজন উঁচুদরের সাহিত্যিক। তাঁহার ন্যায় নানা বিষয়ে প্রগাঢ় পণ্ডিত ব্যক্তি বর্ত্তমান ভারতে অধিক নাই। উর্দ্দু সাহিত্যে তাঁহার স্থান অতি উচ্চে। তিনি উর্দ্দু ভাষায় শ্রীকৃষ্ণ, শিবাজী, ম্যাটসিনি, গ্যারিবল্ডি ও স্বামী দয়ানন্দের জীবনচরিত প্রণয়ন করিয়াছেন। ঐ সব গ্রন্থ পঞ্জাবে অতিশয় আগ্রহের সহিত পঠিত হয়।

তাঁহার লেখাও খুব সরস। তাঁহার লিখিত উর্দ্দু পুস্তকগুলির বহুল প্রচারই তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। তিনি ভারত, ইংলণ্ড ও আমেরিকার সাময়িক পত্র-সমূহে অনেক প্রবন্ধ লিখিয়া আসিতেছেন, তাহাতে তাঁহার রচনা-নৈপুণ্য ও প্রগাঢ় পাণ্ডিত্যের পরিচয় পাওয়া যায়। রাষ্ট্র, সমাজ, ধর্ম্ম, শিক্ষা প্রভৃতি নানা বিষয়ে তিনি প্রবন্ধ লিখিয়া থাকেন। কলিকাতার “মডার্ণ রিভিউ” পত্রের তিনি একজন নিয়মিত লেখক। তিনি সংবাদপত্রপরিচালনে সিদ্ধহস্ত। তিনি বর্ত্তমানে উর্দ্দুতে একখানা

মাসিক পত্র, এবং "বন্দে মাতরম্" নামে একখানা দৈনিক সংবাদপত্র পরিচালন করিতেছেন।

লালাজী ইংরাজীতেও কয়েকখানা উৎকৃষ্ট গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন। তিনি ইংরাজীতে তাঁহার সহকর্ম্মী স্বর্গীয় গুরুদত্ত বিদ্যারথীর একখানা জীবনচরিত লিখিয়াছেন। তিনি ইংরাজী ভাষায় আর্য্যসমাজের একখানা সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ইতিহাস লিখিয়াছেন।

লালাজীর ইংরাজী গ্রন্থসমূহের মধ্যে "আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র" নামক গ্রন্থ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই গ্রন্থে তিনি তাঁহার দীর্ঘকাল আমেরিকা প্রবাসের অভিজ্ঞতা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। আমেরিকায় অবস্থানকালে লালাজী আমেরিকার শিক্ষা, সমাজ, রাষ্ট্র, অর্থনীতি প্রভৃতি সম্পর্কীয় প্রতিষ্ঠানগুলি বিশেষভাবে পর্য্যবেক্ষণ করেন। তিনি তাঁহার গ্রন্থে ঐ সকলের বিবরণ প্রদান করিয়াছেন, এবং তৎসম্পর্কে সমস্যাগুলি বিস্তৃতভাবে আলোচনা করিয়াছেন। ঐ সকল সমস্যার সহিত তুলনায় তিনি ভারতীয় সমস্যাগুলিরও আলোচনা করেন। গ্রন্থের ভূমিকায় লালাজী এক স্থানে লিখিয়াছেন,—"আমাদের ভারতবর্ষে যে সকল সমস্যা বিদ্যমান, যুক্তরাষ্ট্রের সমস্যাগুলি অনেকটা সেই ধরণের। আমেরিকাবাসিগণ যে প্রণালীতে তাঁহাদের সমস্যা-সমাধানের চেষ্টা করিতেছেন, সেই সকল প্রণালী ভারতের সমস্যা-সমাধানেও কার্য্যকরী হইবে, ইহাই আমার বিশ্বাস। এই জন্যই আমি ঐগুলি বিশদভাবে আলোচনা করিয়াছি।"

বাস্তবিক লালাজী আমেরিকার শিক্ষাসমস্যা, নিগ্রোসমস্যা, স্ত্রীসমস্যা, ধর্ম্মসমস্যা ও জাতিসমস্যা প্রভৃতি বিষয়ে যে সকল সুচিন্তিত ও সুযুক্তিপূর্ণ আলোচনা করিয়াছেন, দেশের কল্যাণকামী ভারতবাসীমাত্রেরই তাহা বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য।

আমেরিকায় অবস্থানকালে লালাজী একবার ফিলিপাইন দ্বীপে গমন করেন। লালাজী তাঁহার গ্রন্থে ফিলিপাইন দ্বীপ ভ্রমণের অভিজ্ঞতাও লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। ফিলিপাইন দ্বীপ মাত্র ২০ বৎসর যাবৎ

আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের শাসনাধীনে আসিয়াছে। ফিলিপাইনগণ পূর্ব্বে অর্দ্ধসভ্য ছিল, কিন্তু মাত্র ২০ বৎসরের মার্কিণশাসনফলে তাহারা শিক্ষা, সমাজ, রাষ্ট্র প্রভৃতি বিষয়ে অত্যদ্ভুত উন্নতি লাভ করিয়াছে। ভারতবাসী ও ফিলিপাইনগণের শিক্ষাবিষয়ে তুলনা করিলে অদ্ভুত তারতম্য পরিলক্ষিত হয়। যুক্তরাষ্ট্রের শাসনাধীন ফিলিপাইন দ্বীপে ১০ বৎসরের উর্দ্ধবয়স্ক স্ত্রী-পুরুষ শতকরা ৭০ জন (অর্থাৎ হাজারে ৭০০ জন) লিখিতে পড়িতে পারে। আর ব্রিটিশ-শাসনাধীন ভারতে শতকরা ১০॥ জন (অর্থাৎ হাজারে ১০৫ জন) এবং স্ত্রী শতকরা ১ জন (অর্থাৎ হাজারে ১০ জন) লিখিতে পড়িতে পারে। অথচ ভারতের সভ্যতা ফিলিপাইন সভ্যতা হইতে হাজার হাজার বৎসর প্রাচীন, আর ভারতে ইংরাজগণ ১৬০ বৎসর যাবৎ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গঠন করিয়া আসিতেছেন। পাঠক, দুইটি ছবির তুলনা করুন দেখি।

পরিশিষ্ট। [ক]

ভারত কি চায়?

লালা লজপৎ রায়।

ভারত চায়:—

১। এমন পিতা-মাতা, যাঁহারা ভালবাসিবেন এবং শিক্ষা দিবেন কিন্তু অন্যায় আদেশ করিবেন না।

২। এমন শিক্ষক, যিনি ছাত্রগণকে স্বাধীনভাবে ভাবিতে শিক্ষা দিবেন, এবং ছাত্রগণের নিকট হইতে এরূপ আশা করিবেন না যে, তাঁহার বাক্যই তাহারা বেদবাক্য বলিয়া মানিয়া লইবে।

৩। এমন নেতা, যাঁহারা পরিচালন করিবেন, কিন্তু আদেশ করিবেন না।

৪। এমন বন্ধু, যিনি বন্ধুর ব্যক্তিগত মতের প্রতি শ্রদ্ধা দেখাইবেন, এবং বন্ধুর সহিত মত ও স্বার্থের বিরোধসত্ত্বেও তাঁহাকে অকুণ্ঠভাবে সাহায্য করিবেন।

৫। এমন প্রচারক, যিনি কেবল সিদ্ধান্তই প্রচার করিবেন না।

৬। এমন ধর্ম্মযাজক, যাঁহারা শিষ্যগণকে মেষপালের মত তাঁহাদের অনুসরণ করিতে উপদেশ দিবেন না।

৭। এমন স্বামী, যিনি স্ত্রীকে ভালবাসিবেন, সাহায্য করিবেন, এবং সেবা করিবেন, কিন্তু স্ত্রীর উপর অত্যাচার করিবেন না, বা স্ত্রীর ব্যক্তিত্বের উপর হস্তক্ষেপ করিবেন না।

৮। এমন স্বদেশপ্রেমিক, যাঁহারা খোসা ছাড়িয়া শাঁসের অনুসরণ করিবেন।

৯। এমন যুবক, যাঁহারা পার্থিব লাভালাভের চিন্তা দূর করিয়া মনুষ্যত্ব, সংযম ও আত্মসম্মানের প্রতি দৃষ্টি রাখিবেন, যাঁহারা সেবা করিবার এবং দুঃখভোগ করিবার সুযোগ অন্বেষণ করিবেন, যাঁহারা বাধাবিঘ্ন তুচ্ছ করিয়া দেশের ও দশের কাজে অগ্রণী হইবেন।

১০। এমন স্ত্রী, যিনি স্বামীর প্রতি শ্রদ্ধা ও ভালবাসা দেখাইবেন, কিন্তু নিজকে কখনই সামান্যা দাসী বা সন্তানোৎপাদক যন্ত্রের স্থানীয় হইতে দিবেন না।

১১। এমন শাসক, যাঁহারা নিজেরা শাসন করিবেন না, কিন্তু প্রজাগণকে স্বায়ত্তশাসনে উৎসাহিত করিবেন।

১২। এমন প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তা, যিনি নিজের গুরুত্ব ও সম্মানের কথা ভাবা অপেক্ষা প্রজার কল্যাণ, অধিকার ও ন্যায়বিচারের কথাই অধিক ভাবিবেন।

১৩। এমন রাজপ্রতিনিধি, যিনি গ্রেট ব্রিটেনের চিন্তা অপেক্ষা ভারতের চিন্তাই অধিক করিবেন।

১৪। এমন জমিদার, যিনি নিজের স্বার্থচিন্তা অপেক্ষা প্রজার কল্যাণ-চিন্তাই অধিক করিবেন।

১৫। এমন শিক্ষাপ্রচারক, যাঁহারা গুরুগিরি অপেক্ষা মনুষ্যত্বের অধিক উপাসক হইবেন।

১৬। এমন বক্তা, যাঁহারা বাগ্মিতা অপেক্ষা সংযম ও সত্যের প্রতি অধিক দৃষ্টি রাখিবেন।

১৭। এমন জননায়ক, যাঁহারা নিজের জন্য সম্মান, উপাধি বা জায়-গীরের চিন্তা করা অপেক্ষা সত্যের দিকে অধিক দৃষ্টি করিবেন।

১৮। এমন সংবাদপত্র-সম্পাদক, যাঁহারা ব্যক্তিগত ক্ষুদ্র ঈর্ষাদ্বেষ পরিত্যাগ করিয়া জনহিতকর কার্য্যের আলোচনা করিবেন।

১৯। এমন সংবাদদাতা, যাঁহারা ঘটনাকে নিজের ইচ্ছামত সাজা-ইতে চেষ্টা না করিয়া প্রকৃত যথার্থ ঘটনা লিখিতেই অধিক প্রয়াস পাইবেন।

২০। এমন প্রতিষ্ঠান, যাহাতে ব্যক্তিগত যশ, প্রতিপত্তি বা স্বার্থ-চিন্তা অপেক্ষা দেশের স্বার্থ ও কল্যাণ চিন্তাই অধিক করা হইবে।

কংগ্রেসের সভাপতি

লালা লজপৎ রায়ের অভিভাষণ ।

(কলিকাতা স্পেশাল কংগ্রেসের অধিবেশন, সেপ্টেম্বর ১৯২০)

চক্রবর্ত্তী মহাশয়, প্রতিনিধিবর্গ ও সমাগত ভদ্র মহোদয়গণ! আজ ভারতের এই মহা দুর্দ্দিনে ভীষণ গুরুতর সমস্যাসমূহের মীমাংসাকালে আপনারা আমাকে আপনাদের যে সর্ব্বোচ্চ সম্মানিত পদ প্রদান করিয়া এই সভাপতিত্বে বৃত করিয়াছেন, তাহার জন্য আপনাদিগকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করাই আমার সর্ব্বপ্রথম কর্ত্তব্য। ভারতের জাতীয়তার জন্মভূমি ও প্রসূতিস্বরূপ কলিকাতা নগরী চিরদিনই আমার পক্ষে পবিত্রতম। সেই পবিত্রতম কলিকাতা নগরীতে কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশনের সভাপতি হইয়াছি বলিয়া আমি নিজেকে আরও অধিক গৌরবান্বিত বলিয়া মনে করি। এই কলিকাতা নগরীতেই গত শতাব্দীতে প্রথম রাজনৈতিক আন্দোলনের সূত্রপাত হইয়াছিল এবং এই কলিকাতা নগরীর একজন বক্তাই [যাঁহাকে আমি ইংরাজ সাম্রাজ্যের সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট বক্তা বলিয়া মনে করি] উত্তর-ভারতে রাজনৈতিক আন্দোলন প্রচারে অগ্রণী হইয়াছিলেন। এই কলিকাতা নগরীতেই বঙ্গদেশের একজন পবিত্রতম মনীষী উচ্চতম শিক্ষিত সন্তান জাতীয়তার আদর্শ সর্ব্বপ্রথম প্রচার করেন এবং সেই আদর্শই আজ ভারতের আপামর জনসাধারণের আদর্শ বলিয়া গৃহীত হইয়াছে। সেই মনীষীই শ্রীঅরবিন্দ ঘোষ। আবার এই কলিকাতা নগরীতেই ভারতের সর্ব্বজন-সম্মানিত শ্রেষ্ঠ সন্তান অশীতিপর-বৃদ্ধ [পরলোকগত] দাদাভাই নৌরজী সর্ব্বপ্রথমে স্পষ্ট ভাষায় স্বরাজের আদর্শ ঘোষণা করিয়াছেন এবং সেই

আদর্শ সম্মুখে রাখিয়াই আমরা রাজনৈতিক আন্দোলন চালাইয়া আসিতেছি।

নিখিল ভারতীয় কংগ্রেস কমিটী যখন আমাকে এই কর্ত্তব্যভার প্রদান করিয়া সভাপতি হইবার জন্য নিমন্ত্রণ করিলেন, তখন আমার অনিচ্ছা সত্ত্বেও এই ভার গ্রহণ করিতে মনস্থ করিলাম। এ বিষয়ে বোধ হয় এক্ষণে কাহারও মতদ্বৈধ নাই যে, এখন আর আমাদের রাজনৈতিক আন্দোলন শুধু মৌখিক রাখিলে চলিবে না। আর আমরা শুধু প্রস্তাব, প্রার্থনা বা আবেদন লইয়া সন্তুষ্ট থাকিতে পারিব না। এখন আমরা আবেদনের পরিবর্ত্তে অধিকার প্রার্থনা করিতে শিখিয়াছি এবং যতক্ষণ না আমরা আমাদের ন্যায্য অধিকার প্রাপ্ত হই, ততক্ষণ শান্তভাবে যথারীতি আন্দোলনে বিরত হইব না। এই সময়ে দেশে দুর্জ্জয় সংগ্রামের দিন উপস্থিত হইয়াছে। দেশের কতকগুলি লোক প্রথমে বিপ্লব এই শব্দটি শুধু শুনিলেই খেপিয়া উঠেন। আমি সে দলের অন্তর্ভুক্ত নহি। শুধু কথায় আর আমাকে চঞ্চল করিতে পারে না। আজ যে এক মহা বিপ্লবের যুগ আমাদের সন্নিহিত হইতেছে বা শীঘ্রই হয় ত এই বিপ্লব অবশ্যম্ভাবী হইয়া পড়িবে, তাহা বলা বোধ হয় অত্যুক্তি হইবে না। এই বিপ্লব সর্ব্বব্যাপী, কিন্তু শান্ত প্রকৃতির। ধর্ম্ম, জ্ঞান, নীতি, শিক্ষা, সমাজ, অর্থ, রাজনীতি সকল বিষয়েই এই বিপ্লব আবদ্ধ হইয়াছে। আমাদের জাতি কিন্তু কখনও প্রকাশ্য বিদ্রোহের অনুকূল নহে। আমরা স্বভাবতই ধীরগামী। যখন কিন্তু আমরা অগ্রসর হইতে আরম্ভ করি, তখন প্রবলবেগেই অগ্রসর হইয়া থাকি। কোন জীবন্ত প্রতিষ্ঠানই সারাজীবন বিপ্লব ত্যাগ করিয়া থাকিতে পারে না। আমাদের জাতীয় ইতিহাসে ইহার অনেক প্রমাণ পাওয়া যাইবে। আমাদের শাসকগণই আজ আমাদিগকে এই বিদ্রোহ বিপ্লবের মধ্যে আনিয়া ফেলিয়াছেন। তাঁহারা আমাদের অসম্মতি ও অনিচ্ছা সত্ত্বেও দেশে ভীষণ রকমের অর্থনৈতিক পরিবর্ত্তন আনয়ন করিয়া আমাদের সামাজিক জীবনেও বিপ্লব আনয়ন

করিতেছেন। আমরা তাহা প্রার্থনা করি নাই বা তাহা কখনও ইচ্ছাও করি নাই। তাঁহারা তাঁহাদের স্বার্থ ও উপকারের জন্য এই সকল কার্য্য করিতেছেন।

অর্থনৈতিক পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষা, সংবাদপত্র, আইন, বিচারালয় প্রভৃতির আংশিক পরিবর্ত্তন করিয়া তাঁহারা আমাদের জীবনের গতিরোধ করিতেছেন। এ সকলের অধিকাংশই আমাদের ঈপ্সিত নহে; কিন্তু সমস্যা-সমাধানে সমর্থ না হইয়া তাঁহারা বা আমরা নিজেরাই এই সকল পরিবর্ত্তন করিতেছি। যাহাই হউক না কেন, বর্ত্তমান রাজনৈতিক সমস্যা আমাদের দেশের শাসকগণের ব্যবস্থার ফল এবং ইহা তাঁহাদেরই স্বেচ্ছাকৃত। ইহার জন্য যদি কেহ দোষী থাকেন, তবে তাহা আমাদের শাসক-সম্প্রদায় (অবশ্য, আমি কাহারো প্রতি দোষারোপ করিতে ইচ্ছা করি না)। তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই আমাদের দেশের উন্নতির পথ রোধ করিতে চাহেন। কিন্তু এখন আর তাহা তাঁহাদের আয়ত্তাধীন নহে। ইহা এখন আমাদের সম্পূর্ণ আয়ত্তাধীন হইয়াছে। আমরা এখন যে পথে চলিয়াছি, তাহা আমাদের ইচ্ছার সহিত করিতেছি কি না, জানি না।

পথেই আমরা অগ্রসর হইব, কিন্তু ভবিষ্যৎ চিরকালই অন্ধকারময়, কি যে ফল ফলিবে, তাহা আমরা জ্ঞাত নই। এই বিপ্লবের সমাধানের জন্য কোন প্রকার বিপ্লব বা বিদ্রোহ যে নিষ্প্রয়োজন, তাহা দেশের প্রত্যেক চিন্তাশীল ব্যক্তিই বলিয়া থাকেন। আমরা আমাদের ঈপ্সিত বস্তু (স্বায়ত্তশাসন) লাভ করিবার জন্য শান্তভাবে ও সততার সহিত আন্দোলন করিয়া যাইব এবং ইহা দ্বারা যাহাতে শাসক ও শাসিতগণের মধ্যে বন্ধুত্ব ও কাহারো স্বার্থ কখনও নষ্ট না হয়, সে বিষয়ে আমরা বিশেষ যত্নবান্ থাকিব। শাসকগণের মধ্যে এমন অনেক আছেন, তাঁহারা আমাদিগের উপর যথেচ্ছাচার করিয়া অস্ত্রবলে আমাদিগকে শাসন করিতে চাহেন। তাঁহারা মনে করেন, তাঁহাদের সৈন্যবল ও বুদ্ধিবলের দ্বারা আমাদিগের প্রতি অত্যাচার করিবার অধিকার তাঁহাদিগের আছে। ইংরাজ ও ভারতীয়

গণতন্ত্রের শক্তি এবং বিপ্লববাদী পশুশক্তি এই উভয় শক্তির মধ্যস্থলে পড়িয়া আমরা এখন ভীষণ সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়াছি, এই সংগ্রামে জয়ী হইতে হইলে আমাদিগের মনুষ্যত্ব ও শক্তির প্রয়োজন এবং যথাসাধ্য আত্ম-নির্ভরতা ও আত্মশক্তিতে বিশ্বাস প্রয়োজন। এই সময়ে আমাদের শান্ত ও ধীর বিচারশক্তি আবশ্যক এবং কার্য্যে ও বাক্যে আমাদিগকে সংযত হইতে হইবে।

লোকমান্য তিলক।

ভারতের এই ভীষণ দুর্দ্দিন ও কঠিন সমস্যার সময়ে লোকমান্য বাল-গঙ্গাধর তিলকের মত লোকের পরলোকগমন আমাদের পক্ষে কিরূপ ক্ষতি ও দুর্দ্দশাজনক, তাহা বোধ হয়, এখানে কাহাকেও বুঝাইয়া দিতে হইবে না। ঠিক যে সময়ে আমরা তাঁহার মত ধীর, বিচারশক্তিসম্পন্ন, অবিসংবাদী রাজভক্তিসম্পন্ন, দেশের একজন একনিষ্ঠ সেবকের আবশ্যক মনে করিতেছিলাম, সেই সময়ে বিধি তাঁহাকে আমাদিগের নিকট হইতে চিরদিনের মত বিচ্ছিন্ন করিয়া লইয়াছেন। ভারতের এই জাতীয় বিপদে দেশের আবালবৃদ্ধ জনসাধারণ শোক প্রকাশ করিয়াছেন; ভারতের এক-প্রান্ত হইতে অপরপ্রান্ত পর্য্যন্ত সকল শ্রেণীর ও সকল সমাজের লোক তাঁহাদের নেতার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিয়াছেন। তাঁহারা সরকারের মতামতের প্রতি দৃষ্টিপাত না করিয়া তাঁহাদের মনের মত করিয়া জাতীয় নেতার পরলোকগমনে যথোপযুক্ত শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিয়াছেন। যদিও ভারতের কোন কোন স্থানে এই নেতাকে মুসলমান-বিরোধী বলিয়া তাঁহার প্রতি সম্মান হ্রাস করিবার চেষ্টা হইয়াছিল, তথাপি আমাদের মুসলমান ভ্রাতৃবৃন্দ লোকমান্য তিলকের প্রতি হিন্দুমুসলমান-বিরোধ ভুলিয়া যথাসাধ্য ভক্তি ও শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিয়াছেন। শাসক-সম্প্রদায়ের মধ্যে অনেকেও বেশ সুবিবেচনার সহিত যথাকর্ত্তব্য সম্পাদন করিয়াছেন।

দেশের যে ভীষণ ক্ষতি উপস্থিত হইয়াছে, আমাদের জাতীয় মহাসমিতির ক্ষতি তাহা অপেক্ষাও ভীষণতর। আজ যে এই জাতীয় আন্দোলন আমাদের দেশে এত বিস্তৃতি লাভ করিয়া দেশের সর্ব্বসাধারণকে দেশহিতৈষিতায় প্রণোদিত করিতেছে, সেই জাতীয় আন্দোলনের উন্নতির জন্য যিনি সারাজীবন অক্লান্ত পরিশ্রমে আত্মোৎসর্গ করিয়া গিয়াছেন, তাঁহার মৃত্যুতে কংগ্রেসের ক্ষতি অনিবার্য্য। লোকমান্য তিলকের প্রতি যথোচিত সম্মান প্রদর্শনের জন্য প্রস্তাব উপস্থিত করা আমাদের এই জাতীয় মহা সমিতির বিশেষ অধিবেশনের সর্ব্বপ্রথম কার্য্য।

জাতীয় সমস্যা।

অমৃতসর কংগ্রেসে স্থির হয়, হাণ্টার কমিটী যে রিপোর্ট দিয়াছেন এবং পঞ্জাব হাঙ্গামা সম্বন্ধে সরকার যে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, উহাতে একটি বিশেষ কংগ্রেসের অধিবেশন করিতে হইবে। অমৃতসর কংগ্রেসের পর দেশের লোকের সম্মুখে আর এক মহা সমস্যা উপস্থিত। সেটি হইতেছে—খেলাফৎ সমস্যা। তুর্কী সন্ধিতে আমাদের মুসলমান ভ্রাতারা কিরূপ মনঃক্ষুণ্ণ ও অসন্তুষ্ট হইয়াছেন, তাহা সকলেই জানেন। সুতরাং পঞ্জাব ব্যাপারের সঙ্গে সঙ্গে সেটিও একটি মহাসমস্যা। পরিশেষে সংস্কার আইনের নিয়মাবলী কি প্রকার হইবে, ইহাও এক ঘোর সমস্যার বিষয়। কেন না, ইহার উপরই সংস্কার আইনের সাফল্য নির্ভর করিতেছে। এই সকল সমস্যার মীমাংসার নিমিত্তই এই বিশেষ কংগ্রেসের অধিবেশন হইয়াছে।

পঞ্জাব হাঙ্গামা।

প্রথমেই পঞ্জাবের হাঙ্গামার কথাই ধরা যাউক। অমৃতসর কংগ্রেসের পর কংগ্রেস কমিটীর পঞ্জাব রিপোর্ট প্রকাশিত হইয়াছে। সরকারের নিযুক্ত হাণ্টার কমিটির রিপোর্টও প্রকাশিত হইয়াছে। পরন্তু বৃটিশ মন্ত্রিসভা ভারত-সরকার ঐ রিপোর্টের উপর নির্ভর করিয়া তাঁহাদের সিদ্ধান্ত

প্রকাশ করিয়াছেন। হাণ্টার রিপোর্ট সকল সভ্যের দ্বারা অনুমোদিত রিপোর্ট নহে, উহার ভারতীয় সভ্যেরা সংখ্যায় অধিক য়ুরোপীয়ান সভ্যগণ হইতে স্বতন্ত্র মত প্রকাশ করিয়াছেন। ভারত-সরকারের সকল শাসক সভ্যেরাও সিদ্ধান্ত দিবার কালে একমত হইতে পারেন নাই। সার শঙ্করণ নায়ার সরকারের একমাত্র ভারতীয় সভ্য ছিলেন, তিনি হাণ্টার কমিটীর মাইনরিটি রিপোর্টের সহিত একমত হইয়াছিলেন। দেশের আবাল-বৃদ্ধ বনিতা একযোগে হাণ্টার কমিটীর মেজরিটি রিপোর্টের এবং সরকারের সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ করিয়াছেন। এখন আমাদের এই বিশেষ কংগ্রেসের অধিবেশনে এই বিষয়ে দেশের লোকমত কেন্দ্রীভূত করিতে হইবে এবং পঞ্জাব অনাচারের প্রতিকারের জন্য আমাদিগের কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করিতে হইবে।

অনাচারের মূল।

যদি বলা যায়, পঞ্জাবের এই ঘোর অনাচারের মূল কে? তাহা হইলে একবাক্যে বলিতে হইবে, সার মাইকেল ওডয়ার। পঞ্জাবে ওডয়ার, জনসন, স্মিথ প্রভৃতির আবির্ভাব ও লীলা সম্ভব হইয়াছিল। সার মাইকেলের প্রুশীয় শাসননীতির জন্য পঞ্জাবে সামরিক শাসনের অনুরূপ শাসন বহুদিন হইতেই চলিয়া আসিতেছে। পঞ্জাবের দুর্ভাগ্য, পঞ্জাব উত্তরপশ্চিম সীমান্তের পার্শ্বে অবস্থিত। সার মাইকেল সেই শাসন আরও কঠোর করিয়া তুলেন। সার মাইকেল নিজের 'হামবড়া ভাবটা' খুব বাড়াইয়াছিলেন। দরবার করিয়া এবং নজর লইয়া সার মাইকেল এদেশে স্বায়ত্তশাসন ব্যাপারটাকে কল্পনা বলিয়া উড়াইয়া দিয়াছিলেন। সংবাদপত্রের স্বাধীনতার উপর হস্তক্ষেপ করিয়াছিলেন। তিনি পঞ্জাবে এক্সিকিউটিভ কাউন্সিল প্রতিষ্ঠার ঘোর বিপক্ষে ছিলেন। তিনি রাউলট কমিটিকে ঘোর কুপরামর্শ দিয়াছিলেন। তিনি ভারতরক্ষা আইনের

ঘোর অসদ্ব্যবহার করিয়াছিলেন। তিনি পঞ্জাব হইতে জাতীয় দলের নায়ক ও সংবাদপত্র নির্ব্বাসন করিয়াছিলেন। তিনি গাধর ও অন্যান্য হাঙ্গামাকালে অম্লানবদনে মিথ্যা কথা বলিয়াছিলেন। তিনি বড়লাটের ব্যবস্থাপক সভায় দাঁড়াইয়া বক্তৃতার মুখে শিক্ষিত ভারতবাসী মাত্রকেই ঘোর অপমান করিয়াছিলেন, তজ্জন্য তাঁহাকে ক্ষমা প্রার্থনা করিতে হইয়াছিল। সংস্কার আইন সম্পর্কে তাঁহার মন্তব্যে [memorandum] শিক্ষিতবিদ্বেষ প্রকাশ পাইয়াছে। পরন্তু উহাতে তিনি পঞ্জাবে পুনরায় রাজনীতিক আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছে বলিয়া দুঃখ প্রকাশ করিয়াছেন।

হাঙ্গামার মূল কারণ।

কিন্তু সার মাইকেল যতই চেষ্টা করুন পঞ্জাবে রাজনীতিক আন্দোলন উত্তরোত্তর বৃদ্ধিই পাইতে লাগিল। লর্ড চেম্‌স্‌ফোর্ড ও মিঃ মণ্টেগু যখন সংস্কার আইনের খসড়া বিল প্রস্তুত করিলেন, তখন সার মাইকেলের আর ক্রোধের সীমা রহিল না। সর্ব্বাপেক্ষা তাঁহার মনের কষ্ট এই যে, তিনি পঞ্জাবের রাজনীতিক জীবন নষ্ট করিবার এত চেষ্টা করিলেও পঞ্জাবের শিক্ষিতেরা রাজনীতিচর্চ্চা হইতে বিরত হন নাই। তাঁহারা লাহোরে সভা করিলেন, প্রাদেশিক কনফারেন্স বসাইলেন, বোম্বাই ও দিল্লী কংগ্রেসে যোগদান করিলেন এবং পর বৎসরের জন্য অমৃতসরে কংগ্রেস আহ্বানকালে জলন্ধরে এক প্রাদেশিক কনফারেন্স বসাইবার সঙ্কল্প করিলেন ও সংস্কার আইন সম্বন্ধে সংশোধন পরিবর্ত্তনের নিমিত্ত লালা হরকিষণকে প্রেসিডেন্ট করিয়া বিলাতে ডেপুটেশন প্রেরণ করিতে মনস্থ করিলেন। ইহাই হইল কাল। ১৯১৯ সালের এপ্রেল ও মে মাসে সার মাইকেল যে শাসননীতি প্রবর্ত্তন করেন, উহা এই সমস্ত রাজনীতিক আন্দোলনের বিপক্ষে নিয়োজিত হইল।

রাউলাট আইনের বিপক্ষে আন্দোলন তাঁহাকে অত্যাচার অনুষ্ঠান করিবার সুযোগ প্রদান করিল। তিনি পঞ্জাবের লাটগিরি ছাড়িয়া

চলিয়া যাইতেছিলেন, সুতরাং সেই স্বল্পসময়ের মধ্যে দেশের রাজনীতিক আন্দোলন চিরতরে বন্ধ করিবার জন্ত রীতিমত উদ্যোগ আয়োজন করিলেন। ইহাই পঞ্জাব হাঙ্গামার মূল কারণ। প্রথমেই তিনি অমৃতসরে কংগ্রেস আহ্বানকারী পঞ্জাবী নেতা ডাক্তার কিচলু ও সত্যপালকে নির্ব্বাসিত করেন। যদি এই নির্ব্বাসন-দণ্ডাজ্ঞা প্রচারিত না হইত, তাহা হইলে পঞ্জাব হাঙ্গামা ঘটিত না।

অনাচার।

সার মাইকেল এই সময়ে পঞ্জাবে এক ষড়যন্ত্র আবিষ্কার করিয়া ফেলিলেন এবং লালা হরকিষণপ্রমুখ দেশনায়কগণকে ইহার পৃষ্ঠপোষক বলিয়া ধারণা করিয়া অত্যাচারের সূত্রপাত করিলেন। মার্শাল আইন জারী হইল। মার্শাল আইন কমিশনরেরা ষড়যন্ত্র ঘটিয়াছে বলিয়া আইন অনুসারে ধার্য্য করিয়া লইলেন, এবং তদনুযায়ী বিচার করিতে লাগিলেন, ইহাতেই পঞ্জাব অনাচারের প্রবর্ত্তন হইল। হাণ্টার কমিটী সাক্ষ্যাবলী লইয়া স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, 'পঞ্জাব হাঙ্গামার মূলে পূর্ব্ব হইতে গঠিত কোনও ষড়যন্ত্র ছিল না।' অথচ মার্শাল আইনের বিচারে কত লোক প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত, কত লোক নির্ব্বাসিত এবং কত লোক কারাদণ্ডে দণ্ডিত ও অন্যপ্রকারে লাঞ্ছিত অবমানিত হইল। কিন্তু মার্শাল আইনের আবশ্যকতা না থাকিলেও ইহা বহুদিন বাহাল রাখিতে হইল। ভারত সরকার কোন কোনও স্থলে মার্শাল আইন বাহাল রাখা যুক্তিসঙ্গত বলিয়া মনে করেন নাই। এমন কি, হাণ্টার কমিটীর মেজরিটি রিপোর্টেও মার্শাল আইন বাহাল রাখার বিপক্ষে মন্তব্য প্রকাশিত হইয়াছে। রিপোর্ট স্পষ্ট বলিয়াছেন, "ভারতবর্ষ শত্রুর দেশ নহে, সুতরাং এখানে এমন কঠোর ভাবে এতদিন মার্শাল আইন বাহাল রাখা অন্যায় হইয়াছে।" কিন্তু পঞ্জাবের ব্যুরোক্রেশীর মার্শাল আইন বাহাল রাখায় স্বার্থ ছিল, অনাচার

অত্যাচার করিয়া দেশবাসীর রাজনীতিক মেরুদণ্ড ভঙ্গ করাই তাঁহাদের উদ্দেশ্য ছিল। সার মাইকেল এই সমস্ত অনাচারের মূল। তিনি যদি সামরিক আইন সম্পর্কিত বিচারকগণকে দমনে রাখিতেন, তাহা হইলে এত অনাচার অনুষ্ঠিত হইত না। যে সকল ভীষণ অনাচার (সাক্ষ্য গ্রহণের জন্য) অনুষ্ঠিত হইয়াছিল, তাহা স্মরণ করিলে এখনও হৃদয় কাঁপিয়া উঠে। তাহার পর সামরিক আইনের বিচার মোটের উপর ২৫৫৭ জনের এই আইনে বিচার হয়, তন্মধ্যে ১০৮৪ জন দণ্ডিত হইয়াছিল। অর্থাৎ শতকরা ৭২ জন দণ্ডিত সাধারণ আদালতের বিচারের সহিত ইহার তুলনা করিলে শরীর শিহরিয়া উঠে। মার্শাল আইন জারী না হইলে এরূপ বিচার হইত না, বিচারকরা সারা ভারতব্যাপী ষড়যন্ত্রের ধারণা দ্বারা পূর্ব্ব হইতেই স্থির সিদ্ধান্ত না হইলে দণ্ডও এরূপ হইত না।

জালিয়ানওয়ালা

জালিয়ানওয়ালার ব্যাপারটা একটা স্বতন্ত্র বৃহৎ ব্যাপার। জেনারল ডায়ারের নিজের সাক্ষ্যই এই অমানুষিক হত্যাকাণ্ডের অন্যতম প্রধান সাক্ষ্য। অথচ সার মাইকেল ওডয়ার ইহার সম্পূর্ণ সমর্থন করিয়াছেন। সার মাইকেল বিলাতে গিয়া নিজপক্ষ সমর্থন জন্য অনেক মিথ্যা কথা বলিয়াছেন।

সরকারের কথা।

সরকার বলিয়াছেন, "রৌলট আইনের বিপক্ষে আন্দোলন পঞ্জাব হাঙ্গামার মূল কারণ, ইহা সত্যাগ্রহ আন্দোলনের সহিত যুক্ত হইয়া দোষগ্রস্ত হইয়াছিল। আন্দোলনটা ইংরেজ বিদ্বেষ ও সরকার বিদ্বেষ-মূলক, জালিয়ানওয়ালায় কঠোর ব্যবস্থা লওয়া হইয়াছিল, নতুবা সংখ্যায় অল্প ইংরাজের বিপদ ঘটিত, ইত্যাদি।"

এই সকল যুক্তির সারবত্তা নাই। যদি এ কথাটা মানিয়া লওয়া যায় যে, ভারতে ইংরাজরাজত্ব পশুবলের উপর নির্ভর করে না, ভারতবাসীর সন্তোষ ও অনুমতির উপর নির্ভর করে, তাহা হইলেই বুঝা যাইবে, রাউলট আইন পাশ করা অন্যায় হইয়াছে। সেই আন্দোলন বন্ধ করিতে অনাচার অনুষ্ঠান করা অন্যায় হইয়াছে, মার্শাল আইন জারী করা অন্যায় হইয়াছে, সত্যাগ্রহ আন্দোলনটিকে দোষযুক্ত বলা অন্যায় হইয়াছে, দেশনায়কগণকে নির্ব্বাসন বা কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা অন্যায় হইয়াছে। এইরূপ অবস্থায় দেশের লোক যে বড়লাটকে বিলাতে ফিরাইয়া লইবার কথা বলিতেছেন, তাহা বেশ ন্যায় ও সুবিবেচনার কার্য্য হইয়াছে।

শঙ্করণ নায়ার।

ভারত গভর্ণমেণ্টের কথা বলিতে হইলে আমাদের স্বনামখ্যাত দেশনেতা সার শঙ্করণ নায়ার গভর্ণমেণ্টের পঞ্জাবনীতির বিরুদ্ধে যে সকল কথা বলিয়াছেন, তাহা উল্লেখ না করিলে অন্যায় হইবে। তিনি স্বদেশহিতৈষণায় প্রণোদিত হইয়া পঞ্জাবের অত্যাচারের জন্য যে উচ্চপদ হইতে পদত্যাগ করিয়াছেন, তাহার জন্য ভারতে যতদিন মনুষ্যত্ব থাকিবে, ততদিন কেহ উহা বিস্মৃত হইতে পারিবেন না। তাঁহার এই কার্য্যের জন্য ভারতবাসিগণ চিরদিনই গর্ব্ব অনুভব করিবেন সন্দেহ নাই।

বর্ণনা বিস্তৃত নহে।

ভ্রাতা-ভগিনীগণ, আমি এই পঞ্জাবের কথা শেষ করিবার পূর্ব্বে আপনাদিগকে জানাইতেছি যে, আমার বর্ণনা একটুও বিস্তৃত হয় নাই। স্থান ও সময় অভাবে আমি অনেক কথাই বাদ দিয়াছি এবং আমার মনে হয়, এখনও অনেক প্রধান প্রধান ঘটনা অপ্রকাশিত রহিয়াছে, কংগ্রেস তদন্তসমিতি যে পর্য্যন্ত অনুসন্ধান করিয়াছেন, পঞ্জাব কংগ্রেস কমিটী

তাহার পর হইতে আরও অনুসন্ধান করিবার ভার গ্রহণ করিয়াছেন। তাহা যদি সুসম্পন্ন হয়, তবে আমরা পঞ্জাব অনাচারের একখানি বিস্তৃত ইতিহাস পাইতে পারিব। পঞ্জাব অনাচারজনিত সুফলগুলি আমি এখানে উল্লেখ না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। কিছুদিনের জন্ম স্যার মাইকেল ওডয়ার পঞ্জাবীগণকে ভয় দেখাইয়াছিলেন বটে, কিন্তু এই দুর্ঘ-টনা শেষ হইবার পরই তাঁহারা আবার নববলে বলীয়ান্ হইয়াছেন। যাঁহাদিগকে কারারুদ্ধ করিয়া পীড়ন করা হইয়াছিল, তাঁহারা বীরের মত তাহা সহ্য করিয়াছেন এবং তাঁহাদের পরিত্যক্ত নারী ও বালকবালিকাগণ সেই দুর্ভাগ্য সাহসের সহিত সহ্য করিয়াছেন।

রতন দেবী।

ভারতীয় নারীত্বের সম্মান চিরকালের জন্য সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়া রতন দেবী জেনারেল ওডয়ারের আদেশ অমান্য করিয়া জালিয়ানওয়ালা-বাগে সারারাত্র তাঁহার মৃত স্বামীর পার্শ্বে উপস্থিত ছিলেন।

লালা হরকিষণলাল।

যে সরকারের লোক যে সকল লোকের প্রতি অন্যায় অত্যাচার করিয়া-ছিল, তাহাদিগের মধ্যে একজন শান্ত স্থিরভাবে সাহসিকতার সহিত আত্মসম্মান ও আত্মমর্য্যাদা অক্ষুন্ন রাখিয়া ভবিষ্যৎ বিপদকে অগ্রাহ্য করিয়া তাঁহার দেশবাসিগণের নিকট যে সম্মান অর্জ্জন করিয়াছেন, তাহা তাঁহাকে চিরকাল ভারতে অমর করিয়া রাখিবে। এই ব্যক্তিই যে লালা হর-কিষণলাল, তাহা বোধ হয় কাহাকেও বলিয়া দিতে হইবে না।

সামরিক আইনের অত্যাচার সহ্য করার পর পঞ্জাব আজ আরও অধিক পবিত্র, দৃঢ়, উন্নত, প্রতিজ্ঞাবদ্ধ, স্বদেশহিতৈষী এবং সম্মিলিত হই-য়াছে। যে মুসলমানগণ এতদিন অনুন্নত বলিয়া খ্যাত ছিলেন, তাঁহারা আজ হিন্দু ভ্রাতৃগণের সহিত সম্মিলিত হইয়া তাঁহাদিগের তেজস্বিতার

পরিচয় প্রদান করিতেছেন এবং শিখগণও আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা একত্র হইয়া সাধ্যমত আন্দোলন আরম্ভ করিয়াছেন। তাহাদিগের রাজনৈতিক নব জাগণের সাড়ার কথা এবং আত্মত্যাগের কাহিনী আজ আর বাক্যে প্রকাশ করিবার নহে।

ভারতীয় একতা।

সামরিক আইন শুধু কেবল পঞ্জাবের মাত্র উপকার করে নাই, ইহা আজ সমগ্র ভারতে এক জাতীয় মহা-সম্মিলনের উদ্বোধনের কারণ হইয়াছে। দশ বৎসরে ভারতের জনসাধারণের যে উন্নতি হইত, পঞ্জাব অনাচারের ফলে তাহা একদিনে হওয়া সম্ভব হইয়াছে। ভারতে আজ মাননীয় পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য, পণ্ডিত মতিলাল নেহরু, মহাত্মা গন্ধী, শ্রীচিত্তরঞ্জন দাশ, জয়কার ও তায়াবজি মহাশয়গণের নিকট কিরূপ কৃতজ্ঞ, তাহা আপনারা সকলে একবাক্যে স্বীকার করিবেন। ডাক্তার রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর পঞ্জাব অনাচারের পর বড়লাটকে যে পত্রখানি লিখিয়াছেন, তাহার জন্য ভারতে তিনি চিরদিন অমর হইয়া থাকিবেন। আমার প্রদেশের সেই মহাদুর্দ্দিনে যাঁহারা আমাদিগকে সাহায্য করিয়াছেন, সমগ্র পঞ্জাবের পক্ষ হইতে আমি তাঁহাদিগকে আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি। ভারতবাসিগণ সে সময়ে যেরূপ সাহসিকতা প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা দেখিয়া আমি ভারতবাসী বলিয়া আজ গর্ব্ব অনুভব করিতেছি। মাননীয় মিয়া মহম্মদ সফি যে আজ আমাদেরই পক্ষ অবলম্বন করিয়াছেন, তাহার জন্য তিনি যে প্রদেশবাসী হউন না কেন, আমি আনন্দ অনুভব করিতেছি। এই অবসরে আমি একজন ইংরাজের নাম উল্লেখ না-করিয়া থাকিতে পারিলাম না। তিনি আজ এখানে উপস্থিত মিঃ সি, এফ, এণ্ড্রুজ সাহেব। হাণ্টার কমিটির ভারতীয় সভ্যগণ যেরূপ স্বাধীনচিত্ততা ও নীতিনৈপুণ্যের সহিত তাঁহাদের

কার্য্য সুসম্পন্ন করিয়াছেন, তাঁহার জন্যও তাঁহাদিগকে প্রশংসা না করিয়া থাকা যায় না। তাঁহাদের সরল ও স্বাধীন কার্য্যবিবরণীর জন্য তাঁহারা সমগ্র ভারতবাসীর প্রশংসা পাইবার উপযুক্ত।

একটি প্রবাদ আছে যে, প্রত্যেক মেঘেই রজত-রেখা আছে, কিন্তু আমার মনে হয়, পঞ্জাবের এই বিষাদময় চিত্র স্বর্ণরেখাঙ্কিত। অমৃতসরের আত্মত্যাগী পুরুষদিগের স্মৃতি লইয়া রতন দেবী মদনমোহন খুসিরামের চিত্র হৃদয়ে অঙ্কিত করিয়া, যে সকল মুসলমান বালক মৃত্যুর পূর্ব্বে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করিতে করিতে হিন্দু-মুসলমানকী জয় শব্দ উচ্চারণ করিয়াছিল, তাহাদিগের কথা ভাবিয়া এবংসামরিক আইনে নির্য্যাতিত ব্যক্তিদিগের দৃষ্টান্ত স্মরণ করিয়া আমরা আমাদিগের জাতীয় একতা ও জাতীয় স্বাধীনতালাভের লক্ষ্যভূমিতে আশা ও বিশ্বাসের সহিত অগ্রসর হইতে পারিব।

খেলাফৎ-সমস্যা।

কংগ্রেসের এই বিশেষ অধিবেশনের বিচার্য্য বিষয় খেলাফৎ-সমস্যা। আমাদিগের দেশবাসী সাত কোটী মুসলমান এই প্রশ্ন উপলক্ষে চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে। এই প্রশ্নের দুইটি দিক আছে—আধ্যাত্মিক ও রাজনৈতিক। খেলাফৎ-সমস্যার আধ্যাত্মিক বিষয়ের আলোচনা আমাদিগের এই জাতীয় মহাসমিতির বিচারের অন্তর্গত নহে। মুসলমানদিগের বিশ্বাস সম্বন্ধে আর্য্যদিগের মতভেদ থাকিতে পারে, কিন্তু বিরাট্ সুন্নি মুসলমান সম্প্রদায় যে তুরস্কের সুলতানকে তাঁহাদিগের খলিফা বলিয়া বিশ্বাস করেন এবং ইস্‌লামের মঙ্গলার্থে যে তিনি একটি বিশাল স্বাধীন রাষ্ট্রের শীর্ষস্থানে অধিষ্ঠিত থাকিবেন, সে বিষয়ে মতদ্বৈধ নাই। এমন কি, মুসলমান ব্যবহার শাস্ত্রে সেই রাষ্ট্রের সীমাও নির্দ্দিষ্ট আছে।

আধ্যাত্মিক প্রশ্ন সম্বন্ধে ভারতীয় মুসলমানদিগের মধ্যে সম্পূর্ণ একমত

পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে। আমার বোধ হয়, এ বিষয়ে ভিন্ন মত পোষণ করেন, সুন্নি মুসলমানদিগের দশলক্ষের মধ্যে এরূপ একজনও নাই। সুতরাং সেন্‌ট্রাল খেলাফৎ কমিটী এ বিষয়ে শাস্ত্র-মর্ম্ম যেরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহাই ভ্রান্তিশূন্য বিবেচনা করিতে হইবে। আমাদিগের মুসলমান দেশবাসিগণের বিবেচনায় তুরস্ক-সন্ধি যে ভাবে সম্পন্ন হইয়াছে, তাহাতে ইস্‌লামের মূলতত্ত্বের ব্যতিক্রম ঘটিয়াছে। এতদ্বারা তাহাদিগের ধর্ম্মানুষ্ঠান সম্পন্ন করার পক্ষে বিঘ্ন ঘটিয়াছে এবং সেই হেতু যে জাতি দ্বারা ইহা সংঘটিত হইয়াছে, তাহাদিগের সহিত সদ্ভাব রক্ষা করা অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

কেবল তাহাই নহে। তাঁহারা বলেন, যুদ্ধের পূর্ব্বে বৃটিশ রাজনীতিকগণ ভারতীয় মুসলমানদিগের নিকট যে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছিলেন, তাহারও অন্যথা ঘটিয়াছে। ১৯১৪ সালে তুরস্কের সহিত ইংলণ্ডের যুদ্ধ ঘোষণা করা হয়। ভারত-গবর্ণমেণ্ট বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট ফ্রান্স ও রুষিয়ার পক্ষে ভারতীয় রাজভক্ত মুসলমান প্রজাদিগকে আশ্বাস দিয়া এক ঘোষণা প্রচার করেন; ধর্ম্মের সহিত এই যুদ্ধের কোন সম্বন্ধ নাই এবং মুসলমান তীর্থস্থানসমূহ সম্বন্ধে বৃটিশের কোন অভিসন্ধি নাই। তাহার পর ১৯১৮ সালে সমগ্র সাম্রাজ্যের নামে বৃটিশ প্রধান মন্ত্রী মহাশয় সুস্পষ্টরূপে এইরূপ ঘোষণা করিয়াছিলেন:—

"আমরা তুরস্ককে তাহার রাজধানী হইতে বঞ্চিত করিবার জন্য যুদ্ধ করিতেছি না। অথবা তুর্কজাতির প্রধান সম্পদশালী প্রতিষ্ঠা-সম্পন্ন এসিয়া-মাইনর গ্রাস করিবার অভিপ্রায়ে এ যুদ্ধ করিতেছি না।"

পরিশেষে যখন তুরস্কের সহিত যুদ্ধ স্থগিত হয়, তৎসংক্রান্ত চুক্তিপত্র প্রেসিডেণ্ট উইলসনের ১৪ দফার সর্ত্তের ১১ শ সর্ত্তকে ভিত্তি করিয়া লিপিবদ্ধ করা হইয়াছিল। সেই সর্ত্ত এই:—

"বর্ত্তমান অটোম্যান সাম্রাজ্যের তুর্ক-প্রধান স্থানসমূহের অধিবাসিগণ নিশ্চিন্ত থাকিবেন যে, তথাকার রাজশক্তি অক্ষুণ্ণ থাকিবে।" এক্ষণে

জিজ্ঞাসা এই যে, এই সকল প্রতিজ্ঞা কি রক্ষা করা হইয়াছে? তাহা হওয়া দূরে থাকুক, গত ২১শে মে তারিখে তুরস্কের প্রতিনিধিগণের নিকট যে সন্ধিপত্র উপস্থাপিত করা হইয়াছে এবং পরে যাহা স্বাক্ষরিত হইয়াছে, তাহাতে উল্লিখিত সমস্ত সর্ত্তই ভঙ্গ করা হইয়াছে,—মুসলমানের ধর্ম্মানুষ্ঠানে হস্তার্পণ করা হইবে না, মুসলমান তীর্থস্থানসমূহে কোন অত্যাচার হইবে না এবং তুরস্কের জাতীয় ও রাজ্য-সংক্রান্ত সম্মান সংরক্ষিত হইবে, ইত্যাদি সকল প্রতিজ্ঞাই প্রত্যাখ্যাত হইয়াছে। এই ত গেল মুসলমানদিগের কথা। তাহার পর এই তুরস্কসন্ধির সংস্রবে অন্য কথাও আছে, তাহাও প্রণিধান করা প্রয়োজন। আমার বিবেচনায় এসিয়ায় বৃটিশ সাম্রাজ্য বিস্তার আর কোনমতে বাঞ্ছনীয় নহে, প্রত্যুত তাহা ভারতের পক্ষে সমূহ ক্ষতিজনক এবং সমগ্র মানবজাতির স্বাধীনতা-রক্ষার পক্ষে বিপজ্জনক।

এসিয়া ও আফ্রিকার নানাস্থান জয় করিবার উদ্দেশ্যে বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট ভারতের সৈন্য ব্যবহার করিয়া থাকেন। পূর্ব্বে নিয়ম ছিল, ইউরোপীয় যুদ্ধে ভারতীয় সৈন্য ব্যবহৃত হইবে না। কিন্তু বিগত যুদ্ধে এ নিয়ম তিরোহিত হইয়াছে। আফ্রিকায়ও ভারতবাসী সৈন্য জর্ম্মণরাজ্য অধিকার করিয়াছে এবং অদ্যাপি বোধ হয় তাহারা তথায় আছে। অবশ্য, এতদ্বারা ... বৈষম্য বিদূরিত হইয়াছে, তাহা আহ্লাদের বিষয়। কিন্তু ইহাতে সামরিক অধিকার ক্রমশই বিস্তারিত হইবে। আরবে মেসোপটেমিয়ায় বৃটিশ রাজশক্তি প্রতিষ্ঠিত হইলে, ক্রমে পারস্য ও মধ্য এসিয়ার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব লোপ পাইবে। কে বলিতে পারে যে, ক্রমে আফগানিস্থান বৃটিশ সাম্রাজ্যভুক্ত হইবে না। তাহা হইলে ভারতের যে দশা ঘটিয়াছে, ঐ সকল দেশেরও তাহাই ঘটিবে অর্থাৎ কতকগুলি লোক সৈনিক শ্রেণীভুক্ত হইবে এবং সাধারণ অধিবাসীরা নিরস্ত্র হইবে। হয় ত তাহা হইলে আরবীয়, পারসিক, আফগান পল্টন ভারতে আসিবে এবং তাহা ভারতবাসীর পক্ষে বড় সুখের হইবে। অনেকে এটা অসম্ভব ব্যাপার বলি

মনে করিতে পারেন, কিন্তু আমি তাহা করি না। বৃটিশ সাম্রাজ্যবাসীরা যদি ভারতীয় সৈন্য মিশরে, পারস্যে, আরবে ও মধ্য-এসিয়ায় ব্যবহার করিতে পারেন, তাহা হইলে অন্য দেশীয় সৈন্যই বা তাঁহারা কি জন্য ভারতে ব্যবহার করিবেন না। এরূপ হইলে হিন্দু-মুসলমানের সমস্যা আরও সঙ্কটজনক হইবে। তাহার পর যদি বৃটিশের এইরূপ রাজ্যাধিকার ঐ সকল দেশের মুসলমানগণ প্রতিরোধ করিবার চেষ্টা করেন, তাহা হইলে সেই সেই দেশে সৈন্য ব্যবহার করিবার প্রয়োজন হইবে, তাহা হইলে ভারতের লোকবল ও ধনবল নিঃশেষিত হইবে। এই জন্যই এস্যিয়ার মুসলমান দেশ সকল স্বাধীন থাকে, ইহা বাঞ্ছনীয়।

সহযোগিতা-বর্জ্জন।

নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটীর যে অধিবেশনে এই স্পেশাল কংগ্রেসের অধিবেশন বসান স্থির হয়, তথায় মহাত্মা গন্ধী প্রস্তা[illegible] করেন যে, তুর্ক-সন্ধি-সর্ত্তের ও পঞ্জাব ব্যাপার সম্বন্ধে গবর্ণমেণ্ট যে সি[illegible]ন্তে উপনীত হইয়াছেন, তাহার প্রতিবাদকল্পে কংগ্রেস কমিটী দেশবাসীকে সরকারের সহযোগিতা-বর্জ্জনের উপদেশ দিউন। মহাত্মা গন্ধী স[illegible]-যোগিতা-বর্জ্জনের যে ব্যবস্থা করিয়াছেন, তাহাতে নূতন কাউন্সিল[illegible] বয়কট করার কথাও আছে। নিখিল-ভারত কংগ্রেসকমিটী [illegible] করেন যে, শাসন-সংস্কারসম্বন্ধে অমৃতসর কংগ্রেসে যে প্রস্তাব গৃহী[illegible] হয়, মহাত্মা গন্ধীর প্রস্তাব তাহার বিরোধী বলিয়া তাহাতে স্বীকার হওয়ার অধিকার কমিটীর নাই। এ সম্বন্ধে সমগ্র দেশের মতামত না লইয়া কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করা কমিটী ন্যায়সঙ্গত বলিয়া মনে করেন নাই; দেশবাসীকে মতামত দিবার আভাস দেওয়াই উচিত বলিয়া তাঁহারা স্থির করেন। তাই সহযোগিতা-বর্জ্জন-সংক্রান্ত সকল কর্ত্তব্যের ভার এই স্পেশ্যাল কংগ্রেসের উপর অর্পণ করা হইয়াছে।

কংগ্রেস কমিটীর ঐ নির্দ্ধারণের পর হইতে সহযোগিতা-বর্জ্জন সম্বন্ধে

দেশে [illegible]র খুব আলোচনা চলিয়াছে; অনেকে সে সম্বন্ধে বক্তৃতা দিয়া তাঁহাদের মতামত প্রকাশ করিয়াছেন, অনেক সংবাদপত্রেও সহযোগিতা-বর্জ্জনের উপর মন্তব্য প্রকাশ করা হইয়াছে। মহাত্মা গন্ধীর নেতৃত্বাধীনে সেন্ট্রাল খেলাফৎ কমিটী ইতিমধ্যেই সহযোগিতা-বর্জ্জন আরম্ভ করিয়া দিয়াছেন। কতিপয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটীও ভোটের আধিক্যে সহযোগিতা-বর্জ্জনের নীতিতে সম্মতি প্রদান করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহারা এই স্পেশ্যাল কংগ্রেসের সিদ্ধান্তের অপেক্ষায় সে অনুসারে কোন কার্য্যে হস্তক্ষেপ করেন নাই। সহযোগিতা-বর্জ্জনের সমস্যা-সমাধানের জন্য সকলেই বিশেষ চিন্তিত হইয়া পড়িয়াছেন। সহযোগিতা-বর্জ্জন সম্বন্ধে দেশে দুইটি ভিন্নমতাবলম্বী দলের সৃষ্টি হইয়াছে। দুই দলেই শ্রদ্ধা ও সম্মানভাজন নেতৃবর্গ আছেন। এই সকল কারণে আমি স্থির করিয়াছি, স্পেশ্যাল কংগ্রেসের প্রেসিডেণ্টরূপে আমার নিজস্ব মতামত প্রথমে প্রকাশ না করাই কর্ত্তব্য।

[illegible]তঃ কংগ্রেসের প্রেসিডেণ্ট তাঁহাদের বক্তৃতায় সমস্ত অত্যাবশ্যক রাজনীতিক সমস্যা-সম্বন্ধেই তাঁহাদের মতামত প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন, তাহা আমি জানি; কিন্তু তখন কংগ্রেসের আলোচ্য সকল বিষয়েই দেশবাসী প্রায় একমত থাকিতেন। আজকাল তাঁহাদের সেরূপ ঐকমত্য [illegible] না। যে বিষয়ে দেশবাসী সম্পূর্ণ বা কতক পরিমাণে একমত, [illegible] বিষয়েই কংগ্রেসের প্রেসিডেণ্টরা দেশের মুখপাত্ররূপে আলোচনা করিবেন, এরূপ আশা সকলেই করিয়া থাকেন। কংগ্রেসের এ প্রথার মধ্যে বিশেষ যুক্তি দেখিতে পাওয়া যায়। কংগ্রেসকে যদি জাতীয় মহাসভারূপে রাখা হয়, তাহা হইলে তাহার প্রেসিডেণ্টদের কোন মত-বিশেষের পক্ষপাতী হওয়া উচিত নয়। প্রেসিডেণ্টের ব্যক্তিগত মতামত যাহাই কেন থাকুক না, প্রেসিডেণ্ট কখনও দেশের নামে, দেশবাসী যে বিষয়ে একমত নহে, সে বিষয়ে মন্তব্য প্রকাশ করিতে পারেন না। দেশের অধিকাংশ লোক যে মতের পক্ষপাতী, প্রেসিডেণ্ট যদি সেরূপ

মতাবলম্বী না হন, তাহা হইলে তাঁহার মন্তব্য প্রকাশে তিনি স্বয়ং ও কংগ্রেস উভয়েই বিশেষ অসুবিধায় পড়িতে পারেন। যে বিষয়ে দেশবাসী এমনভাবে ভিন্ন মতাবলম্বী, সে বিষয়ে কংগ্রেসের সিদ্ধান্ত কিরূপ হইতে পারে, তাহার অনুমান করিয়া কোন কথা বলিবার চেষ্টা করাও প্রেসিডেন্টের উচিত নয়। সেইজন্য আমি বিবেচনা করিতেছি, আমার এই অভিভাষণে সহযোগিতা-বর্জ্জন সম্বন্ধে কোন কথা না বলাই আমার পক্ষে উচিত। এই মহাসভায় জাতীয় ভাব বজায় রাখিবার জন্যই আমি এই পন্থার অনুসরণ করিলাম; ইহার ফলে ভবিষ্যতেও কংগ্রেসের জাতীয়তা রক্ষা সহজ ও সম্ভব হইবে। এ ব্যবস্থায় ভাবী প্রেসিডেন্ট নির্ব্বাচনের ক্ষেত্রেও সঙ্কীর্ণতার গণ্ডী অতিক্রম করিতে সমর্থ হইবে। এখনও আমাদের এই কর্ম্মময় রাজনীতিক জীবনে দিন দিন নূতন নূতন সমস্যার আবির্ভাব হইতেছে এবং সে বিষয়ে দেশের শ্রদ্ধা-সম্মানভাজন নেতৃবর্গের মধ্যেও মতভেদ ঘটিবার সম্ভাবনা যথেষ্ট, সে সময় যাঁহারা কখনও রাজনীতিক্ষেত্রে কাজ করেন নাই, কোন বিশেষ মতের পক্ষপাতী নহেন, এমন লোককে আপনারা আপনাদের প্রেসিডেন্ট করিতে পারিবেন না। কাজেই যাহাতে এই সব ক্ষেত্রে বিশিষ্ট মতাবলম্বীদের কংগ্রেসের সভাপতিত্ব করিবার সময় নিরপেক্ষ থাকা দুষ্কর না হয়, সেই পন্থারই অনুসরণ করা উচিত। যে সব ক্ষেত্রে দেশবাসী সম্পূর্ণ বা অধিকাংশ একমত, কেবল সেই সব বিষয়েই ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের প্রেসিডেন্ট দেশের মুখপাত্র। আশা করি, আমার এই সিদ্ধান্তে আপনারা সম্মতি দিবেন, সহযোগিতা-বর্জ্জনের বিষয়ে আমার ব্যক্তিগত মতামত আছে, কিন্তু কংগ্রেসে প্রেসিডেন্টের কার্য্য করিবার সময় আমি কোন মতেরই পক্ষপাতিত্ব করিব না।

সহযোগিতা।

যাহা হউক, এ বিষয়ে সাধারণভাবে মত প্রকাশে কোন বাধা নাই। সহযোগিতা-বর্জ্জন সম্বন্ধে আলোচনা করিবার পূর্ব্বে সহযোগিতা সম্বন্ধে

আলোচনা আবশ্যক। দেশের গবর্মেণ্ট যদি দেশবাসীর প্রতিনিধি হয়েন, অথবা দেশবাসীর স্বার্থরক্ষায় অবহিত থাকেন, তাহা হইলেই দেশবাসী গবর্মেণ্টের সহযোগিতা করিতে পারেন। উহাই সহযোগিতার মূল ভিত্তি। ভারতে প্রথমটি তো একেবারেই নাই। দ্বিতীয়টি ভারতবাসীর দুর্ভাগ্যক্রমে একেবারে অদর্শন না ঘটিলেও নষ্ট হইয়া যাইতেছে। তাহার পর সরকারের সহযোগিতা দুই প্রকারের; একটি বাধ্যতামূলক আইন করিয়া তাহা বর্ত্তমান রাখিতে হয়, যেমন ট্যাক্স প্রদান, বাধ্যতামূলক প্রথায় সৈন্যদলে যোগদান প্রভৃতি। অপরটি স্বেচ্ছাকৃত—যেমন সরকারী চাকরী গ্রহণ করা, কাউন্সিলের কার্য্যে যোগ দেওয়া প্রভৃতি। প্রথম সহযোগিতায় দেশবাসী অসম্মত হইলে শাস্তি ভোগ করিতে বাধ্য। দ্বিতীয় প্রকার সহযোগিতার মধ্যেও প্রকারভেদ আছে; তন্মধ্যে একটি স্পষ্টরূপেই দেশের মঙ্গলজনক। দেশবাসী নিজেদের আর্থিক [illegible] উদ্দেশ্যে যে সহযোগিতা করিতে অগ্রসর হয়, অন্যদিকে আর্থিক ব্যবস্থা করিতে পারিলে তবে তাহাকে অস্বীকার করিতে পারা যায়। সম্মান-মর্য্যাদা-লাভের জন্য যে সহযোগিতা করা হয়, যদি সরকারী সম্মান সম্বন্ধে লোকের মতি পরিবর্ত্তন হয়, তাহা হইলে সে সহযোগিতায় অস্বীকৃত হওয়া যাইতে পারে; সরকারের কার্য্যে নিযুক্ত থাকিয়া সরকারের সকল [illegible] তাহাদের উপর আক্রমণ করিয়া যে দেশসেবা করা যায়, তাহাও [illegible] প্রকার সহযোগিতা।

সহযোগিতা করা বা তাহা বর্জ্জন করার বিষয় স্থির করিতে হইলে [ক] উহা বাধ্যতামূলক কি স্বেচ্ছাকৃত, [খ] উহাতে আর্থিক উন্নতি অবনতির সম্ভাবনা কিরূপ, [গ] উহাতে নৈতিক কারণ কি পরিমাণ আছে এবং [ঘ] আক্রমণ ও আত্মরক্ষার অস্ত্ররূপে উহার উপযোগিতা কিরূপ—এ সব বিষয়ে বিবেচনা করা দরকার।

যে সহযোগিতা নীতিবিগর্হিত, যাহার জন্য দেশবাসীকে বিদেশী ব্যুরোক্রেশীর যন্ত্রস্বরূপ হইয়া থাকিতে হয়, যাহা কেবলই বাধ্যতামূলক,

তাহার সহিত যে সহযোগিতা দেশবাসীর মঙ্গলজনক, তাহা সম্পূর্ণ বিভিন্ন প্রকারের। তাহার পর যে সহযোগিতার সহিত আর্থিক সম্বন্ধ রহিয়াছে, তাহার সহিত সম্মান-শ্রদ্ধার সহযোগিতার পার্থক্য রহিয়াছে। শেষ কথা, সহযোগিতা-বর্জ্জনের উদ্দেশ্য গবর্ণমেণ্টের উপর সদ্য সদ্য প্রভাব বিস্তার করা, না, দেশবাসীকে তাহাদের অদৃষ্ট নির্দ্ধারণের কর্ত্তব্যভার নিজেদের হস্তে ইতে অভ্যস্ত করান, তাহাও আপনাদিগকে বিবেচনা করিতে হইবে।

সহযোগিতা-বর্জ্জনের বিষয়ে এইগুলিই প্রধান আলোচ্য।

দেশের স্বার্থ।

আমি আপনাদিগকে একটু সাবধান করিয়া দিতে ইচ্ছা করি। এ সময়টা আমাদের পক্ষে যেমন, সকল দেশের পক্ষে তেমনই সমস্যা-সমাকুল। অতীতের আদর্শ রাশি, নীতি, ধারণা, বিশ্বাস, মতি-গতি সবই বদলাইয়া যাইতেছে। নূতন প্রজাতন্ত্রের নূতন প্রজাশক্তির অভ্যুদয় ঘটিতেছে। সে প্রজাতন্ত্রে মানুষে মানুষে আর কোন প্রভেদ থাকিতেছে না। মানুষের সম্মান-মর্য্যাদা বৃদ্ধি পাইতেছে। অতএব আমাদিগকে মানুষের স্বার্থের বিষয় ভাল করিয়া বিবেচনা করিতে হইবে। ব্যবস্থাপক সভার জন্য ভোট প্রদানের বা অন্য প্রকার রাজনীতিক [illegible] বিচারের যে অধিকার তাঁহাদের আছে, তাহার ব্যবহার [illegible] দেওয়া আমাদের কর্ত্তব্য। দেশের জনসাধারণ এখন দেশের জন্য অধিক পরিমাণে চিন্তা করিতে শিখিয়াছে। তাহাদের সম্বন্ধে বিবেচনা করিতেই হইবে।

ডায়ার ও স্মিথকে পেন্‌সন প্রদান।

যে ভারতবাসিগণের স্ত্রীলোকদিগের উপর অত্যাচার হইয়াছে, শস্যক্ষেত্র নষ্ট করা হইয়াছে, সন্তানগণকে বেত্রাঘাত করা হইয়াছে, নিজের বা

আত্মীয়গণের সম্মানহানি করা হইয়াছে, বিনা কারণে কারারুদ্ধ করিয়া পদদলিত করা হইয়াছে, তাহাদেরই প্রদত্ত ট্যাক্স হইতে অত্যাচারী ডায়ার ও স্মিথকে পেন্সন দানের ব্যবস্থা করা হইতেছে। এই কথা মনে ভাবিতে গেলে কি ভাবের উদয় হয়, তাহা আপনারা একবার ভাবিয়া দেখুন। সে দিন আমি একজন পঞ্জাব সিভিলিয়ানের নিকট স্মিথের নামোল্লেখ করাতে তিনি বলিলেন যে, ঐ লোকটি পাগল। কিন্তু কেন যে এই পাগলকে একটি জেলা শাসনের ভার দেওয়া হইয়াছিল এবং কেনই বা ভারতের ধনভাণ্ডার হইতে তাহাকে পেন্সন প্রদানের প্রস্তাব হইতেছে, তাহা মানব বুদ্ধির দুর্জ্ঞেয়।

মহাশয়গণ! আজ আপনারা সকলেই বোধ হয় এই কথা বিশ্বাস করিবেন যে, শিক্ষিত সম্প্রদায় অপেক্ষা সাধারণ প্রজাগণই আজ ইংরাজ শাসনের উপর অধিক শ্রদ্ধাহীন হইয়াছেন। আমি গবর্ণমেণ্টকে ভয় দেখাইয়া বলিতে [illegible]না, কিন্তু ইহা স্পষ্টভাবেই বলা আবশ্যক যে, সরকার যদি [illegible] বড় [illegible] হইতে দেশ রক্ষা করিতে ইচ্ছা করেন, তবে জনসাধারণের জন্য মঙ্গলজনক স্থায়ী কোন সংস্কারসাধন করিয়া তাঁহাদিগকে এই অপকলঙ্ক মোচন করিতে হইবে। ইহা খুব শীঘ্র হওয়াই বাঞ্ছনীয়। শিক্ষিত [illegible]গণের উপর আবার অত্যাচার করিলে অবস্থা আরও সঙ্গীন হইয়া দাঁড় [illegible] সাধারণের উপর শিক্ষিত নেতৃগণের রীতিমত প্রভুত্ব আছে [illegible] ও সত্যপালের মত নেতাদিগকে নির্ব্বাসিত করিয়া সেই প্রভুত্ব নষ্ট করিবার যদি চেষ্টা হয়, তাহা হইলে তাহার ফল বড়ই সঙ্গীন হইবে।

লর্ড সিংহ, মিষ্টার শর্ম্মা ও ডাক্তার সাপ্রুর নিয়োগ।

লর্ড সিংহ, মিষ্টার শর্ম্মা ও ডাক্তার সাপ্রুর নিয়োগ বেশ চমৎকারই হইয়াছে। এই সকল ভদ্রলোকের শুভাদৃষ্টের জন্য এবং সরকারের এই

সুবিবেচনার জন্য আমি তাঁহাদিগকে অভিনন্দিত করিতেছি। অবশ্য এই কার্য্যের দ্বারা বর্ত্তমান অসন্তোষ দূর হইবার নহে। পূর্ব্বে ইহা হইলে আমরা হয় ত আনন্দিত হইতাম, কিন্তু পঞ্জাবের দুর্ঘটনার পর ইহার দ্বারা কোন সুফল ফলিবে না। জনসাধারণ শুধু নিয়োগে সন্তুষ্ট হইবেন না, তাঁহারা এখন যথার্থ ক্ষমতা পাইতে চাহেন। মিঃ মণ্টেগু কর্ত্তৃক তাঁহারা মনোনীত হইয়াছেন। লর্ড সিংহ ও মেসার্স শর্ম্মা ও সাপ্রু বৃটিশ মন্ত্রিসভার সেবক, তাঁহারা ভারতীয় জনসাধারণের সেবক নহেন। এ পর্য্যন্ত যে প্রভূত অর্থ ইংরাজগণই কেবল ভোগ করিতেছিলেন, তাহাতে ভারতবাসিগণও অংশ পাইবেন দেখিয়া আমরা আনন্দ অনুভব করিতে পারি। তাঁহারা দায়িত্বপূর্ণ পদ লাভ করিয়া দেশ-সেবায় সুবিধা পাইবেন এবং আমরা আশা করি, তাঁহারা দেশের লোকের মনের মতন করিয়া শাসনকার্য্য সম্পন্ন করিবেন। এই সকল কথা সত্য হইলেও আমরা এই কথাটি না ভাবিয়া থাকিতে পারিতেছি না যে, তাঁহারা ভারতের জনসাধারণের সেবক নহেন, তাঁহারা তাঁহাদের প্রভু কর্ত্তৃক নিযুক্ত। আমরা পরকর্ত্তৃক নিযুক্ত প্রভু চাহি না; আমরা আমাদের নিজেদের নির্ব্বাচিত ও সম্মানিত সেবক চাহি। লর্ড সিংহ লক্ষ টাকা বেতন পান, আর আমার বন্ধুগণ ৮ হাজার টাকা বেতন পান, আমরা এই কথাটি ভুলিতে পারিব না যে, আমাদের [illegible] শতকরা ৪০ ভাগ প্রায় যে সৈন্যদল রক্ষার জন্য ব্যয়িত হয়, সেই সৈন্যদল কেবল আমাদিগের উপর অত্যাচার করিবার জন্যই গঠিত হইয়াছে। আমাদেব দেশের জনসাধারণ জীবনরক্ষার উপযোগী সামান্য খাদ্য হইতে বঞ্চিত, কিন্তু ডায়ার ও বসওয়ার্থ স্মিথের মত লোকের বেতনের জন্য আমাদের প্রদত্ত অর্থ জলের মত ব্যয়িত হইতেছে।

আপনারা যে সিদ্ধান্তে উপনীত হউন না কেন, আপনাদিগকে এই কথাটি সর্ব্বদা মনে রাখিতে হইবে,—এ সময়ে দেশের শিক্ষা, সমাজ, অর্থনীতির সংস্কার করিয়া জনসাধারণের উন্নতি করিতে হইবে। আমরা

সহযোগিতা বর্জ্জন করি, বা না করি,আমাদের প্রধান কার্য্য হইতেছে যে, জনসাধারণকে উদ্‌বুদ্ধ করা। আমরা যে তাহাদেরই স্বার্থরক্ষা ও উপকারের জন্য কার্য্য করিতেছি, তাহা যেন তাহারা প্রাণে প্রাণে অনুভব করে।

জনসাধারণের উদ্বোধন।

ইহাতে খুব একটি কথা মনে পড়ে। আমরা জনসাধারণকে চালিত করিব, না ইহাদিগের দ্বারা চালিত হইব? গত ৩০শে ফেব্রুয়ারী আমার এখানে উপস্থিত হওয়ার পর হইতে এই ছয়মাস ধরিয়া আমি আমার দেশের জনসাধারণের সহিত সংস্পর্শে রহিয়াছি। আমি সহস্র সহস্র লোকের সম্পর্কে আসিয়াছি, সভায় তাহাদিগকে দেখিয়াছি এবং তাহাদের প্রতিনিধিগণের সহিত গুপ্তভাবে দেখা করিয়াছি। তাহাদের জাতীয় জাগরণ প্রত্যক্ষ করিয়াছি। আমার আশার অতিরিক্ত সুফল দেখিতে পাইতেছি। এ অবস্থায় আমার মনে হয়, আমরা যে কাজই করি না কেন, জনসাধারণের সহিত সম্মিলিত হইয়া তাহা করিতে হইবে। শুধু জনসাধারণের মতেই চালিত হওয়া আমাদের পক্ষে যেমন [illegible], জনসাধারণের মত উপেক্ষা করাও ঠিক তেমনি অন্যায়। অনেকে [illegible] করেন যে, জনসাধারণের মত উপেক্ষা করিয়া স্বমত প্রতিষ্ঠা করাই প্রকৃ[illegible]। আমাদের ধারণা কিন্তু সম্পূর্ণ ভিন্নরূপ। জনসাধারণ যখন উন্মত্ত [illegible] তখন তাহাদিগকে শান্ত করাই, প্রকৃত নেতার কার্য্য। লাহোর, অমৃতসর, গুজরানওয়ালা, ফতেপুর প্রভৃতি স্থানে পাঞ্জাব নেতাগণ এই ভাবেই জনসাধারণকে শান্ত করিয়াছিলেন। দিল্লীতে স্বামী শ্রদ্ধানন্দ ও চীফ কমিশনারের নেতৃত্বে জনসাধারণ উন্মত্ত হইতে পারে নাই। কোন কোন সময়ে ব্যক্তিগত মত প্রতিষ্ঠিত করা প্রয়োজন হইবে ও সর্বসাধারণের কার্য্যে সকলের মত লইয়া চলা উচিত। জনসাধারণের মতামত দেখিয়া আমাদিগকে এখানে মত প্রতিষ্ঠা করিতে

হইবে। জনসাধারণকে অগ্রে যাইতে দিয়া বা তাহাদিগকে পশ্চাতে ফেলিয়া যাওয়া আমাদিগের যুক্তিযুক্ত হইবে না।

শুধু প্রস্তাব উত্থাপন করিয়াই আমাদের কার্য্য শেষ হইব না। এ সময়ে যাহাতে সমস্যাগুলির যথার্থ সমাধান হয়, সে বিষয়ে আমাদিগকে বিশেষ মনোযোগী হইতে হইবে। অনাচারসমূহের ফলে যে অবস্থা উপস্থিত হইয়াছে, তাহার মত অবস্থা ইহার পূর্ব্বে কখনও উপস্থিত হয় নাই, কাজে কাজেই তাহার সমাধানও বিশেষ গুরুতর হইয়া দাঁড়াইবে। গণতন্ত্র হইতে যদি অত্যাচার উদ্ভূত হয়, তাহা হইলে সে গণতন্ত্র কখনই ঈপ্সিত হইবে না। ১৯০৫ সালে প্রথম ইংলণ্ডে যাইয়া আমি তাহাই দেখিয়াছিলাম। আমরা যে ভাবে কার্য্য আরম্ভ করিব উহা ঠিক সেই ভাবেই শেষ হইবে। এই সময়ে স্বার্থত্যাগ করিয়া স্বাধীনতার সহিত কার্য্য না করিলে স্বাধীনতা লাভ করা কখনই সম্ভব হইব না।

পরিশিষ্ট।

পুস্তক প্রকাশিত হইবার অব্যবহিত পূর্ব্বে খবর পাওয়া গেল লালা লজপৎ রায়ের সশ্রম কারাদণ্ড মকুব হইয়াছে। ১১ই জানুয়ারী পঞ্জাব ব্যবস্থাপক সভায় পঞ্জাব-সরকারের পক্ষ হইতে স্থানীয় পরিষদের সদস্য মাননীয় সার জন্ মেনার্ড ঘোষণা [illegible] লজপৎ রায় ও অন্যান্যের প্রতি যে সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ দেওয়া হইয়াছে, তাহা একেবারে মকুব করিয়া দেওয়া হইবে বলিয়া সরকার স্থির করিয়াছেন। রাজদ্রোহজনক সভা বন্ধের আইন অনুসারে যে সব দণ্ড দেওয়া হইয়াছে, তাহা যুক্তিযুক্ত হইয়াছে কি না, সেসম্বন্ধেও পরীক্ষা করিয়া দেখা হইবে।

সম্পূর্ণ